অচ্ছেদ্য বন্ধন

নারায়ণ সান্যাল

অচ্ছেদ্য-বন্ধন

নারায়ণ সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

উৎসর্গ

সারস্বত-বীণায় ঝঙ্কার তোলার অঙ্গীকার নিয়ে যাঁর আবির্ভাব অথচ তালপাতার ভেঁপুর মেঠো তান যাঁর মন-পসন্দ্, চক্রপাণির পাঞ্চজন্যের নাদ-বিশ্লেষণে যাঁর দুঃসাহসিক অভিলাষ অথচ খঞ্জনী-হাতে 'রাই-জাগো' প্রভাত-ফেরিতে যিনি মশ্‌গুল, অগ্রজপ্রতিম সুবৈচিত্র্যসন্ধানী সেই

গজেনদাকে

অচ্ছেদ্য-বন্ধন

"...খুন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। কারণ ওর গলায় পাঁচটা আঙুলের স্পষ্ট দাগ। নিজে-হাতে নিজের গলা টিপে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না! আততায়ী কোনো 'ক্লু' রেখে যায়নি। একেবারে 'পার্ফেক্ট ক্রাইম' বলতে যা বোঝায়। একটিই সূত্র—আততায়ী পুরুষ ও বলিষ্ঠ। না-হলে এমন বজ্র-টিপুনি সম্ভবপর হত না। আরও একটি ক্ষীণ সূত্র: মেয়েটি বোধহয় প্রতিবাদের কোনো চেষ্টাই করেনি! কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? হঠাৎ আক্রান্ত হলে মানুষ মাত্রেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। ফলে তার বেশবাস কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বেই। এমন নিখুঁত নিদ্রার ভঙ্গিতে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ নিয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করে না। চুলটা অবিন্যস্ত নয়, কপালের টিপটা ধেবড়ে যায়নি, ব্লাউসের বোতামগুলি অটুট, লাগানো! তার মানে কি ধরে নিতে হবে যে, আততায়ী ওর মৃত্যুর পর ওকে সাজিয়েছে? চুলটা চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে, কপালের ধেবড়ে যাওয়া সিঁদুরের টিপটা মুছে দিয়ে নতুন করে টিপ পরিয়ে দিয়েছে? অসম্ভব! কোনও প্রফেশনাল খুনিরও তখন অমন মনোবল থাকে না—তা ছাড়া তখন প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অমূল্য! দ্বিতীয় একটা সম্ভাবনাও হতে পারে : আততায়ী মেয়েটির অতি পরিচিত, হয়তো অতি আপনজন! আততায়ী যখন গ্রীবামূলে হাত দিয়েছিল তখন হয়তো মেয়েটি ছিল চুম্বন-তিয়াসী!"

গোয়েন্দা-গল্প যখন এই পর্যায়ে পৌছায় পাঠক তখন তার আশেপাশের সবকিছু ভুলে যায়। পাঠিকা তো বটেই! অরুন্ধতীও একেবারে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। সামনের টেবিলে বসে ওর দুই সঙ্গী কী নিয়ে কথাবার্তা বলছে সেটা তার কানে যাচ্ছে, মাথায় ঢুকছে না।

—না, বাঙালি নয়, আমার ধারণা : হয় পাঞ্জাবি, নয় কাশ্মীরি!

—সাহেব নয়?

—না! মাথার চুলগুলো লালচে, কিন্তু গায়ের রঙটা তামাটে—

—সে তো এ-দেশের চড়া রোদে পুড়েও হয়ে যেতে পারে। পারে না?

অরুন্ধতী গোয়েন্দা গল্পের বইটা নামিয়ে রেখে চায়ের কাপে আলতো একটা চুমুক দিয়ে বললে, কার কথা হচ্ছে?

অঞ্জলিদি একটা মেকি ধমকের সুরে বলে, তোর এসব কথায় কান দেবার কী দরকার? সকাল থেকে তো ঐ গোয়েন্দা গল্পে ডুবে আছিস, গাঁৎ গাঁৎ করে তাই গেল!

অরুন্ধতী বোঝে—ওদের রাগ করবার অধিকার আছে। অন্তত অভিমানের। তিনটি মেয়ে যখন কোনো চায়ের দোকানে ঢুকে চা-পানে সময় কাটায় তখন তৃতীয়জন বইয়ে বুঁদ হয়ে থাকলে প্রথম দুজনের ক্ষুব্ধ হবার অধিকার বর্তায়। তাই বইয়ের ফাঁকে আঙুলটা চালিয়ে বলে, তুমি জানো না, মেজদি, আমি এখন কোন পর্যায়ে এসে পৌছেছি, মানে গল্পটার!

—কেন জানব না? তাইতো বলছি, এসব ছেঁদো কথায় তোর কী দরকার?

অতসী বসেছিল অঞ্জলিদির পাশেই। অরুন্ধতীর বিপরীত দিকে, রাস্তার দিকে মুখ করে। অতসী ওদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। সবে ঢুকেছে চাকরিতে, বি. এ. পাশ করে। সে বললে, আপনি যে এদিক ফিরে বসে আছেন অরুদি, তাই তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। একজন ভদ্রলোক। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট কিনছে।

বেশ তো। একটা লোক রাস্তার ও-পাশের দোকান থেকে সিগ্রেট কিনছে, তাতে তোর কী? তার জাত নির্ণয়ের জন্য তুই খেপে উঠেছিস কেন?

—তাই তো বলছি! আপনি এখন সেই কাঁচি-সিগ্রেটের বিজ্ঞাপন : কী হারাইতেছেন তা জানেন না! দারুণ হ্যান্ডসম্! কিছুটা ধর্মেন্দ্র, কিছুটা শশী কাপুর!

অরুন্ধতী এবার পিছন ফিরে দেখতে যায়। খপ করে তার হাতখানা চেপে ধরে অঞ্জলিদি। বলে, ঘাড় ঘোরাস না! ভদ্রলোক এদিকেই তাকিয়ে আছে।

—তাতে কী হল?

—তুই এখন ওদিকে ঘাড় ঘোরালেই ও বুঝে ফেলবে—ওর কথাই আমরা আলোচনা করছি। লেডি-কিলার ডনজুয়ানি চেহারা তো। ওদের লাই দিতে নেই।

কোথাও কিছু নেই অতসী খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে। অঞ্জলিদি ওকে ধমক দেয়, অ্যাই! কী হচ্ছে! অসভ্যের মতো হাসছিস কেন?

—বলতে পারি, অরুদি, রাগ করবে না তো?

—করব না। বল, কেন অমন পাগলির মতো হেসে উঠলি?

অতসী গলা নিচু করে বলে, অরুদি, তুমি এখনি বলছিলে, কেন আমরা ঐ ভদ্রলোকের জাত নির্ণয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, তাই না? জবাবটা শুনবে?

—কী জবাব?

—লোকটা 'দারুণ হ্যান্ডসম্' শুনেই তোমার মুণ্ডু ঘুরে যাচ্ছিল!

এবার ওরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। তিন বান্ধবী নয়, অতসীর চেয়ে অঞ্জলিদি না হোক বিশ বছরের বড়, আর অরুন্ধতী দুইয়ের মাঝামাঝি। তবে ওরা সহকর্মী। একই স্কুলের শিক্ষিকা।

আই. আই. টি. থেকে যে পিচমোড়া সড়কটা এসে মিশেছে দীঘা-খড়্গপুর রোডে, সেই সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল। ওরা তিনজনেই খড়্গপুরের জগত্তারিণী গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। অঞ্জলি বিধবা, অঙ্কের টিচার, অরুন্ধতীর চেয়ে বছর-পাঁচেকের বড়। স্কুল-বাসটা গেছে পেট্রল নিয়ে আসতে! এক বাস ভর্তি মেয়ে নিয়ে ওরা যাচ্ছে সপ্তাহান্তে দীঘা বেড়াতে। মেয়েরা গাড়িতেই আছে, সর্দারজি ড্রাইভার বলেছে, পেট্রল নিয়ে ফিরে আসতে তার মিনিট-দশেক লাগবে। ওরা সেই অবকাশে ঢুকেছে পথের ধারের এই চায়ের দোকানে। মেয়েদের সঙ্গে আছেন অমিয়াদি, অ্যাসিস্টেন্ট হেডমিস্ট্রেস। তাঁর চায়ের নেশা নেই।

—অ্যাই অরু! এবার ওদিক ফিরে দেখতে পারিস। ভদ্রলোক, অন্যদিকে ফিরে আছে।

অরুন্ধতী খোঁপা থেকে একটা মাথার কাঁটা টেনে নিয়ে বইটার ভাঁজে গুঁজে দিল। বত্রিশ আর তেত্রিশ পাতার মাঝখানে—সেই যেখানে মেয়েটা মেঝের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আর গোয়েন্দা টেলিফোনের মাউথপিসে বলছেন, 'হোমিসাইড প্লিজ! ইয়েস্...পসিব্লি এ মার্ডার কেস।'—তারপর সে ধীরেসুস্থে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে।

জগত্তারিণী গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকা অরুন্ধতী চক্রবর্তী কী দেখল সে-কথা বলার আগে বলতে হয়—তুমি-আমি হলে কী দেখতাম!

ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা। অত্যন্ত ফর্সা রঙ। বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। পরনে গ্রে-রঙের সফরি-সুট। সিগ্রেট কেনা শেষ হয়েছে তার—কারণ দোকান থেকে হাত-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে মৌজ করে সিগ্রেট টানছে। একটা পা তুলে দিয়েছে আকাশি-রঙের একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির পা-দানিতে। মনে হয়, গাড়িটা তারই। তাতে কোনো যাত্রী নেই। মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না—ওয়ান-কোয়ার্টার প্রোফাইল। মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে আন্দাজ হয় গোঁফ-দাড়ি কামানো। ঠিকই বলেছিল অতসী—দারুণ হ্যান্ডসম; অথবা অঞ্জলিদি—ডনজুয়ান।

অঞ্জলিদি তার হাতবটুয়া খুলে একটা দু-টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরল। বললে, অতসী, যা—ঐ দোকান থেকে তিনটে মিঠে-খিলি পান কিনে নিয়ে আয়। আর সেই সুবাদে যদি ঐ ডনজুয়ানের নামটা জেনে আসতে পারিস তাহলে দীঘাতে পৌঁছে তোকে ভরপেট রসগোল্লা খাওয়াবো!

অতসী রাঙিয়ে উঠে বললে, না বাবা! আমার দ্বারা হবে না।

ভদ্রলোক ঠিক তখনই এদিকে ফিরলেন। না, গোঁফটা কামানো নয়। সরু সুচালো গোঁফ। আশ্চর্য! ওদের দিকেই যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

অঞ্জলিদি এবার অরুন্ধতীকে বলে, তুই পারিস? অ্যাই...অ্যাই অরু! তুই যে সম্মোহিত হয়ে গেলি রে! কী দেখছিস অমন করে? ভদ্রলোক কী ভাবছেন! অ্যাই...

ওর হাতটা ধরে একটা ঝাঁকানি দেয়।

অরুন্ধতী যেন সত্যই সম্মোহিত হয়ে ছিল এতক্ষণ। হাতে ঝাঁকানি খেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেল। এপাশ ফিরে বসল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে গেল। তাতে ওর কপালের টিপটা গেল ধেবড়ে।

—এঃ ছি, ছি! কী করলি বল তো?—অঞ্জলি রুমাল দিয়ে ওর কপালটা মুছে দিল।

অরুন্ধতীর যেন কোনো সাড় নেই। নিঃসাড়ে সে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে কী যেন ভাবছে। অতসী ততক্ষণে তার ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়ে বার করছে একটা বিন্দি টিপ।

অঞ্জলিদি বলে, তুই পারিস? অ্যাই অরু?

—কী?—শব্দটা প্রশ্নবোধক নয়, রিফ্লেক্স-অ্যাকশন।

—ঐ দোকান থেকে তিন-খিলি মিঠেপান কিনে আনতে?

—পান? কেন?—এবার ও না ভেবে-চিন্তেই প্রশ্নটা করেছে।

দু-টাকার নোটটা টেবিলেই পড়ে ছিল। এবার সেটা অরুন্ধতীর দিকে বাড়িয়ে ধরে অঞ্জলিদি বললে, ঐ দোকান থেকে যদি তিন খিলি পান কিনে আনতে পারিস আর সেই ছুতোয় যদি ঐ ডনজুয়ানের সঙ্গে আলাপ করে আসতে পারিস তাহলে দীঘায় পৌঁছে তোকে ভরপেট রসগোল্লা খাওয়াবো। যা—

অঞ্জলিদির কোনো কথাই ওর কানে যায়নি। নিজের অন্তর্লীন চিন্তাতেই সে এতক্ষণ বিভোর ছিল—যেন একটা ঘোরের মধ্যে। কী করবে, কী করবে না—এটাই স্থির করে উঠতে পারছিল না। অঞ্জলিদির শেষ শব্দটাই শুধু শ্রুতিপথে প্রবেশ করে ওর মস্তিষ্কে একটা ধাক্কা দিল। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, যাব?

—যেতেই তো বলছি। যা—

ভেবেচিন্তে নয়, জড়পদার্থকে ঠেলে দিলে সেটা যেমন নিউটনের গতিসূত্র মেনে সমুখপানে এগিয়ে যায়, সে ভাবেই হঠাৎ চলতে শুরু করল। ডানে তাকালো না, বাঁয়ে তাকালো না—চলল, চওড়া রাস্তাটা পার হয়ে তার লক্ষ্যের দিকে। নিতান্ত সৌভাগ্য ওর—সে সময় কোনো চক্রযান ছিল না পথে। চায়ের টেবিলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল গল্পের বইটা, আর তার পাশে ওর ভ্যানিটি ব্যাগ।

—অ্যাই, অরু! টাকাটা নিয়ে যা! পান কিনবি কী দিয়ে?

অঞ্জলিদির কথাটা ও শুনতেও পেল না। খালি হাতে রাস্তাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল—না পানের দোকানে নয়, মোটর-গাড়িটার দিকে। দাঁড়ালো লোকটার পাঁজর ঘেঁষে।

লোকটা ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললে, 'দীঘা-সড়কের একান্তে হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।'

অরুন্ধতীর অবস্থা তখন এমন নয় যে, বুঝবে, একটি পরিচিত পঙ্‌ক্তিরও একটা সজ্ঞান 'মিস্-কোট'। সে পলকহীন চোখে তাকিয়ে দেখছিল লোকটাকে। হাতখানেক দূরত্বে দাঁড়িয়ে। লোকটা জানতে চায় এবার, আমার পরিচয় ওঁদের জানিয়েছ নাকি?

অরুন্ধতী বিহ্বলভাবে প্রতিপ্রশ্ন করে, কাদের?

—বাঃ! ঐ যাঁদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলে এতক্ষণ?

—চা? কোথায়?

লোকটা একটা লম্বা টান দিল সিগ্রেটে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, নেশাভাঙ করো নাকি আজকাল? এতক্ষণ চা খাচ্ছিলে না বসে, ঐ দোকানে?

এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ে যায়। একবার পিছন ফিরে তাকায়। দেখে, অঞ্জলিদি আর অতসী অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে বসে আছে। সব কথা মনে পড়ে যায় এবারে। হ্যাঁ, তাই তো! ওরা দাঁড়িয়ে আছে খড়গপুর-দীঘা রোডের একান্তে।

—ওঁদের কি জানিয়েছ, আমি লোকটা কে?

—না তো!

—পান খাবে?

—পান?

—তুমি কি এখনো স্বাভাবিক হতে পারোনি অরু? হ্যাঁ, পান! চায়ের পরে যা অনেকে খায়। তুমিও খেতে সে-আমলে।

অরুন্ধতী এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছে। বুঝেছে, এটা স্বপ্ন, মায়া বা মতিভ্রম নয়। নিতান্ত বাস্তব। একটা কাকতালীয় ঘটনা। কোয়েন্সিডেন্স। যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমায়াতাং মহার্ণবে। মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যেমন দুটি তৃণখণ্ড পরস্পরের সম্মুখীন হয়।

হ্যাঁ, এতক্ষণে ওর মনে পড়ে গেছে—কুণাল প্রথম সাক্ষাতে ঐ কথাটা কেন বলেছিল—'হঠাৎ দেখা'! মনে পড়ে গেল—'আমাদের গেছে যা দিন তা কি একেবারেই গেছে, কিছুই কি নেই বাকি?' অরুন্ধতী সেই ফর্মুলা বাঁধা প্রতিপ্রশ্নটা করল না। কারণ প্রশ্নের জবাবটা ওর জানা। ঐ দেবদুর্লভকান্তির অন্তরের কোনো নিভৃত প্রান্তে নেই এই শ্যামলা মেয়েটির কোনো স্মৃতি! সে আমলে জানত না, কিন্তু আজ জানে, ওর কাছে মেয়ে-মন হচ্ছে ওর পকেটের সিগারেট। তারা সারি সারি প্রতীক্ষা করবে প্যাকেটে। যখন যেটা ইচ্ছে তুলে তাতে আগুন জ্বালবে। টানবে যতক্ষণ মন চায়। তারপর একটা 'সুখটান' দিয়ে ফেলে দেবে মাটিতে—পা দিয়ে ঘষে ঘষে নিবিয়ে দেবে স্টাম্পটার জ্বলুনি।

কুণাল এতক্ষণে পানওয়ালাকে নির্দেশ দিচ্ছে—তিনটে মিঠে-খিলি...হ্যাঁ, জর্দা আলাদা দিয়ো। 'গোপাল' এক-নম্বর। গোপালই তো খাও এখনো?

শেষ প্রশ্নটা অরুন্ধতীকে।

ম্লান হাসল এবার। কী দারুণ অভিনয়! যেন বলতে চায়, দেখো, আজও মনে করে রেখেছি, তুমি সে আমলে কোন ব্র্যান্ডের জর্দা-দেওয়া পান খেতে। যেন সেই দলিতমথিত 'স্টাম্প'টার কথা আজও সে ভুলতে পারেনি। যেন, 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে!'

—দীঘা যাচ্ছ মনে হচ্ছে? তিনজনে? ওরা বুঝি তোমার স্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী? তিন দিদিমণি?

—হ্যাঁ, দীঘাই যাচ্ছি, তবে তিনজনে নয়। এক 'বাস' ছাত্রীকে নিয়ে।

—এক 'বাস'? ওরে ব্বাস! কই? তারা কোথায়?

—তারা তোমার মেয়ের বয়সি, কুণাল!

—দ্য সেম ওল্ড জেলাস লেডি! তোমরা কোথায় উঠবে দীঘাতে?

অরুন্ধতী পুনরুক্তি করল শুধু : তারা তোমার মেয়ের বয়সি, কুণাল!

এবার ও বোধহয় আহত হল। বলল, এতদিন পরে দেখা, কিন্তু তুমি একটাও

সোজা কথা বলতে পারছ না। অবশ্য আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগও পর্বত-প্রমাণ! কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন দেখাই হয়ে গেল তখন বলি, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরি কথা ছিল। শুনবার সময় হবে কি?

—সেই পুরনো কথাগুলো তো?

—না! কিছু নতুন কথা। তাতে শুধু আমার নয়, তোমার স্বার্থও জড়িত।

—বেশ, বলো?

—সেকথা বলার পরিবেশ এটা নয়। তাইতো জানতে চাইছি—দীঘায় কোথায় উঠবে?

অরুন্ধতী সরাসরি জবাব দিল না। সে চায় না কথাটা জানাজানি হয়ে যাক। তার জীবনের চরম লজ্জার কথাটা। ঐ লোকটা কীভাবে তাকে প্রবঞ্চিত করেছিল; কীভাবে 'সুখটান' দেবার পরে স্টাম্পটাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলেছিল! তাই প্রতিপ্রশ্ন করে, তুমিও কি দীঘা যাচ্ছ?

—না। আমি যাচ্ছি আই. আই. টি.। একটা সেমিনারে। কাল সকালে আমার একটা টেকনিক্যাল পেপার পড়ার কথা।

—ও!

—কই বললে না তো, দীঘায় তোমরা কোথায় উঠবে?

—কী হবে জেনে?

—ঠিক আছে। আমি খুঁজে নেব। শোনো, আমি আজ সন্ধ্যার মধ্যেই দীঘা পৌঁছোব। সন্ধ্যাটা ফ্রি রেখো। আমি খুঁজে নেব ঠিক। এক বাস ভরতি মেয়ে...

অরুন্ধতী প্রতিবাদ করে, না! তুমি আমার খোঁজ কোরো না! আমি চাই না, তোমার আমার সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে যাক...প্লিজ—

—কেন অরু? অবৈধ সম্পর্ক তো কিছু নয়? তুমি এখনও আমার বিবাহিতা স্ত্রী...

—থামো! যা বলছি শোনো! তুমি আমাদের হলিডে-হোমে এসো না। কখন তোমার সময় হবে বলো, কোথায় আমাকে অপেক্ষা করতে হবে বলো—কিন্তু প্লিজ কুণাল! কেউ যেন টের না পায়!

—অল রাইট! তাই যদি তুমি চাও তবে তাই হবে। আজ সন্ধ্যা সাতটা দশ মিনিটে বে-কাফের দোতলায়। বে-কাফে চেনো?

—চিনি। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্য কেউ থাকলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না। আমি নেমে আসব। তারপর কোনো নির্জন জায়গায় বসে শুনব—কী তোমার 'নতুন কথা'!

—ধন্যবাদ! কিন্তু তোমার কোনো কৌতূহল হচ্ছে না জানতে?

—না! কারণ আমি জানি, 'নতুন-কথা' বলার হিম্মৎ তোমার নেই। বলবে সেই 'পুরনো কথা'-টাই। হয়তো 'অ্যালিমনি'-র অঙ্কটায় কিছু হের-ফেরই তোমার 'নতুন-কথা'! এই তো?

—'অ্যালিমনি'!

—ইংরেজিটা ভুল বললাম নাকি? 'ডিভোর্স' চাইলে স্ত্রীকে যে খেসারত দিতে হয়, তাকে 'অ্যালিমনি'ই তো বলে।

কুণাল বললে, ঐ তোমাদের বাসটা এসে গেল বোধহয়। এই নাও ধরো—একটা তোমার, বাকি দুটো ঐ ওঁদের, যাঁদের কাছে প্রাপ্য জামাই-আদরটা আমাকে নিতে দিলে না!

অরুন্ধতী হাত বাড়িয়ে পান তিনটে নেয়। কৌতূহল দমন করতে পারে না। বলে, কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে, ওঁরা পান কিনতেই আমাকে পাঠিয়েছেন?

কুণাল বলল না, মেয়েরা কখন কী খেতে চায় তা বুঝবার জন্য ভগবান ওকে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বরাদ্দ করেছেন। বরং বললে, ওঁরা তোমাকে ডাকছেন অরু...

বাসটা এসে দাঁড়িয়েছে। অরুন্ধতী এবার সেদিকে এগিয়ে যায়।

ততক্ষণে অঞ্জলি আর অতসীও এসে গেছে বাসটার কাছে। অরুন্ধতীর হাত-বটুয়া আর গল্পের বইখানা তুলে আনতে ভোলেনি। অঞ্জলিদি অবাক হয়ে বলে, তুই যে কামাল করলি .অরু! অজানা-অচেনা একটা উট্‌কো মানুষকে একেবারে—ভিনি! ভিডি! ভিসি! অ্যাঁ? পান কিনে আনলি, তার পয়সা পেলি কোথায়? দাম দিল কে?

অরুন্ধতী এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছে। বললে, কেন? তোমাদের ডনজুয়ান!

—কী বলে কথা শুরু করলি?

জবাব দেওয়ার সুযোগ হল না ওর। অ্যাসিস্টেন্ট হেডমিস্ট্রেস অমিয়াদি ততক্ষণে তাগাদা দিতে শুরু করেছেন ঃ গেট আপ্! গেট আপ্! খোশ-গল্প বাসে উঠে হবে।

তড়িঘড়ি সবাই উঠে পড়ে বাসে।

—অরু! অ্যাই অরু! তোর কী হয়েছে বল তো?

আঁচলে টান পড়ায় স্মৃতিচারণে ক্ষান্ত দেয়। এতক্ষণ সে তার ফেলে-আসা জীবনের সাতাশটা বছরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। বেণীদোলানো কিশোরী বয়স থেকে যৌবরাজ্যে পদার্পণ আর তারপরের সেই অমৃত-গরল মেশানো দিনগুলো। কালবৈশাখীর ঝড়ে মুহূর্তে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল তার জীবনে—যে দুর্ঘটনার মূলে ঐ আগুন-বরণ ছেলেটা। তারপর ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে ঐ খড়গপুরের জগত্তারিণী গার্লস স্কুলের চৌহদ্দিতে। আঁচলে টান পড়ায় সেসব স্মৃতিচারণ থেকে ফিরে আসে বাস্তবে; মনে পড়ে যায়—সে বসে আছে দীঘাগামী মিনিবাসের গর্ভে। তার আশেপাশে, সমুখে-পিছনে প্রজাপতির মতো এক ঝাঁক কিশোরী আর বালিকা। অমৃত-গরলের স্বাদ যাদের অজানা। আর ঠিক তার পাশের সিটেই বসে আছেন অঞ্জলিদি। তিনিই ওকে ডাকছেন।

অরুন্ধতী সামলে নিয়ে বলে, হয়নি তো কিছু! কী আবার হবে?

—তবে তখন থেকে গালে হাত দিয়ে কী এমন ভাবছিস? গল্পের বইটাও তো খুলিসনি?

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি গোয়েন্দা-গল্পের বইটার সেই নির্দিষ্ট পাতাটা খোলে—সেই যেখানে চুম্বন-তৃষিতাকে গলা-টিপে...

তাতে বাধা দিয়ে অঞ্জলিদি বলেন, তখন সুযোগ হয়নি, এখন বল দিকিন—কী বলে কথা শুরু করেছিলি?

প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি, তবু যেন বোঝেনি এমন ভান করে বলে, কখন?

—ন্যাকা! সেই যখন থেকে গুম মেরে বসে আছিস! ডনজুয়ানের পাঁজর ঘেঁষে পান কেনার পর থেকে?

অরুন্ধতী বুদ্ধি খাটায়। বুঝতে পারে, তার ভাবান্তরটাকে ওরা অন্য চোখে দেখছে। ঐ লোকটা যে তার সুপরিচিত—তার দিনের ধ্যান, রাতের স্বপ্ন আর সর্বনাশের মূর্ত প্রতীক, এই তথ্যটা যেন জানাজানি না হয়ে যায়! তার গোপন কথা এরা কেউ জানে না। স্কুলে 'ম্যারিটাল-স্টাটাস্' জানাতে হয়েছিল চাকরি নেবার সময়—হ্যাঁ, সে বিবাহিতা! ব্যস! ঐটুকুই। তার বেশি সে আর কিছু কাউকে জানায়নি। তাই তাড়াতাড়ি বলে, আমি ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে সরাসরি বললুম, 'কিছু মনে করবেন না, ঐ সামনের দোকানে আমার দুই বান্ধবী আছেন। ওঁরা বাজি ধরেছেন, আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে গেলে ওঁরা আমাকে দীঘা পৌঁছে রসগোল্লা খাওয়াবেন। আপনি কি দয়া করে দু-চারটে কথা বলবেন?'

—ও মা! পারলি এমন করে বলতে?

—কেন পারব না? এ তো নিছক সত্যি কথা! এ-কথা বলায় বাহাদুরিটা কোথায়?

অঞ্জলিদির ওপাশ থেকে অতসীও গলা বাড়ায়। তারও দুরন্ত কৌতূহল ছিল। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরও দু'-চারটি উঁচু ক্লাসের ছাত্রী উৎকর্ণ হয়েছে বুঝতে পেরে ওঁরা নিজেদের সামলে নিলেন।

বাসটা আপনমনে ছুটে চলেছে দক্ষিণমুখো—পিচমোড়া সড়ক ধরে।

অরুন্ধতী নিজের অন্তর্লীন চিন্তাতে আবার নিমগ্ন হয়ে যায়।

অঞ্জলিদিও!

অরুর ঐ কৈফিয়তের সূত্র ধরে তিনিও মনে মনে ফিরে গেলেন তাঁর তারুণ্যের দিনগুলিতে। প্রায় একই রকম ঘটনা একটা ঘটেছিল বটে এই প্রায়-প্রৌঢ়ার জীবনে। আজ না হয় অঞ্জলিদি জগত্তারিণী স্কুলের একজন রাশভারী স্কুল-মিস্ট্রেস; তাই বলে কি তাঁর জীবনেও সেই অবাক দিনগুলি আসেনি—সেই যখন কথা বলতে গেলে গলায় গান গুনগুন করে উঠত, পথে চলতে গেলে মনে হত ডানায় ভর দিয়ে আকাশ পাড়ি দিচ্ছি? চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই এই বিগতভর্তা অঙ্কের দিদিমণিকে দেখলে সেসব দিনের কথা কল্পনা করাও শক্ত।

স্বীকার্য—আহা-মরি সুন্দরী কোনোকালেই ছিল না অঞ্জলি দত্ত। সাধারণ বাঙালির

মেয়ের তুলনায় রীতিমতো দীর্ঘাঙ্গী—পাঁচ ফুট চার! গর্ব করার মতো ছিল ঘনকালো কেশ। কেশতৈলের বিজ্ঞাপনের মডেল হতে পারত সে; কিন্তু তেমন কোনো প্রস্তাব আসেনি ওর জীবনে। তবু প্রাকৃতিক নিয়মে যথারীতি তার অঙ্গে অঙ্গে এসেছিল অনঙ্গের অতলান্ত উচ্ছ্বাস, যুগ্মউরসে গড়ে উঠেছিল মদনের জয়স্তম্ভ আর আলুলায়িত কুন্তলে মীনকেতনের জয়ধ্বজা। কিন্তু হলে কী হবে—গায়ের রঙটা যে রীতিমতো কালো! বাপ-মায়ের নির্দেশে বারে-বারেই পা-মুড়ে বসতে হয়েছে নির্বাচকদের সম্মুখে। তাঁরা মিষ্টান্ন ধ্বংস করে যাবার সময় যথারীতি বলে যেতেন 'পরে চিঠি লিখে জানাব।' অনেকে সৌজন্যের নল্‌চের আড়ালে জানাতেন—'কুষ্ঠিতে মিলল না', আবার কেউ কেউ ঠোঁটকাটার মতো স্পষ্টই জানিয়ে দিতেন—'আপনি বলেছিলেন আপনার কন্যাটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কিন্তু...'

এইভাবেই কেটে গেছে ওঁর যৌবনকালের সেই উপেক্ষিত দিনগুলো। এই নাড়ামুড়া ভরা মাঠের মতো। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেদিনীপুর জেলার চষা খেত। ধানকাটা সারা। ধুধু মাঠে জনমানব নেই। বাতাসে কেঁপে-কেঁপে উঠছে গরম হাওয়া। দূর আকাশের নিঃসীমায় ভাসছে দু-একটা একান্তচারী চিল!

ঐ ঊষর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অঞ্জলি দত্তের মনে পড়ে গেল তাঁর যৌবন-মরুভূর এক নিদাঘ-অপরাহ্ণের মরূদ্যানের কথা। অরুন্ধতীর এই বাজি ধরার কাহিনীর সূত্র ধরে। নির্মেঘ আকাশে ফুটে উঠল সেই নাম-না-জানা ছেলেটার মুখ। এখন—বেঁচে থাকলে—সে প্রৌঢ়। কিন্তু তখন সেও ছিল তারুণ্যে ভরপুর। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, আর চোখ দুটো দুষ্টুমিতে ভরা। নিতান্ত অসভ্য। অভদ্র!

অঞ্জলি দত্তের বয়স তখন বিশ-একুশ। স্কুল-ফাইনাল পর্যায় থেকেই মেয়ে-দেখানো-ব্যাপারটা চলছে। ও এমনিতে ছাত্রী ছিল ভাল, তার উপর বুঝে নিয়েছিল শ্যামলা রঙের—না হয় ঘোর কালো রঙই হল—মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে প্রথমে দরকার স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা। আর তার একমাত্র পথ পড়াশুনাটা চালিয়ে যাওয়া। অঞ্জলি হায়ার-সেকেন্ডারি পাশ করে ভর্তি হয়েছিল যাদবপুরে, অঙ্কে অনার্স। সহপাঠীদের কারও কারও সঙ্গে আলাপ হলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

সেই বিশেষ দিনটি ছিল আসন্ন ফাল্গুনের। কলেজ ক্যাম্পাসের রাধাচূড়া আর গুলমোহরের পাতার অন্তরালে অগুন্‌তি কুঁড়ি মুঞ্জরিত হয়ে ওঠার জন্য প্রহর গুনছে। কোন গাছের ফাঁকে একটা বে-আক্কেলে কোকিলের যেন আর তর সইছে না। এখন থেকেই কুহু-কুহু ডাক জুড়ে দিয়েছে। শিউলি ফুলের গন্ধ এখনো লেগে আছে বাতাসে। আকাশে কিউমিউলাস মেঘের পুঞ্জ-পুঞ্জ সম্ভার নিঃশেষিত হয়নি।

অঞ্জলি দু-নম্বর গেট দিয়ে একাই বেরিয়ে এল বাস-স্টপে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামেনি। পথ-ঘাট ফাঁকা ফাঁকা। তার কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগে বই-খাতা, হাতে বেঁটে

ছাতা। কিছু দূরে আরও দু-একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসের প্রতীক্ষায়। ছাতিম গাছতলায় এক ভাগ্যবতী—রঙটা ফর্সা—তার বন্ধুর সঙ্গে ফিসফিস করছে। রাস্তার উল্টোদিকের বাসস্ট্যান্ডে তিন-চারটি ছেলে—অনেকেরই মুখ চেনা, নাম জানে না। বোধকরি তারাও আছে বাসের প্রতীক্ষায়। উল্টোমুখো বাস ধরবে তারা। হঠাৎ নজর হল সেই ছেলেগুলোর মধ্যে কী নিয়ে হাত কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেছে। আপসে মারামারির ভঙ্গি। ব্যাপার কিছুই নয়—একজনের পকেট থেকে উদ্ধার করা গেছে এক প্যাকেট সিগ্রেট। তাতে সিগ্রেট আছে যতগুলি তার চেয়ে দাবিদার বেশি। হঠাৎ নজর হল, একজন তর্জনী-সংকেতে রাস্তার বিপরীত প্রান্তের বাস-স্ট্যান্ডের দিকে কী-যেন দেখাচ্ছে। অঞ্জলিকেই নাকি?

অঞ্জলি দৃষ্টিটা সরিয়ে নেয়। রাস্তার মাঝখানে এগিয়ে এসে তাকিয়ে দেখল বাস দেখা যাচ্ছে কি না। না, লরির পরে লরি, তারপর একটা অ্যাম্বাসাডার। উজান-ভাঁটি কোনো দিকেই বাস আসছে না।

দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনতে এবার নজর হল ফুটপাথ থেকে একটি ছেলে দলছুট হয়ে এপারে এগিয়ে আসছে। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না—স্থির লক্ষ্যে! ঠিক তখন অরু যেমন রাস্তাটা পার হয়ে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিল ডনজুয়ানের দিকে।

এ কী! ছেলেটা যে সরাসরি ওর দিকেই এগিয়ে আসছে!

না, একে আগে কখনো দেখেনি। ওদের ক্লাসে তো নয়ই, যাদবপুর ক্যাম্পাসেও নয়।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

একেবারে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, মাপ করবেন, আপনার নাম কি মিস অঞ্জলি দত্ত?

যে-আমলের কথা তখনো কলেজের ছেলে-মেয়েরা পরস্পরকে 'তুই' সম্বোধন করত না।

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো...

—না, আপনি আমাকে চেনেন না। আমি যাদবপুরে পড়ি না। কিন্তু ওদের নিশ্চয় চেনেন? ওরা আপনার সঙ্গেই পড়ে। ওরাই চিনিয়ে দিল।

অঞ্জলি বিরক্ত হল। ছেলেটার পরনে দামি কর্ডের প্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে স্পোর্টিং শার্ট, হাতে ডিজিটাল ঘড়ি—যা সে আমলে সদ্য আমদানি। বড়লোকের আদুরে গোপাল নির্ঘাত। আরও লক্ষ হল, রাস্তার ওপাশের ছেলেগুলো—সিনেমার ভাষায় 'ফ্রিজ' হয়ে গেছে! চোখ দিয়ে গিলছে ওদের দুজনকে।

অঞ্জলি বললে, তা তো বুঝলাম; কিন্তু হঠাৎ এভাবে রাস্তার মধ্যে আমাকে আক্রমণ করার মানে?

হয়তো একটু চড়া গলায় বলেছে—ওপাশের মেয়ে দুটিও ওদের দিকে ফেরে। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

—না, না! এসব কী বলছেন? আক্রমণ কেন? আমি আপনার কাছে একটি ভিক্ষা নিয়ে এসেছি। প্রত্যাখ্যান করলে ফিরে যাব। বুঝব, আমার বরাতটা খারাপ!

অঞ্জলি কোনো কৌতূহল দেখায় না। নীরবে অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। না আবাহন, না বিসর্জন! দেখাই যাক না—ঘটনা কোনদিকে গড়ায়।

—অভয় দেন তো, প্রস্তাবটা পেশ করি?

অঞ্জলি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ভনিতা ছেড়ে কী বলতে এসেছেন বলে ফেলুন।

একটু বোধহয় নার্ভাস হয়ে পড়ল একথায়। ওর বাঁ-হাতে ছিল সিগ্রেটটা। ডান হাত পিছনে লুকানো। সিগ্রেটটা ঠোঁটে চেপে বাঁ-পকেট থেকে এবার বার করল একটা সিল্কের রুমাল। সেন্ট দেওয়া আছে নিশ্চয়! একটা দামি ফরেন-মেড সেন্টের সুবাস ভেসে এল দমকা বাতাসে। কপালের ঘামটা মুছে এবার বললে, ওরা আমার সঙ্গে বাজি ধরেছে—এই ফুলের গুচ্ছটা...

ডান হাতটা এবার সে সামনের দিকে নিয়ে আসে। কৃষ্ণচূড়ার একটা মঞ্জরী...

—মানে এটা আপনার খোঁপায় গুঁজে দিয়ে যেতে পারলে ওরা পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াবে।

অঞ্জলি বজ্রাহত। কী দুঃসাহস ছেলেটার। অচেনা-অজানা একটা মেয়ে! তাকে মাঝরাস্তায় পাকড়াও করে প্রথম প্রস্তাবেই বলছে—মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিতে চায়! কথা ফোটে না ওর মুখে।

—আপনি কি দয়া করে অনুমতি দেবেন? 'কালো কেশে রাঙা কুসুম...'

হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল!

জলে-ডোবা মানুষ নাকি দম বন্ধ হবার পূর্বমুহূর্তে তার বিগতজীবনের ইতিহাসটা এক দণ্ডে দেখতে পায়। শোনা কথা—অঞ্জলি জানে না সত্য মিথ্যা; কিন্তু ঐ অতিপরিচিত গানের কলির একটা অসমাপ্ত চরণ ওর চোখের সামনে হঠাৎ মেলে ধরল ওর বিড়ম্বিত কুমারী জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস।

কারণ ছিল। যে আমলের কথা তখন তারাশঙ্করের 'কবি' বাজারের হিট ছবি। ঐ গানের কলিটা সবার মুখে-মুখে ফিরত। ছেলেটি হয়তো কুন্তল-গরবিনীকে কম্‌প্লিমেন্টসই দিতে চেয়েছিল; কিন্তু বারে বারে প্রত্যাখ্যাতার স্মরণে উদয় হল তার পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিটা: কালো যদি মন্দ...

অঞ্জলি কালো। বাঙালি মধ্যবিত্ত-ঘরের অনূঢ়া কালো মেয়ে। তাই ঐ ছেলেটা অযাচিতভাবে তাকে নিয়ে কৌতুক করতে এসেছে! ফুলটা বাড়িয়ে ধরার আগেই অঞ্জলি গর্জন করে ওঠে, থামুন!

—কী হল?

—পাঁচ টাকার রসগোল্লার লোভ কি এমনই বেশি যে, অপরিচিতা একটি কালো মেয়েকে মাঝ-সড়কে অপমান করতে আপনার বাধে না?

—অপমান! কী বলছেন আপনি!

—তাছাড়া কী? শুনুন...

হাতবটুয়া হাতড়ে ইতিমধ্যে বার করে ফেলেছে একটা পাঁচ টাকার নোট। সেটা বাড়িয়ে ধরে বললে, আমিই আপনাকে পাঁচটা টাকা দিচ্ছি, রসগোল্লা কিনে খাবেন।

এবার বজ্রাহত হবার পালা ও তরফের। বললে, ছিঃ! কিন্তু আমি তো আপনাকে স্পর্শ করতে চাইনি। বাজি বাজিই। পাঁচ টাকা কি পঞ্চাশ টাকা সেটা বড় কথা নয়...মানে, এতে তো আপনার কোনো ক্ষতি হত না...

—হত। সে আপনি বুঝবেন না। আরশোলা, শুঁয়োপোকা আর আপনার মতো অপরিচিত পুরুষের আঙুলের ছোঁওয়ায় আমার কেমন গা বমি বমি করে... সরুন। আমার বাস এসে গেছে...

সত্যিই বাসটা এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

অঞ্জলি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিল বাসের পাদানিতে।

অপরিচিত প্রত্যাখ্যাত ছেলেটি কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী হাতে বজ্রাহতের মতোই দাঁড়িয়ে রইল!

দুটি ঘটনার একটাই সাদৃশ্য। অপরিচয়ের দূরত্বকে অস্বীকার করা যৌবনের কিছু লালিমা। বিশ-ত্রিশ বছরের আগুপাছু দুটি ঘটনার ঐটুকুই যোগসূত্র। সেবার ছিল কৃষ্ণচূড়ার উপেক্ষিত লালে-লাল রক্তিমাভা, এবার গোপাল জর্দা দেওয়া লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট।

না! আরও একটি সাদৃশ্য আছে। সেবার সেই প্রথম সাক্ষাৎই হয়েছিল শেষ সাক্ষাৎ। ঐ দুঃসাহসী ছেলেটার কোনও খোঁজই আর পায়নি অঞ্জলি, এবার যেমন—অঞ্জলিদি তার ধারণা অনুযায়ী ভাবে—ঐ অজানা ছেলেটার সঙ্গে অরুন্ধতীর আর কখনো সাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু এই খণ্ডমুহূর্তটা কি অরুন্ধতীকেও তেমনি করে নাড়া দিয়ে গেল?

মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই—প্রৌঢ়া অঞ্জলি দত্ত—জগত্তারিণী গার্লস স্কুলের অঙ্কের দিদিমণি অন্তত নিজের কাছে স্বীকার করে সেই নিদারুণ লজ্জাকর কথাটা!

ছেলেটা ওর স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসত। বারে বারে। বাড়িয়ে দিত একটা কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ। আর অনূঢ়া উপেক্ষিতা অঞ্জলি স্বপ্নের মধ্যে কিছুতেই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে পারত না ফুলের গুচ্ছটা।

পরে ওর মনে হয়েছিল—হয়তো রাগ করা ঠিক হয়নি। হয়তো শুধু কৌতুকের বশে একটা কালো মেয়েকে নিয়ে খেলা করতেই সে এগিয়ে আসেনি। সপ্তপদ একসঙ্গে যেতে হয়তো ছেলেটা রাজি হত না; কিন্তু প্রথম যৌবনে এক সাথে তিন-চার-পাঁচ পা যাওয়ারও তো একটা মূল্য আছে! 'কালো কেশে রাঙা কুসুম' শুনে এতদূর খেপে গিয়েছিল যে, বাসে উঠে জানলা গলিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা ছুঁড়ে মেরেছিল ঐ ছেলেটির মুখ লক্ষ্য করে। চলন্ত বাস থেকে দেখতে পায়নি সেটা সে আদৌ কুড়িয়ে নিয়েছিল কিনা।

নিয়েছিল। সেটা জানতে পারে অনেক পরে।

ঘটনার পরে ধীর-স্থির মস্তিষ্কে ভাবতে বসে ওর মনে হয়েছিল ছেলেটা কোনো দিক থেকেই ওকে অপমান করেনি, করতে আসেনি। ছেলেটা বেপরোয়া, বাজি লড়ে একটা বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছাটা হয়তো প্রবল ছিল। কিন্তু অঞ্জলির ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে ছেলেটা খানিকটা নার্ভাসও হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পরেও ঘটনার রেশ ওর মন থেকে মুছে যায়নি। বরং স্বপ্নের মধ্যে বারে বারে ছেলেটাকে দেখে কেমন যেন একটা 'অবসেশনে' পেয়ে বসেছিল অঞ্জলিকে। হয়তো বাজি ধরা একটা ছুতো! হয়তো ছেলেটা এগিয়ে এসেছিল ওর সঙ্গে আলাপ করতেই—যৌবনের স্বাভাবিক প্রেরণায়। হয়তো অঞ্জলির কৃষ্ণবর্ণের গাত্রচর্মের তলায় যে মনটা, যে নারীসত্তা, তাকেও দেখতে পেয়েছিল প্রেমের রঞ্জন রশ্মি দিয়ে!

শেষমেশ একদিন কলেজে-করিডোরে পাকড়াও করেছিল ওর এক সহপাঠীকে। রীতিমতো দুঃসাহসিকার মতো। ছেলেটার নাম জানত না; কী কম্বিনেশন তাও নয়। কিন্তু লজিকের পাস-ক্লাসে ওকে প্রায়ই দেখেছে; চিনতে পেরেছে—এও ছিল রাস্তার ওপারে সেই অবাক অপরাহ্নে। এ নিশ্চয় চেনে সেই দুঃসাহসী যুবকটিকে—যাকে অঞ্জলি যাদবপুর ক্যাম্পাসে এই এক মাসের মধ্যে একবারও দেখেনি।

—শুনছেন?

ছেলেটা রীতিমতো চমকে উঠেছে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বললে, আমাকে বলছেন?

অঞ্জলি এগিয়ে এসেছিল কয়েক পা। বললে, আপনারও 'লজিক' আছে, নয়?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?—রীতিমতো সশঙ্ক প্রশ্ন।

—গত মঙ্গলবার আমি ক্লাসে আসিনি। আপনি কি নোট নিয়েছিলেন?

যে আমলের কথা তখন ছাত্রীরাই ক্লাসে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। কোনো ছাত্রী এগিয়ে এসে এমনধারা প্রশ্ন করলে—তা সে হোক না কালো-মেয়ে—ছেলেরা বর্তে যেত। কোনো মেয়ের হাত থেকে বই পড়ে গেলে তিনটে ছেলের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যেত, সবার আগে কুড়িয়ে নেবার উৎসাহে। আর ও ছেলেটা অম্লানবদনে বললে, আম্মো আসিনি। নোট নিইনি তো!

—ও! আচ্ছা মাসখানেক আগের একটা ঘটনা আপনার মনে আছে?

ছেলেটা স্পষ্টতই সিঁটিয়ে যায়! মনে মনে বোধ করি বলে, যেখানে বাঘের ভয়... আমতা আমতা করে বলে, কোন ঘটনা?

—বাস স্ট্যান্ডে। আপনারা বাজি ধরেছিলেন...

—আমি...আমি ছিলাম না সে দলে!

কী ভেবেছে বোকা ছেলেটা? অঞ্জলি ওদের নামে কমপ্লেন করবে? হেসে বলে, বাজে ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি ছিলেন! আমি চিনতে পেরেছি আপনাকে...

—না, না, আপনার ভুল হচ্ছে। আমি কিছু জানি না!

দুরন্ত ভয়ে হনহনিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ছেলেটা।

এরপর আর নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানের কোনো চেষ্টাই করেনি। হয়তো ভুলেই যেত, যেতে পারেনি কয়েক মাস পর পর স্বপ্নের মধ্যে সেই অপরিচিতের দুঃসাহসিক আবির্ভাবে।

তারপর একদিন তার পরিচয় পেয়েছিল অঞ্জলি। প্রায় পাঁচ বছর পরে।

এম. এ. পাশ করার পর বেড়ালের ভাগ্যে একদিন সত্যিই শিকে ছিঁড়ল। সম্বন্ধ করেই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন অঞ্জলির বাবা। পাত্রটি সদাগরি অফিসের কেরানি। বিনা পণে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এ জন্য যে, তিনি নিজেও পড়েছিলেন বিপদে। বয়স ছিল না বিয়ের, অথচ প্রথমা পত্নী একটি সদ্যোজাত শিশুকে রেখে লোকান্তরিতা হয়েছিলেন। হোক দোজবরে, তবু বিয়েতে কয়েকজন সহপাঠিনীকে নিমন্ত্রণ করেছিল অঞ্জলি। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে—অপর্ণা সাহা—নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল। একটা মস্ত ফুলের 'ব্যুকে' ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এটা নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনে দিয়েছে আমার ফুলদা, সীতাংশু সাহা—চিনিস?

—না। দেখেছি কোনো দিন তোদের বাড়ি?

—দেখেছিস। তবে আমাদের বাড়িতে নয়। কলেজ গেটে। ফুলদা একটা বাজি ধরে তোর খোঁপায় একটা ফুল গুঁজে দিতে চেয়েছিল। মনে আছে?

—তুই কেমন করে জানলি?

—ফুলদাই বলেছিল ঘটনাটা সবিস্তারে। তোকে এই পাঁচ টাকার নোটটাও ফেরত দিয়েছে!

—আশ্চর্য! তাহলে এতদিন বলিসনি কেন আমাকে!

—ব্বাস্ রে! অত সাহস আমার নেই। শেষকালে ফুলদার অপরাধে তুই যদি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিতিস?

অঞ্জলির সেটা ফুলশয্যার রাত্রি। ফুলের তোড়ার মাঝখানে ছিল একটা লালে-লাল কৃষ্ণচূড়া!

অর্পণা এবার ওর কানে-কানে বলেছিল, ফুলদা কিন্তু তোকে 'অপমান' করতে চায়নি আদৌ।

অঞ্জলি দাঁতে-দাঁত চেপে বলেছিল, জানি!

—তা হলে ফিরে গিয়ে তাকে বলব, 'তুই ওকে ক্ষমা করেছিলি?'

—না!

—না? তবে কী বলব?

—বলবি, অঞ্জলি বলেছে, অপর্ণার ফুলদাটা একটা কাওয়ার্ড!

চক্রযানটা দিগন্তে বিলীন হয়ে যাবার পরেও কুণাল গাড়িতে স্টার্ট দিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পনেরোটা মিনিট ধোঁয়ায় পরিণত করল ইন্ডিয়া-কিং-এর অনুপানে। ওর মনে হল—এ একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। ছপ্পড়-ফোঁড় সুযোগ! ভগবান-নিয়তি-পাপপুণ্য এসব

কুসংস্কার ওর নেই, কোনোদিন ছিল না। ও প্র্যাকটিক্যাল্। ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে এ একটা নিতান্ত কোয়েন্সিডেন্স—কাকতালীয় ঘটনা। ঠিক এই দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সিগ্রেট কেনা—এমন একটি খণ্ড-মুহূর্তে যখন ঐ ভিন্ন চক্রপথের যাত্রিণী সামনের দোকানে বসে চা পান করছে। পাঁচ-দশ মিনিট আগে-পিছে হলেই কেউ কারও সাক্ষাৎ পেত না। অরুর সহযাত্রিণী যদি ওকে কিছু একটা না বলতেন, তাহলে সে পিছন ফিরে দেখত না, চোখাচোখি হত না। এমন একটা মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্স যখন এসেছে তখন সেটার সদ্ব্যবহার করা দরকার। তা করতে পারলে তার জীবনের একটা মারাত্মক জটিলতা থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। ভুল একটা সে করেছিল—মারাত্মক ভুল! তা থেকে মুক্তি পাওয়ার হয়তো এই সুযোগ!

তাড়াহুড়ো করাটা কোনো কাজের কথা নয়। সমস্ত পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখতে হবে। তারপর মনে মনে ছকে ফেলতে হবে পরিকল্পনাটা। অরুন্ধতীকে বেছে নেবার সুযোগ সে দেবে। ফেয়ার ডিল! সহজ সরল স্বাভাবিক সমাধানটা যদি সে গ্রহণ করে তাহলে দুপক্ষেরই মঙ্গল। না নাও, ওয়েল, তাহলে তার ফল ভোগ করো! পথের দাবি তোমারও আছে, আমারও আছে। তোমাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছি, চলে যাও পাশ কাটিয়ে। যদি না যাও, যদি জগদ্দল পাহাড়ের মতো আমার পথের সামনে দুর্ভেদ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাই তোমার জীবনের ভাইকেরিয়াস্ এঞ্জয়মেন্ট বলে মনে করে থাকো, তাহলে আমাকেও ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে পাহাড়টাকে! নাউ অর নেভার!

ওর কলকাতা অফিস জানে—ও খড়গপুরে এসেছে একটা সেমিনারে যোগ দিতে। আই. আই. টি-তে। স্থপতিবিদ্‌দের একটা বার্ষিক সম্মেলন। অফিসের সবাই জানে শনি-রবি দুটো দিন, দুটো রাত সে খড়গপুরে আছে। কোথায়—তা ওর কলকাতা অফিস জানে না। মানে, ও এখানে কোথায় রাত্রিবাস করবে। আই. আই. টি. গেস্ট-হাউস, পি. ডাব্‌লু. ডি-বাংলো অথবা খড়গপুরের কোনো হোটেলে। ও যতক্ষণ না নিজে থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করছে ততক্ষণ কোনো এমার্জেন্সিতেও কেউ ওর সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে কথা বলতে পারবে না। সে যে খড়গপুরেই দুটো রাত কাটায়নি এটা প্রমাণ করা যাবে না!

কিন্তু নাঃ। এসব কথা এখনই উঠছে কেন? হতে পারে অরু পিগ-হেডেড, কিন্তু নিজের স্বার্থটাও কি সে বুঝবে না? ওর মুক্তিপণ হিসাবে লোভনীয় একটা প্রস্তাবই দিতে হবে। টাকাই! তাকে 'অ্যালিমনি'ই বলো আর 'সোনামণি'ই বলো! আদরে-সোহাগে মেয়েটা গলে যেতে পারে! 'যেতে পারে' কেন? যাবেই। সম্মোহনী বিদ্যাটা কুণালের সহজাত। আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে পেরেছে ওর অমোঘ আকর্ষণ এড়িয়ে যেতে? খেলিয়েছে কেউ কেউ—'নহি নহি বোলয়িবি, মোড়য়িবি গীম'; কিন্তু ধরা দিতে হয়েছে সবাইকেই। অরু অবশ্য ওর উপর খেপে আছে, দুর্দান্তভাবে। একটা মিষ্টি

কথাও সে বলেনি এই রকম একটা রোমান্টিক সাক্ষাতে। তা হোক, মেয়ে-মনকে চিনতে তো আর বাকি নেই! ও যে স্পষ্ট দেখেছে মেয়েটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম কয়েকটা কথার জবাব দেবার সময় সে যেন বাতাসে ভাসছিল—মনেই করতে পারছিল না সে কোথায়! আহা—তা তো হতেই পারে। পাক্কা তিন-তিনটে বছর উপবাসী! এই বয়সে। কত বয়স হবে ওর? ছাব্বিশ? সাতাশ? অনূঢ়া অসূর্যম্পশ্যা সে নয়। পুরুষের নিষ্পেষণে রুদ্ধশ্বাস হবার অভিজ্ঞতা তার ভালই আছে। বিবাহিত-জীবনে না হলেও প্রাক্‌বিবাহ জীবনে। জৈবিক কারণেও তাকে আগিয়ে আসতে হবে!

দ্বিতীয় কথা—সেমিনারে মুখ-চেনা অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবার আশঙ্কা! 'আশা'ই বলা উচিত ছিল, ঘটনাচক্রে এখন সেটা 'আশঙ্কা' হয়ে দাঁড়াচ্ছে! হয়তো ওর ব্যাচের কেউ। সহপাঠী। কিংবা কে বলতে পারে: সহপাঠিনী! লক্ষ রাখতে হবে, তাদের কেউ যেন ওর সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে না যায়। একটা ঝামেলা অবশ্য আছে—কাল সেমিনারে ওর পেপারটা পড়া। সেটার সময় বদলে নেওয়া অসম্ভব হবে না নিশ্চয়ই। ওটা যদি কাল আফটারনুনে করে নেওয়া যায় তাহলে আজ রাত্রে তার পক্ষে দীঘায় রাত্রিযাপনে কোনো অসুবিধে নেই। এভিডেন্স রেখে যে, সে খড়গপুরে আছে।

এভিভেন্স! কী আশ্চর্য! এভিডেন্সের কথা আসে কোত্থেকে? সে তো আর অরুকে খুন করতে দীঘায় যেতে চাইছে না। 'পথের দাবি' সরিয়ে দেওয়া মানে একেবারে খুন করে ফেলা নয়! একটা এস্‌পার-ওস্‌পার! সেটা কী জাতের হবে তা নির্ভর করছে ঘটনা কোন পথে যায় তার উপর। বিশেষ করে অরুন্ধতীর মর্জির উপর। নিজের ভাল সে নিশ্চয় বুঝবে।

লেভেল-ক্রসিংটা ঘটনাচক্রে খোলা পাওয়া গেল। আই. আই. টি. কম্পাউন্ডে গাড়িটা যখন ঢুকল তখনো ক্লকটাওয়ারের বড় ঘড়িটায় সাড়ে-দশটা বাজেনি।

আসন্ন উৎসবের একটা আমেজ শুধু দেখা দিয়েছে। বুকে ব্যাজ এঁটে সুবেশ তরুণ-তরুণীরা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। দেবদারু পাতা দিয়ে তোরণটা বানানোর কাজ সবে শেষ হয়েছে। মাইক টেস্টিং-এর ক্লান্তিকর—'হ্যালো, হ্যালো, ফোর-থ্রি-টু-ওয়ান' এখনো থামেনি।

সেমিনার হবে 'মেইন হল'-এ। ময়দানে একটা চন্দ্রাতপ খাটানো। রিসেপশান কাউন্টার, ওয়েলকাম ব্যানার। এখনো ভিড় হয়নি তেমন কিছু। ওপেনিং-সেরিমনি বেলা একটায়।

রিসেপশান কাউন্টারে বসে ছিল কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। পরিচয় দিতেই একটি সুদর্শনা ছাত্রী এগিয়ে এসে ওর বুকপকেটে ওর নাম-লেখা একটা কার্ড আটকে দিল। জানতে চাইল, ভেজ, না নন-ভেজ?

কুণাল বললে, যেদিন যা জোটে।

—তাহলে নন-ভেজই দিলাম। এই নিন স্যার। ডিনার আর লাঞ্চের টিকেট-প্যাকেট। আর আপনার অ্যাকোমোডেশন—বিশ্বেশ্বরায়া-হলের ফার্স্ট ফ্লোর, রুম-টু।

—থ্যাঙ্কস্। ওটার দরকার হবে না। আমি এ দুদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গেস্ট হতে প্রতিশ্রুত। সিটটা আর কাউকে দিয়ে দিতে পারেন।

কথাটা বলল যেন রিফ্লেক্স অ্যাকশনে। 'বিশ্বেশ্বরায়া-হল' কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতর। সেখানে আশ্রয় নিলে চেনা-জানা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ফলে, সে কখন, কোথায় যাচ্ছে তা গোপন রাখা যাবে না।

মেয়েটি বললে, আমাকে আবার 'আপনি' কেন স্যার? আপনি কোন ব্যাচের?

চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখল। স্বাভাবিকভাবেই একটা দোলা লাগল বুকে। আশ্চর্য! কেন এমনটা হয়? নতুন মুখ, নতুন দেহ, নতুন যৌবন—সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না!

কুণাল তার ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললে, ও বাবা! সে-তো সেই মান্ধাতার বাবার আমল। তোমরা তখন ফ্রক পরে স্কিপিং করতে।

সবাই হেসে ওঠে।

একটি ছাত্র বললে, ফ্রক যদিও পরে না, তবু রুমি এখনো স্কিপ করে, ফিগার ঠিক রাখতে।

কুণাল কথা বাড়ায় না। যদিও তার লক্ষ হয়েছে রুমির মুখ চোখের ভাবে কী যেন একটা ছায়া পড়েছে। মেয়েটি সুন্দরী। বছর বিশ-বাইশ। সম্ভবত অনাঘ্রাতা! তা হোক—এখন ওসব কথা ভাবার সময় নেই! বললে, আর একটা কথা! কাল সকালের সেশনে আমার একটা পেপার পড়ার কথা। ওটা বদলে আফ্‌টারনুনে করা যায় কি? অ্যারাউণ্ড তিনটে?

কাউন্টারের ছেলেটি একটি খাতা দেখে বললে, যায়। ঠিক আছে। কাল বিকাল তিনটে দশ-থেকে তিনটে পঁয়ত্রিশ? ও. কে.!

--দ্যাট স্যুটস্ মি, ফাইন।

কুণাল এবার তার অ্যাটাচি খুলে এক বাণ্ডিল সাইক্লোস্টাইল-করা কাগজ এগিয়ে দেয়। বলে, আমার লেকচারের 'রেশ্যুমে'। এটা যদি সে সময়ে বিলি করার—

—শ্যিওর! দিন আমাকে।

কুণাল ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির দিকে ফিরল।

কিন্তু আবার বাধা! এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বললেন, মাপ করবেন, আপনি কি 'চৌধুরী, চক্রবর্তী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'-এর মিস্টার কে. চক্রবর্তী?

বেঁটেখাটো পাকানো চেহারা। মাথায় চকচকে টাক। সুটেড-বুটেড। কুণাল ওঁকে

চিনতে পারল না। নিজের পরিচয়টা অস্বীকার করতে পারলেই খুশি হত। উপায় নেই। স্বীকার করতে হল।

অবশ্য খুশিই হল। উনি একজন খদ্দের। বহু চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু চাক্ষুষ আলাপ ছিল না। ভদ্রলোক নিজের নামাঙ্কিত ভিজিটিং কার্ডটা ওকে হস্তান্তরিত করতেই জানা গেল উনি হচ্ছেন ডক্টর অনিল মুখার্জি। একটি মেটাল-অ্যালয় ফ্যাক্টারির ইন্সটলেশন এঞ্জিনিয়ার। ঐ কোম্পানির তরফে একটা বড় প্রজেক্ট তৈরি করছে কুণালদের আর্কিটেক্ট্ ফার্ম। প্রায় আশি লক্ষ টাকার কাজ। কারখানার একটা এক্সটেনশান উইং। কাজটা এখন প্ল্যানিং স্টেজে। নক্‌শা ছকা হচ্ছে কুণালের অফিসে, ওরই তত্ত্বাবধানে। আগামী সোমবার এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই ওর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কলকাতা অফিসে। ও জানিয়েছিল—মেশিনগুলোর মাপ জানালেও 'মুভমেন্ট স্পেস' কোথায় কতটা লাগবে তা রিকুইজিশনে ঠিক মতো বলা হয়নি। এজন্য একটা 'অ্যাক্রস-দ্য-টেব্‌ল ডিস্‌কাশান' সাজেস্ট করেছিল সে। ওঁরা জানিয়েছিলেন, আগামী সোমবার কোম্পানির তরফে ডক্টর এ. মুখার্জি আর ডক্টর শ্রীবাস্তব কথা বলতে আসবেন। সোমবার সকাল সাড়ে দশটায়। সব কিছুই মনে ছিল ওর, ডায়েরি না দেখেও। কিন্তু সে ভদ্রলোককে এই খড়্গপুর আই. আই. টি-তে আজ শনিবার বেলা সাড়ে-দশটায় কেন দেখতে হচ্ছে এটা ওর মগজে ঢোকে না।

ভদ্রলোক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। গাড়ি নিয়ে উনি সস্ত্রীক রওনা হয়েছেন বৃহস্পতিবার। এখানে, মানে আই. আই. টি.-তে ওঁর ভায়রাভাই একজন রিডার: কথা ছিল, দুদিন তাঁর ডেরায় বাস করে ওঁরা দীঘা যাবেন বেড়াতে—শনিবার। তারপর রবিবার বিকেলের দিকে কলকাতায় চলে আসবেন, যাতে সোমবার সকালে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে অসুবিধে না হয়। কিন্তু এখানে এসে পড়ে গেছেন এক ঝামেলায়। ভায়রাভাইয়ের একটা স্ট্রোক হয়েছে। করোনারি অ্যাটাক! এটাই প্রথম। এখনো হাসপাতালে। বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেছে। সিরিয়াস নয়; কিন্তু এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে সোমবারে কুণালের অফিসে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। তারিখটা উনি দু-একদিন পিছিয়ে দিতে চান।

কুণাল ওঁর ভায়রাভাইয়ের সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাল; সেটা ভদ্রতা। তাঁর আশু রোগমুক্তির প্রার্থনাও জানাল। তারপর বললে, বেশ তো, আপনি উইকের শেষ দিকে যে-কোনো দিন আসুন। আমি সোমবার কলকাতায় ফিরে যাব, আর এ সপ্তাহে স্টেশান লিভ করছি না। সকাল নটা টু বিকাল সাড়ে-চারটে আমাদের অফিস খোলা। যেদিন আসবেন সেদিন সকালেই আসবেন—উইল লাঞ্চ টুগেদার—সারাটা দিনই লেগে যাবে মনে হয় আলোচনায়। আপনি বরং ফোন করে জানিয়ে দেবেন, কবে আসতে পারবেন। বাই দ্য ওয়ে—এখানে আমার দেখা পাবেন তা কেমন করে জানলেন?

—আপনার অফিসে ফোন করে। ওরা বলল, আপনি খড়্গপুর আই. আই. টি.-তে

আসছেন একটা সেমিনারে যোগ দিতে। তাই এখানে আপনাকে ধরব বলে বসে আছি...

কথা বলতে বলতে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে। ডক্টর মুখার্জী প্রশ্ন করেন, এখানে আপনি উঠেছেন কোথায়?

—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। ভাল কথা, আপনার দীঘা ভ্রমণ তা হলে নাকচ?

—উপায় কী? এরকম অবস্থায় মিসেস মুখার্জি, মানে আমার ওয়াইফ—কি বোনকে ফেলে যেতে পারেন? টাকা-কটা গচ্ছাই গেল—

—টাকা কটা?

—দীঘা টুরিস্ট লজে একা ডাবল-বেডরুম বুক করেছিলাম দুদিনের জন্য। শনি-রবি।

কুণাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, অ্যাডভান্স করেছিলেন বুঝি টি. এম. ও. করে?

—না, অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক-এ। পনেরো দিন আগে।

মুহূর্তমধ্যে মনস্থির করে। বলে, ওরা কনফার্ম করেছিল?

—হ্যাঁ। চেকটা ক্যাশ হয়ে গেছে। কেন বলুন তো?

—কনফার্মেশন-লেটারটা সঙ্গে আছে, না বাড়িতে?

—কেন বলুন তো?

—আমার এক বন্ধু আজই দীঘা যাচ্ছে; ঐ টুরিস্ট-লজেই উঠবে। আপনি ওদের সেই কনফার্মেশন লেটারটা দিন দেখি, আমি ক্যানসেল করিয়ে আনব।

ভদ্রলোক মানিব্যাগ হাতড়ে চিঠিখানা বার করতে করতে বললেন, এত দেরিতে কি টাকা ফেরত দেবে?

—দেবে। আমার বন্ধুটি পুলিশ-অফিসার! টাকাটা কলকাতায় আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। আইনে যদি প্রভিশান নাও থাকে তবুও ওরা রিফান্ড দেবে, আমার পুলিশ-অফিসার বন্ধুকে খুশি করতে।

মুখার্জি-সাহেব খুশি হলেন মনে হল। বললেন, দেখুন চেষ্টা করে। সুযোগ যখন হয়ে গেল—

হ্যাঁ! সুযোগ যখন হয়ে গেল!—ভাবে কুণাল।

গাড়িতে উঠিয়ে দিল ভদ্রলোককে। বললে, খুব টিপটাপ কন্ডিশানে রেখেছেন তো গাড়িটা।

—মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো! নিজেই টুকটাক মেরামতি করি।

ডক্টর মুখার্জি বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। কুণাল পকেট থেকে ডায়েরিটা বার করে শুধু লিখল—WBF 5345.

এবার সে চলল শহরের দিকে। কী করবে, কী করবে না, এখনো স্থির করে উঠতে পারেনি—কিন্তু ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছিল—দীঘাতে চরম একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। সে কোনো রকম—হ্যাঁ, 'এভিডেন্স' রাখবে না তার দীঘায় রাত্রিবাসের। নিয়তি—যদি মানো—তাহলে সেরকমই একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে ওকে। না হলে ভদ্রলোক

কেন তাঁর ভিজিটিং কার্ডটা আর টুরিস্ট-লজের কনফার্মেশন লেটারটা ওকে হস্তান্তরিত করে যাবেন?

খাতা-কলমে সে রাতটা খড়গপুরে আছে। খড়গপুরের কোনো একটা হোটেলে উঠতে হবে। স্বনামে।

রেলওয়ে ক্রসিংটা পার হয়ে কিছু দূর আসতেই নজরে পড়ল একটা ছোট সাইনবোর্ড-এর দোকান। একটা বুড়ো মতো লোক বসে কী যেন লিখছে। কুণাল গাড়িটা পার্ক করে নেমে আসে গাড়ি থেকে। গেঞ্জি-পরা বুড়ো মতো লোকটা তার চশমাটা কপালে তুলে প্রশ্ন করে, কী চাই ছার?

—দুটো সাইন বোর্ড লেখাব। এই ধরুন চোদ্দ ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি। কালো রঙের ওপর সাদা হরফে। কত পড়বে, আর কতক্ষণ লাগবে?

দোকানি প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিল শুধু, বোর্ড দুটোর দাম পাঁচ-পাঁচ দশ টাহা। আর লেখার খরচটা কইতে পারছি না—কী লেখাবেন কন? অক্ষর পিছু দাম—

—একটায় 'এন্ট্রেন্স', একটায় 'এক্জিট'।

দোকানি কান থেকে বেঁটে পেন্সিলটা হাতে তুলে নেয়। একখণ্ড কাগজ হাতে নিয়ে চশমাটাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনে। বলে, ইঞ্জেরি বানানটা বলেন দেহি, ছার?

কুণাল ইংরেজি শব্দ দুটি ধীরে ধীরে বানান করল। দোকানি জানতে চায়, সবই ইঞ্জিরি বড় হরফ?

—হ্যাঁ।

—বোর্ডের দাম দশ টাহা, আর লেখার মজুরি বারো-সিকে, একুনে তেরো টাহা।

কুণাল হিপপকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে। তেরো টাকা হাতে নিয়ে বলে, কতক্ষণ লাগবে লিখতে? দোকানি টাকাটা নিল না। জবাবও দিল না। দুখানি টিনের পাত বার করে দেখায়। বলে, চলবে?

—ওর চেয়ে একটু বড় হলে ভাল হত। তা যাক, ওতেই হবে। তৈরি বোর্ড যখন রয়েছে, আর কালো রঙও করা আছে।

দোকানি ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে বোর্ড দুটি মুছতে মুছতে বলে, এগুলান তৈরিই থাহে। মটর-গাড়ির নম্বর-পেলেট। প্রাইভেট গাড়িতে কালো-পেলেটে সাদায় লিখা হয় তো! আপনে ঘণ্টাখানেক পরে এসে নে-যাবেন।

—এক ঘণ্টা! ঐটুকু লিখতে?

—তা হইব না? বারোটা হরফ! চার মিনিট করে ধরলেও...তার থিকে এক কাজ করেন না ছার? 'প্রবেশ' আর 'প্রস্থান' লিখিয়ে নিন। অক্ষর অনেক কম হবে।

—কথাটা তুমি মন্দ বলোনি। কিন্তু কলেজে সবাই তো বাংলা জানে না। বরং তুমি এক কাজ করো। এক কৌটো সাদা রঙ আর সরু একটা তুলি দাও; আমি কলেজের ছেলেদের দিয়ে লিখিয়ে নেব। এক ঘণ্টা দেরি করা চলবে না।

দোকানি রাজি হল। ছোট এক কৌটো সাদা সিন্থেটিক-এনামেল রঙ আর তুলি এনে দিল। বললে বারো টাহা।

কুণাল বললে, তাহলে হল গিয়ে পঁচিশ টাকা। তেরো আর বারো, ধরো।

গাড়িটা রওনা হয়ে যাবার পর দোকানি আপন মনে হাসল। সে বুঝে নিয়েছে—তার খদ্দের ঐ আই. আই. টি-র এলোভুলো অধ্যাপক! হয়তো আঁক কষায়। না হলে এমন সহজ অঙ্কটাও মুখে মুখে কষতে পারল না? তেরো টাহা হইছিল কেমনে? তার ভিত্‌রি তিন টাহার লিখার খরচ আছিল না? অ্যাঁরাই অঙ্ক শেখান পোলাপানদের!

তিনতলার সিঙ্গল-বেডেড রুমটা পছন্দ হল কুণালের। ম্যানেজার অবশ্য প্রথমেই বলেছিল, আমাদের কিন্তু গ্যারেজ-স্পেস নেই স্যার। গাড়িটা...

কুণাল বলেছিল, গাড়িটা কোনো সমস্যা নয়। ওটা সন্ধ্যা বেলাতেই ফেরত দিয়ে আসব। থাকব আমি একাই। গাড়ির জন্য চিন্তা নেই। শনি-রবি দুদিন।

অগ্রিম টাকাটা মিটিয়ে ম্যানেজার ওকে চাবিটা হস্তান্তরিত করেছিল। রুম থ্রি-টু-ওয়ান। অর্থাৎ তিনতলার একুশ নম্বর ঘর। পেজ-বয় ওর সুটকেসটা পৌঁছে দিল ঘরে। কুণাল বললে, কী নাম তোমার হে?

—বিদ্যাধর আজ্ঞে।

—চিল্‌ড-বিয়ার এনে দিতে পারবে? কল্যাণী ব্রুয়ারিজ?

—দিন স্যার, আঠারো টাকা। স্ন্যাক্‌স্‌ চাই কিছু?

—হ্যাঁ, স্ন্যাকস্‌ নয়, প্যাকেট-লাঞ্চ! তন্দুরি-চিকেন যদি পাও। আর নান রুটি। সালাড! আর শোনো, এখানে কোন সিনেমা হলে কী বই হচ্ছে জেনে এসে বলতে পারবে?

—আমার জানাই আছে স্যার...

খড়গপুর শহরের তিন-চারটি খানদানি সিনেমা-হলে সে-সন্ধ্যায় কী কী ছবি দেখানো হচ্ছে গড়গড় করে আউড়ে গেল। মায় কোন ছবিতে কে কে হিরো-হিরোইন। তার ভিতর একটিই কুণালের দেখা। সেই সিনেমার একটি সান্ধ্য-টিকিট কিনে আনার ফরমায়েশ্‌ করল। ড্রেস-সার্কেল!

বিদ্যাধর বিদায় হতেই ও দরজাটা বন্ধ করে দিল। সুটকেস খুলে বার করল সেই কালো রঙের বোর্ড দুটো। বসল রঙ তুলি নিয়ে।

দোকানি বলেছিল একঘণ্টা। ওর লাগল সতেরো মিনিট। তাও ফ্রি-হ্যান্ডে। অবশ্য ও ENTRANCE-EXIT লেখেনি। দুটি বোর্ডেই লিখল : W. B. F. 5345।

ত্যারচা হয়ে যেখানে রোদ আসছিল ঘরে, সেখানে রোদে মেলে দিল বোর্ড দুটো। তারপর গেল স্নান করতে। ভোরবেলা কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় স্নানটা সারা হয়নি। স্নানান্তে সফরি-স্যুটটা ভাঁজ করে তুলে রাখল সুটকেসে। পোশাকটা বড় নজর কাড়ে! পরল নস্যি-রঙের একটা প্যান্ট আর বিস্কিট-রঙের টেরিকট বুশ-শার্ট। অ্যাটাচি

কেসটা বর্তমানে শূন্যগর্ভ। তাতে এনেছিল সাইক্লোস্টাইলড্-রিপোর্ট, একগোছা। তাতেই ভরে নিল এক রাতের মতো চেঞ্জ। পায়জামা, পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, ড্রয়ার আর হুইস্কির বোতলটা। টুথ ব্রাশ, টুথপেস্ট, শেভিং সেট সাজিয়ে রাখল বাথরুমে। ছাড়া গেঞ্জিটাও। দীঘা যাবার পথে বা সেখানে পৌঁছে এগুলো আর এক সেট কিনে নিতে হবে। সাবধানের মার নেই। কাল সকালে রুম-সার্ভিসের বেয়ারা বা জমাদার হয়তো ডুপ্লিকেট-চাবি দিয়ে ঘর খুলে সাফা করতে আসবে। ওগুলো ছড়ানো না থাকাটা ভাল দেখাবে না! সুটকেসটা রেখে দিল গুডস্ র‍্যাকে।

একটু পরেই বিদ্যাধর পৌঁছে দিল খাবার আর বিয়ার। বলাবাহুল্য, দরজা খোলার আগে কুণাল রোদে-মেলা বোর্ড দুটিকে দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছিল। বিদ্যাধর ড্রেস-সার্কেলের টিকিটও এনেছে একখানা। কুণাল হিসাব বুঝে নিয়ে ওকে বকশিশ্ দিল। টিপস্-এর অঙ্কটা খুব বেশিও নয়, খুব কমও নয়। বেশি হলে ছোকরা বার বার ঘুরঘুর করে দেখতে আসবে—সাহেব ঘরে আছেন কিনা, আরও কিছু সেবা করা যায় কিনা। কম হলে, প্রয়োজনে তাকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানো যাবে না।

বিদ্যাধর নিষ্ক্রান্ত হতেই ও বোর্ড দুটো আবার পেতে দিল রোদে। সিনেমা টিকিটের অর্ধেকটা পুড়িয়ে ছাই করল, ছাইটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। যে অংশটা দর্শকের কাছে থাকবার কথা সেটা সযত্নে ভাঁজ করে রেখে দিল মানিব্যাগে! একটা এভিডেন্স! রাতটা সে খড়্গপুরেই কাটিয়েছে।

ঘড়িটা দেখল একবার। সওয়া এগারোটা বারোটার মধ্যেই রওনা হতে চায় সে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভিতর খেতে খেতে, আর বিয়ারের বোতলটা শূন্যগর্ভ করতে করতে পুরো পরিকল্পনাটা ছকে ফেলা চাই। অবশ্য খড়্গপুর-দীঘা ড্রাইভ করতে করতে ভাববার সময় পাবে। অরুকে সে কী প্রস্তাব দেবে? আর গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো মেয়েটা যদি অস্বীকার করে তাহলে কী-ভাবে পথের কাঁটাকে সে সরিয়ে দেবে।

কুণাল চক্রবর্তী হলেও হতে পারত কন্যাদায়গ্রস্তদের সপ্তম স্বর্গ! মেদবর্জিত দীর্ঘকান্তি, টক্‌টকে গায়ের রঙ, শুকচঞ্চু নাসা, অল্প তামাটে চুল ও গোঁফ, ঠোঁট দুটি একটু পুরু। খেলাধুলায় চৌখস্—শীতে মিডিয়াম-পেস্ বোলার, বর্ষায় লেফট্ আউট। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য। পড়াশুনাতেও খুব ভাল। মাধ্যমিকে তিনটে লেটার, হায়ার সেকেন্ডারিতে দুটো। জয়েন্ট-এন্ট্রেন্সে একবারেই চান্স পায়। মেসোর ইচ্ছে ছিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক, ও নিয়েছিল আর্কিটেকচার। সসম্মানে পাশ করে বেরিয়েছে খড়্গপুর আই. আই. টি. থেকে। বর্তমানে 'চৌধুরী-চক্রবর্তী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'-এর জুনিয়ার পার্টনার। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। মাকে অবশ্য হারিয়েছে শৈশবেই, তাঁর রূপই পেয়েছে কুণাল। বাবা ছিলেন এম. ই. এস.-এর একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে আসাম-কোহিমা অঞ্চলে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তাতে যুদ্ধান্তে তিনি অনায়াসে অবসর নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কাজ-পাগল

মানুষ। তা ছাড়া কী-একটা কেন্দ্রাতিগ প্রেরণায় তিনি আজীবন বাইরে বাইরেই কাটিয়েছেন। ক্রমাগত দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশেষত স্ত্রী-বিয়োগের পর। মাতৃহীন কুণাল মানুষ হয়েছে মাসির কাছে—আদরে-গোবরে!

এমন সর্বগুণান্বিত পাত্রের একটিই ছিল দোষ—মারাত্মক দোষ! প্রায়-কিশোর পর্যায় থেকেই। বাপের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, মেসো টের পেতেন, শাসন করবার চেষ্টাও করতেন, কিন্তু স্নেহশীলা মাসিমার ছত্রছায়ায় চরিত্রগত দোষটা ক্রমশ 'হবিষা-কৃষ্ণবর্ত্মেব' বৃদ্ধিই পেয়ে গেছে। নেশাভাঙ যেটুকু করত সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, সিগারেট খেতে শুরু করে স্কুল-জীবনেই, হায়ার-সেকেন্ডারি পর্যায়ে মদ। ড্রাগ-এর নেশা করে দেখেছে, কিন্তু ড্রাগ-এডিক্ট হয়ে পড়েনি।

ওর নেশা একটাই : নারীমাংস!

ঈশ্বরের আশীর্বাদ—দেবদুর্লভকান্তি রূপ—ওর কাছে শুধু অভিশাপ।

মেসো হতাশ হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। কর্তব্যবোধে ভায়রাভাইকে সব কিছুই জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাসির অত্যধিক আদরে এই প্রবৃত্তিটাকে নিবৃত্ত করাতে পারেননি। মেসো চেয়েছিলেন ওর সকাল-সকাল বিয়ে দিতে, তাতে শুধু কুণাল নয়, তার বাপেরও আপত্তি। তিনি বলতেন, আমাদের পারিবারিক সমস্যাটার মধ্যে অহেতুক একটা পরের ঘরের মেয়েকে জড়ানো ঠিক নয়।

কুণাল মেসোর নজর এড়াতে বরাবরই হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছে। সপ্তাহান্তে শবি-রবি কাটিয়ে যেত মাসির কাছে। ক্রমশই সে হয়ে পড়েছিল বেপরোয়া, বাঁধনছেঁড়া। পড়াশুনাও যেমন করত তেমনি ক্রমাগত গিলত রগরগে বিলাতি যৌন-উপন্যাস। কয়েকটি সহকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মাঝে মাঝে দেখত ব্লু-ফিল্ম। কখনো বা তামাম রাত। মদের বন্যা বয়ে যেত সেসব রাত্রে। কিন্তু একটা আশ্চর্য সংযমও ছিল ওর—যা ছিল না ওর ইয়ার-বন্ধুদের। পেশাদার রূপোপজীবিনীদের সংস্পর্শে ও ভিড়ত না আদৌ! তা সে যতই খানদানি ব্যবস্থা হোক, যতই গ্ল্যামারাস মেয়ে হোক। ওর মন্ত্র ছিল : রুপায় তোমায় ভোলাব না, রূপে-রঙ্গে ভোলাব!

সেটা বুঝতে পেরেছিল ওর ইয়ার-দোস্তরাও! তাই ভুলেও ঐ আগুনের ফুলকিটাকে কেউ বাড়িতে নিয়ে যেত না। আড়াল করে রাখত—দিদি, বোন, বৌদিদের কাছ থেকে। তাদের ধারণা—কুণাল সম্মোহন-বিদ্যার অধিকারী, রাশিয়ান 'রাসপুটিনের' মতো! কুণালের আদর্শ হচ্ছে সেই দিল্লির আজব বাদশা—বোধহয় স্যার যদুনাথের 'লেটার মোঘলস্'-এ পড়েছিল তার কথা। বাদশা হারেম-পোষার ঝামেলা সহ্য করেননি—বেগম অথবা উপপত্নীদের কে রোজ-রোজ খাওয়াবে, পরাবে? হুকুম দিয়েছিলেন—যেমন করেই হোক তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে নতুন একটি যৌবনবতীকে প্রতি সন্ধ্যায় উপস্থিত করতে হবে। পেশাদার রূপোপজীবিনী হলে চলবে না—অনূঢ়া-সধবা-বিধবা যাই হোক, ভদ্রঘরের মেয়ে হতে হবে তাকে। রাত্রিপ্রভাতে নগদ বিদায়সহ তাকে তার সংসারে

ফেরত পাঠাতে হবে; তবে তার পূর্বে মেয়েটির বুকে একটি বিশেষ উল্কি-চিহ্ন এঁকে দিতে হবে! সেটা কেন? বাঃ! ভুলে যদি একই নারী বাদশার শয্যায় দুরাতে শুতে আসে! এক নারী নিয়ে এই স্বল্পমেয়াদি-বাদশাহি জীবনের দু-দুটি রাত্রি কি কাটানো যায়? 'ভূমৈবসুখম'! শোনা যায়, বাদশার এই বাসনা চরিতার্থ হয়নি; কারণ সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও গদি-আসীন হবার অনতিকাল পরেই রতিজ-রোগে বাদশা ফৌত হন।

কুণাল দিল্লির বাদশা নয়। নিত্য-নতুন শয্যাসঙ্গিনী সে জোগাড় করতে পারেনি। তবে প্রখর স্মৃতিশক্তি সত্ত্বেও ও বোধহয় মনে করতে পারবে না সব কয়টি মেয়ের নাম, যারা ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছে।

অনূঢ়া-সধবা-বিধবা! মিলনান্তে আকণ্ঠ পান করে—তা সে অমৃতই বলো, অথবা গরল—সেই যৌবনবতীরা ফিরে গেছে যে-যার সংসারে। না, তাদের কামনা-বাসনার যুগ্ম জয়স্তম্ভের মাঝখানে কুণাল কোনো উল্কি-চিহ্ন এঁকে দেয়নি; কিন্তু ওর দৃঢ় বিশ্বাস, সেই নাম-হারানো মেয়ের দল বক্ষচর্মের গভীরে আজীবন বহে বেড়াবে ঐ সুদুর্লভকান্তি পুরুষটির ক্ষণিক সহবাসের স্মৃতি!

দিব্যি চলছিল। ধাক্কা খেল একবারই। প্রচণ্ড ধাক্কা! ততদিনে ও আই. আই. টি. থেকে ডিগ্রি নিয়ে বার হয়েছে। যোগ দিয়েছে 'চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ'-এ, তখনো সে জুনিয়ার পার্টনার নয়, দয়ানন্দ চৌধুরীর প্রাইভেট লিমিটেড আর্কিটেক্টস্ ফার্মের একজন অফিসার। প্রতিষ্ঠানটার নাম তখন ছিল ঐরকমই। দয়ানন্দ চৌধুরী ওর পিতৃবন্ধু। ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। সেটাই স্বাভাবিক। দয়ানন্দের দুটি মেয়ে, ছেলে নেই। বড় মেয়েটি মার্কিনমুলুকে সংসার করছে। ছোটটিকে নিজের কাছেই রাখতে চেয়েছিলেন। কুনাল যে একটি মাকাল ফল এটা তখনো টের পাননি, তাকে গ্রহণ করেছিলেন নিজের প্রতিষ্ঠানে। মনে মনে এই আশা ছিল—'চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ' কালে হয়ে পড়বে 'চৌধুরী, চক্রবর্তী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'। দয়ানন্দের সে ইচ্ছা পূরণ হয়েছে; কিন্তু যে অন্তিম-ইচ্ছার ওটা প্রথম ধাপ, সেটি এখনো চরিতার্থ হয়নি।

বাপের মনোগত ইচ্ছাটা যে বুঝবে না এতবড় নির্বোধ নয় রাকা। কনভেন্ট-লালিতা আলোকপ্রাপ্তা সে। কুণালদাকে সে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। বদনামও শুনেছে কিছু। কুণালের বাবা প্রমথেশ চক্রবর্তী ওর পিতৃবন্ধু। মাঝে-মাঝে যাতায়াত করতেন। সঙ্গে আসত ঐ আগুনবরণ ছেলেটা। সম্মোহিত করার চেষ্টাও করত। রাকা পাত্তা দেয়নি। ওর নামে কিছু উড়ো-কথা শুনেছিল বলেই সংযত হয়েছিল সে। যদিও দারুণ একটা আকর্ষণ অনুভব করত সে দেহে-মনে। তবু সতর্ক থাকত, কোনোক্রমেই যেন নির্জন সাক্ষাৎ না হয়। হয়তো তখন ও নিজেকে সংযত করতে পারবে না—এমন একটা আশঙ্কাও ছিল!

রাকা বুদ্ধিমতী—সে জানত, উপেক্ষাই এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জাতের হাতিয়ার।

ঘটনাচক্রে ঐ ছেলেটাই চাকরি নিল তার বাবার কোম্পানিতে। কিন্তু সে তো অফিসে। ছুতোনাতায় কুণাল আসতে শুরু করল ওদের বাড়িতেও। রাকা অতি সতর্কভাবে সৌজন্য রক্ষা করে চলত। আয়া বা চাকরকে সঙ্গে না নিয়ে দেখা করত না। কুণাল দু-একবার নানান রকম টোপ ফেলে দেখেছে—সিনেমার টিকিট গ্রুপ-থিয়েটার বা গানের জলসা। ঘটনাচক্রে প্রতিবারেই দেখা গেছে সেই বিশেষ সন্ধ্যায় রাকার অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। হয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া, অথবা পড়াশুনোর অজুহাত। রাকাও যাদবপুরে আর্কিটেকচার নিয়ে পড়ছে।

দয়ানন্দ চৌধুরীর পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি। ছেলে নেই, বড় মেয়েটি মার্কিন মুলুকে। তাই ছোটটিকে আর্কিটেক্ট করে তুলতে চান। তাহলে ভবিষ্যতে এই মেয়েই এ বৃহৎ যজ্ঞের কর্ণধার হতে পারবে—যখন বার্ধক্যের ভারে অশক্ত হয়ে পড়বেন দয়ানন্দ। কিন্তু মেয়ে চিরদিন পরের ঘরে থাকে না। তাকে সংসার করতে যেতে হয়। স্বামী-পুত্র-সংসার না হলে মেয়েদের জীবন সার্থক নয়—এমনই একটা ধারণা ছিল দয়ানন্দের। আর সেজন্যই বন্ধুর ঐ সুদর্শন পুত্রটির প্রতি তাঁর নজর! তাঁর মনোবাসনা চরিতার্থ হলে ওরা দুজনেই নিতে পারবে 'চৌধুরী, চক্রবর্তী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'-এর দায়িত্ব।

বাপ-মেয়ের সম্পর্কটা খোলামেলা। ছেলে নেই, দুই মেয়েই তাঁর নিকটবন্ধু। বিশেষত স্ত্রী-বিয়োগের পরে। খোলাখুলিই প্রশ্ন করতেন, কুণাল ছেলেটাকে তোর কেমন লাগে রে মা-মণি?

রাকা বলত, ওর সম্বন্ধে নানান কথা শুনি, সত্যি-মিথ্যে জানি না।

—হ্যাঁ, আমারও কানে আসে। তবে বিশ্বাস হয় না। যারা ওকে হিংসে করে তারাই হয়তো রটায়।

—হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। তবে ব্যস্ত হবার কী আছে? আমার পরীক্ষাটা মিটে যাক। তুমিও ততদিনে ওকে ভাল করে স্টাডি করে নাও—

—কিন্তু ততদিনে যদি ও অন্য কোথাও...

—তাহলেও আমরা জলে পড়ব না বাবা।

এভাবেই চলছিল প্রথমটায়।

দয়ানন্দ কথাপ্রসঙ্গে প্রমথেশের কাছে প্রস্তাবটা পেড়েছিলেন। তিনি সোজা কথার মানুষ। বলেছিলেন, দয়া, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। রেখে-ঢেকে তোমাকে কিছু বলব না। তোমার মেয়েকে পুত্রবধূ করতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত হব। কিন্তু কুণালকে যেমন ভালবাসি, রাকাকেও ঠিক তেমনি ভালবাসি আমি। তাই খোলাখুলিই বলব ভাই। তাড়াহুড়ো করাটা কোনো কাজের কথা নয়। রাকা পরীক্ষাটা দিক, ইতিমধ্যে তুমিও কুণালকে ভালভাবে বাজিয়ে নাও। বছর খানেক পরেই না হয় প্রস্তাবটা তুলো।

—তার মানে, ওর নামে যেসব উড়ো কথা...

—প্রত্যক্ষজ্ঞানে আমি কিছু জানি না। বাইরে বাইরেই থাকি আমি। ওর মেসো

একরকম বলে, আর মাসি বলে অন্যরকম। সে তো তোমার ফার্মেই জয়েন করেছে। তুমি নিজেই যাচাই করে দেখো না?

প্রথম মাস-ছয়েক এভাবেই কাটল। ততদিনে কিন্তু রাকার পরিবর্তন হয়েছে। ঐ আগুনবরণ ছেলেটা তিল-তিল করে অধিকার করে বসেছে তার কুমারী মন। কিন্তু সে সাবধানী। মনটাই ওর বাঁধন মানেনি, দেহটাকে সংযত রেখেছে প্রাণপণ বলে। একদিন কুণালের প্রস্তাবে সে সরাসরি বলেই বসল, আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখার এত আগ্রহ কেন তোমার?

—সেটা কি বোঝো না?

—না, বুঝি না। শুনেছি তোমার অনেক বান্ধবী। আজ একে, কাল ওকে নিয়ে তুমি 'ডেটিং' করো। কথাটা কি ভুল শুনেছি বলতে চাও?

কুণাল মুখ নিচু করে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, না। ভুল শোনোনি। কিন্তু কী জানো রাকা, মনে হচ্ছে নোঙর ফেলার সময় এসে গেছে এতদিনে—

—এই বন্দরেই?

—মনের মধ্যে সে-রকমই একটা নির্দেশ পাচ্ছি আজকাল।

—কতদিন এরকম নির্দেশটা স্থায়ী হবে? আই মিন, কতদিন পরে আবার মনে হবে—'বন্দরের কাল হল শেষ'?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি। ভেবে নিয়ে বলেছিল, অনেক মিছে কথা বলেছি জীবনে। কিন্তু আজ বলব না। তুমি ঠিকই বলেছ রাকা। আমার মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছে। 'নেতি-নেতি'র পথ আমার। কথাটা সত্যি—অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে। কিন্তু কী-জানি কোথায় একটা বাধা অনুভব করেছি। আমার মনে হয়েছে—ওরা আমার মন ভরিয়ে দিতে পারবে না। আমার নিজের মনকে আমি আজও জানি না। দুটো কথা বলতে পারি—আমার সঙ্গে যদি মেলামেশা করো তাহলে, কথা দিচ্ছি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোদিন তোমাকে স্পর্শ করব না। দুনম্বর কথা এই যে, যদি মনে করো আমার এই বোহিমিয়ানবৃত্তিটা তুমি নিবৃত্ত করতে পারবে না, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্যকে জড়িয়ো না। এই শর্তে কি তুমি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেবে?

রাকার করুণা হয়েছিল ওর অকপট স্বীকারোক্তিতে। তারপরে দুজনেই দুজনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। কুণাল, যে-কোনো কারণেই হোক, কঠোরভাবে তার প্রথম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলছিল। হয়তো আশা করেছিল, এই বন্দরে নোঙর ফেল্‌লে তাকে আর ভেসে ভেসে বেড়াতে হবে না।

অথবা কে জানে—অন্তত কুণাল নিজে আজও জানে না, ওর এ সংযম একটা নতুন 'ট্যাক্‌টিক্স' কিনা। এক এক মাছের এক এক টোপ! এ মেয়েটিকে রূপ বা রুপায় ভোলানো যাবে না! তার জন্য চাই অন্য জাতের 'টোপ'! হয়তো যে রাত্রে ঐ বাপের

আদুরে দুলালি ধরা দেবে ওর বাহুবন্ধে—সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করবে, সেদিনই মোহভঙ্গ হবে কুণালের! পরমুহূর্তেই সে ছুটবে নতুন বন্দরের দিকে!

একদিন দুজনেই জানাল দয়ানন্দকে। দয়ানন্দ জানালেন প্রমথেশকে। একটা শুভদিনের প্রত্যাশায় বাড়িটা যেন উন্মনা হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়েই নেমে এল বজ্র!

মিনিবাসের জানলায় মাথা রেখে আজ ওর মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক—অনেক দিনের পুরানো কথা—

বাবাকে ওর মনে পড়ে না, আবছা মনে পড়ে মাকে। মামার সংসারে মানুষ। দুর্গাপুরে, মামার বৃহৎ সংসার। নানান কারবার। ধানি জমি ভাগে চাষ করান। রাইস-মিল আছে একটা! তা ছাড়া ট্রান্সপোর্ট-এর বিজনেস। প্রকাণ্ড বড় বাড়ি। আর্যভট্ট রোডে। চার ছেলে, মেয়ে নেই। মা-হারা বোনঝি শৈশব থেকে ওঁর কাছে মানুষ হচ্ছে। মামাই তার বাবা, মামিই তার মা। ভাল ছাত্রী ছিল সে। আর ছিল মিষ্টি গানের গলা। দারুণ সুমিষ্ট। শৈশব থেকেই। রেকর্ড শুনে শুনে গান তুলে ফেলত গলায়। মেয়ে নেই নিজের, মামা-মামি ওকে যত্ন করে গান শিখিয়েছিলেন। গানের মাস্টার রেখে। তবলচির ব্যবস্থা অবশ্য করতে হয়নি। সে আয়োজন বাড়িতেই ছিল। মামাতো ভাইদের চোখের মণি। শৈশবে কৈশোরে সে বুঝতেই পারেনি যে, সে পিতৃমাতৃহীনা এক অনাথা।

শ্যামল মাইতি ওর 'ন'দা। সম্পর্কে শ্যামল 'দাদা' হয় না নিশ্চয়ই; কিন্তু সম্পর্ক কি শুধু রক্তের? সম্পর্ক যে অনুরক্তেরও। 'মামার শালা'র সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্কটাও তেমনি গড়ে উঠেছিল অনুর। শ্যামল থাকত দিদির সংসারে। ছেলেবেলা থেকেই। দীনবন্ধু জানা হচ্ছেন শ্যামলের ভগ্নিপতি। শ্বশুর-শাশুড়ি স্বর্গে গেলে নাবালক অবস্থা থেকেই শ্যামলকে ছেলের মতো মানুষ করেছেন। শ্যামলের দুর্দান্ত সাহস, প্রখর সাংসারিক বুদ্ধি, বিচক্ষণ, ভাল ড্রাইভিং জানে, পারে তবলা বাজাতেও। কিন্তু হলে কী হবে—পড়াশুনায় অষ্টরম্ভা। এমনিতে বইটই পড়ে, বাংলা, ইংরেজি দু-জাতেরই; কিন্তু স্কুলের বই সে ছোঁবে না। বকে, মেরে কিছুতেই ওকে শায়েস্তা করা যায়নি। ক্রমে দীনবন্ধু হতাশ হয়ে স্কুল থেকে ওর নাম কাটিয়ে আনতে বাধ্য হলেন। স্কুলের চৌহদ্দি থেকে মুক্তি পেয়েই শ্যামল অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। দীনবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘোরে। এতদিনে দীনবন্ধু রাজনীতিতে নেমেছেন। ইলেকশনে নমিনেশন পেয়েছেন। তখনই দেখা গেল শ্যামলের কৃতিত্ব। অচিরেই সে হয়ে উঠল দীনবন্ধুর দক্ষিণ-হস্ত। ক্যাডারদলের দলপতি। দীনবন্ধুর ড্রাইভার-কাম-বডিগার্ড! আজ না হয় তার মাজায় বাঁধা থাকে সার্ভিস রিভলভার, কিন্তু পুলিশে চাকরি নেবার অনেক আগে থেকেই ওর পকেটে ঐ যন্তরটা থাকত। মামার নিরাপত্তা বিধানে। নির্জনে প্র্যাকটিস করে করে তার টিপ্‌ও হয়েছিল নির্ভুল। সেটা জানতে পেরে দীনবন্ধু তাঁর রিভলভারের কেরিয়ার-

লাইসেন্সও বার করে এনেছিলেন শ্যামলের নামে। সে আমলে দীনবন্ধু পার্টি-ইন-পাওয়ারের দলে। অসুবিধা হয়নি কিছু।

দীনবন্ধুর সুপারিশে পুলিশ বিভাগে সামান্য কনস্টেব্‌ল হিসাবে ঢুকেছিল। উপায় কি? নন-ম্যাট্রিক শ্যালকটির জন্য আর কী করতে পারতেন তিনি? শ্যামলের প্রথমটা আপত্তি ছিল, কিন্তু জামাইবাবুর যুক্তিটাকে সে ফেলে দিতে পারেনি। দীনবন্ধু বলেছিলেন, দ্যাখ শ্যামল, রাজনৈতিক নেতাদের রবরবা পদ্মপত্রে জল। আজ আছে কাল নেই! তুই আমার চেয়ে বিশ বছরের ছোট। এখন ক্ষমতায় আছি, তোর একটা হিল্লে করে দিয়ে যাই। 'পুলিশ কনস্টেব্‌ল্' কথাটা শুনতে খারাপ—কিন্তু বিদেশে তা নয়, জানলি? ওদেশে কামার-ছুতোর-প্লাম্বার সবারই সামাজিক মর্যাদা আছে। এদেশেও ক্রমে তাই হবে। তা ছাড়া তোর হিম্মৎ থাকলে একদিন সাব-ইনসপেক্টর হবি। ক্রমে, থানার বড়বাবু...ভাগ্যে থাকলে গেজেটেড অফিসারও!

শ্যামল ম্লান হেসে বলেছিল, তুমি ভুলে যাচ্ছ দীনুদা, আমি নন্-ম্যাট্রিক।

—সো হোয়াট? রবীন্দ্রনাথও তো নন্-ম্যাট্রিক। নিজের হিম্মৎ থাকা চাই!

শ্যামল শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল। 'হিম্মৎ' একটা পাগলা ঘোড়া! তার পিঠে সওয়ার হয়ে সাহাবাদ জেলার সামান্য সুবেদার ফরিদ খাঁ একদিন হয়ে পড়েছিলেন তামাম হিন্দুস্থানের শাহ-য়েন-শাহ; শের খাঁ! মুঘল বাদশাহদের মাঝখানে পাঠান সুলতান!

শ্যামল জানত তার জামাইবাবুর ঐ ভাগনিটি অনেক-অনেক উঁচুমহলের বাসিন্দা। ওর নিজের লেখাপড়া হল না, আর অরু টপাটপ ডিঙিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার হার্ডল। তাতে গর্বে বুক ফুলে ওঠে শ্যামলের। অরু দুর্গাপুরের কোনো জলসায় গান গাইতে গেলে ডেকে নেয় তার ন'দাকে। ডুগি-তবলা নিয়ে শ্যামল ড্রাইভ করে নিয়ে যায়, নিরাপদে ফিরিয়ে আনে বাড়িতে। সামনে পরীক্ষা-টরিক্ষা না থাকলে অরু রেওয়াজ করতে বসে। শ্যামলকে তখন বসতে হয় ওর সামনে ডুগি-তবলা নিয়ে। এজন্য আর চার ভাইয়ের চেয়ে ন'দার সঙ্গেই ওর ঘনিষ্ঠতা বেশি। তা ছাড়া এটা-ওটা দরকার হলে সে অনায়াসে তার ন'দার কাছেই আবদারটা জানায়।

শ্যামল মাইতি যে ওকে একটু অন্যদৃষ্টিতে দেখে এটা কোনোদিনই টের পায়নি বোকা মেয়েটা। বড়দা, মেজদা, সেজদা আর ছোড়দার সঙ্গে ওর ন'দাকে সে আলাদা করে দেখত না—তবে ঐ, যেহেতু ন'দা ওর সঙ্গে সংগত করে, জলসায় নিয়ে যায়, তার নিরাপত্তা-বিধানে সর্বদাই সে প্রস্তুত—তাই তাকে একটু নেক-নজরে দেখে। তার সাথেই ঘনিষ্ঠতা বেশি। অন্তরের কথা যেন শুধু তাকেই বলা যেত।

আর শুধু সেজন্যই চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে ন'দাকেই লিখেছিল চিঠিটা।

স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে ও তখন কলকাতায় চলে এসেছে। থাকে কলকাতায় একটা হস্টেলে। সেখান থেকেই ন'দাকে লিখেছিল গোপন চিঠিটা। তার পুলিশ-স্টেশনের ঠিকানায়। মামা, মামি, বড়বৌদি বা মামাতো ভাইদের কারও কথা ওর মনে পড়েনি।

শ্যামল ততদিনে ইনসপেক্টর। হিম্মতের পিঠে সওয়ার হয়ে ঐ নন্-ম্যাট্রিক কনস্টেবল্ পরপর হার্ডলগুলি পার হয়েছে। কনস্টেবল্ থেকে অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইন্‌সপেক্টর, সাব-ইন্‌সপেক্টর, ক্রমে ইন্‌সপেক্টর! তখন সে দুর্গাপুরে পোস্টেড। চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ছুটে এসেছিল শ্যামল। দেখা করেছিল অরুন্ধতীর সঙ্গে। হস্টেলে।

—কী হয়েছে রে অরু? কী বিপদ বাধিয়ে বসেছিস তুই?

—বলব অখন। আগে একটু চা-টা খা।...হ্যাঁরে ন'দা, মামাকে বলিস্‌নি তো কিছু?

—পাগল! তুই তো বারণ করেছিলি চিঠিতে। কিন্তু বিপদটা কী জাতের?

অরুন্ধতী এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললে, এখানে নয়। তুই একটু ব'স। আমি বড়দিকে বলে আসি, তোর সঙ্গে একটু বাইরে যাচ্ছি।

শ্যামল মাইতি হস্টেলের লেডি-সুপারের পরিচিত। শুধু নামে নয়, ক্ষমতাশালী এম. এল. এ. দীনবন্ধু জানার দক্ষিণহস্ত-পরিচয়ে। অনেকবারই সে অরুকে পৌঁছে দিয়ে গেছে, বা ছুটিতে দুর্গাপুরে নিয়ে গেছে। তা ছাড়া আজ সে পুলিশি-পোশাকে এসেছে।

হস্টেল ছেড়ে বাইরে রাস্তায় নেমে বললে, খাবি কিছু? কোনো রেস্তোরাঁয় যাবি?

—ন্‌না!

—কেন রে! ভূতের মুখে রাম নাম! মোগলাই পরোটা নয়, ফিশ-কাটলেট নয়, এক কাপ চা, নিদেন গোপাল-জর্দা দেওয়া পানও খাবি না?

—তোর সব সময় এত খাই-খাই কেন রে ন'দা! লেকের ধারে চল বরং! বেশ একটা নির্জন মতো জায়গা দেখে বসব!

শ্যামল একটা ট্যাক্সি ডাকল।

লেকের ধারে নির্জন জায়গা খুঁজে নিতে ওদের বেগ পেতে হয়নি। পুলিশের চাকরিতে এটুকুই তো বাড়তি পাওনা। ট্যাক্সিওয়ালা বলে না, গাড়ি গ্যারেজে যাচ্ছে। আগে-থেকেই নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে যেসব কপোতকপোতী লেকের ধারে জোড়ায়-জোড়ায় বসে ছিল তারা শতহস্ত দূরে সরে বসল—চাণক্যপণ্ডিত বলুন-না-বলুন।

অরুন্ধতী সেই অস্তসূর্যউদ্ভাসিত লেকের জলের দিকে তাকিয়ে মন খুলে সব কথা বলে ফেলেছিল তার ন'দাকে। ওর সেই কল্পলোকের রাজপুত্রের কথা! পক্ষিরাজের পিঠে চেপে যে আগুনবরণ রাজপুত্র এসেছে ওর কুমারীমনে সোনারকাঠি ছোঁওয়াতে। কুণালের কথা। মানে, বড়ভাইকে যতখানি বলা সম্ভবপর।

শ্যামল এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিল—একটি ছেলে আর একটি মেয়ের প্রেমের গল্প। ঠিক নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় শুনেছিল কি না তা অরু সেদিন বুঝতে পারেনি। তার দীর্ঘ কাহিনী শেষ হলে সে শুধু জানতে চাইল, তোর সঙ্গে ওর প্রথম কোথায় আলাপ হল?

—কী বললাম তাহলে এতক্ষণ? ইন্টার-কলেজ মিউজিক-কনফারেন্সে!

শ্যামল এতক্ষণে টের পায়, প্রেমের গল্পটা সে মন দিয়ে শোনেনি। এ তো 'বয় মিটস্ গার্ল'-এর মনগড়া গল্প নয়, এ তার অতি পরিচিত, অতি স্নেহের পাত্রীর প্রেমকথা। অরু যে একদিন পরের ঘর করতে যাবে, আর সেদিন যে ওকে মাজায় গামছা জড়িয়ে ফ্রায়েড-রাইস পরিবেশন করতে হবে, এটা জানা ছিল। কিন্তু আজ তার মনটা এমন করছে কেন? সে মন দিয়ে সব কিছু শুনতে পারেনি কেন? মনঃসংযোগ হারিয়ে যাচ্ছে কেন বারে বারে? সামলে নিয়ে বললে, সব কথা খুলে বল দিকিন আমাকে। কিছু রেখে-ঢেকে বলিস না—

—বললাম তো এতক্ষণ।

—না! তুই অনেক কথা চেপে গেছিস। সব, স—ব কথা খুলে বল। তুই যা বললি, তাতে তো মনে হচ্ছে খুবই সুপাত্র! বলছিস দারুণ হ্যান্ডসম দেখতে, আর্কিটেক্ট ভাল চাকরি করছে, বাপের একমাত্র সন্তান—তাহলে তোর বিপদ্‌টা কোথায়? সমস্যাটা কী?

অরু একটা চোরকাঁটা চিবাল অনেকক্ষণ। সত্যি কথাটা বলতে পারল না। তা কি বলা যায়? নিজের বড় ভাইকেও? তাই বললে, ওরা যে ব্রাহ্মণ! অসবর্ণ হয়ে যাচ্ছে না?

—দূর পাগলি! দীনুদা তো এ. জি. ডাব্‌লু. বি.-র সেই লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক নীহার বাঁড়ুজ্জে নয়! অসবর্ণ বিয়েতে আটকাবে না!

—এ. জি. ডাব্‌লু. বি.-র কোন ক্লার্কের কথা বল্‌ছিলি?

—বাদ দে ফালতু কথা। দীনুদাকে আমি রাজি করাব। তা ছাড়া মিঞাবিবি রাজি তো ক্যা করেগা কাজি? পাজিটা কী বলছে?

—পাজিটা?

—আরে আমার হবু বোনাইটা! তাকে বল না দীনুদার কাছে প্রস্তাবটা পাড়তে—

—বলব কাকে? আজ মাস-তিনেক সে না-পাত্তা!

—না-পাত্তা! তার মানে?

অরুন্ধতী অসংকোচে জানিয়ে দিল—যে-কোনো কারণেই হোক—কৃণাল আজ মাস-তিনেক ওকে এড়িয়ে চলছে। চিঠি দিলে জবাব দেয় না, ফোন করলে ধরে না—

শ্যামলের ভ্রূকুঞ্চন হল। বয়সে অরুর চেয়ে মাত্র দুবছরের বড়, কিন্তু দুনিয়াদারির অনেক ঘাটেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে যথেষ্ট। এ জাতের ছেলের কীর্তিকাহিনীর কথা তার ভালরকম জানা আছে। তবে এখনই সেই রূঢ় কথাটা অরুকে জানানোর প্রয়োজন নেই। ও বুঝবে না। ও একটা 'অব্‌সেশনে' ভুগছে। ঠিক সেই সুতপার মতো! ওদের মোহভঙ্গ হতে সময় লাগে। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে সবকিছু করতে হবে। তা ছাড়া হয়তো তার আশঙ্কা অমূলক। ছেলেটার অসুখ করেছে, বা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে...নাম, ধাম, গাড়ির আর টেলিফোনের নম্বরগুলো লিখে নিল নোট বইতে। বললে, বে-ফিকির থাক। মন খারাপ করিস না। সাতদিনের মধ্যে খবর পাবি।

তাই পেয়েছিল সে। পরের সপ্তাহেই শ্যামল আবার এসে জানিয়ে গিয়েছিল তার তদন্তের ফলাফল। মাত্র সাতদিনের ভিতরেই শ্যামল বুঝে নিয়েছে অরু যে ছেলেটির প্রেমে পড়েছে সে শিশুপালের উপর দিয়ে যায়—একেবারে জরাসন্ধ! শিশুপালের কল্যাণেই অবশ্য শ্যামল—নন্-ম্যাট্রিক হওয়া সত্ত্বেও—পুলিশ ইন্‌সপেক্টর হতে পেরেছে—যা সচরাচর হয় না, হবার কথাও নয়।

তাহলে শিশুপালের বৃত্তান্তটা এখন বলতে হয়; কিন্তু শিশুপালের কাহিনীটা বিবৃত করতে হলে তার আগে অজিতেশ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ শিশুপালের স্বরূপ শ্যামল জানতে পেরেছিল ঐ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের মারফতেই।

অজিতেশবাবু সত্তর ছুঁই-ছুঁই। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বিপরীতে প্রায় কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিটের ওপরে একটি দ্বিতল বাড়িতে একা থাকতেন, চাকর, কুকুর আর পাখিদের নিয়ে। এক তলায় একটি প্রেস। দু-পুরুষে সেই প্রেসটির সুখ্যাতি। বিশেষ করে ব্লক-মেকিং-এ। এককালে বহু কর্মীর অন্নসংস্থান হত ঐ প্রেস ও ব্লক-মেকিং থেকে। ইদানীং বৃদ্ধ বয়সে অজিতেশবাবু সব কিছুই গুটিয়ে নিয়েছেন। দেখা-শোনা করার লোক নেই, একা মানুষের প্রয়োজন অল্প। টুক-টাক কিছু অর্ডার আসে। তাতেই চলে যায়। ভৃত্য-কাম-পাচক শ্রীধর সংসারের দেখ-ভাল করে—শুধু কর্তাকেই নয়, তার পোষা কুকুর ও পাখিদের দু বেলা খেতে দেয়। ব্যবসায়ের দিকটা দেখেন পুরানো আমলের খগেনবাবু।

একদিন দুপুরবেলা অজিতেশবাবু একটা ফাইনাল-প্রুফ দেখছেন, হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে শ্রুত হল, ভিতরে আসব দাদু?

দাদু অনেকেই বলে তাঁকে। চশমা-জোড়া কপালে তুলে আগন্তুকদের দেখেন। মনে হল ওরা দুজনেই ওঁর নাতি-নাতনি হতে পারত—বয়সের দিক থেকে। ছেলেটি ত্রিশের অনেক কম, মেয়েটি বিশের সামান্য বেশি। দুজনেই ধোপদুরস্ত। পোশাক পরিচ্ছদে উচ্চবিত্তের বলে মনে হয়। বললেন, এসো। কী চাই?

কোথাও কিছু নেই মেয়েটি একেবারে ঝুঁকে পড়ে টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে দিল—পদধূলি নেবার সদিচ্ছা নিয়ে।

—থাক থাক হয়েছে। প্রণাম কিসের? বসো—

—বাঃ আপনি গুরুজন। বয়সেও কত বড়। প্রণাম না করলে চলে?

ওরা দুজনে বসল পাশাপাশি। বেশ মানিয়েছে কিন্তু দুটিতে। মেয়েটি পরনে ম্যাজেন্টা-রঙের একটা মুর্শিদাবাদি, তারই কাট-পিসের ব্লাউস। বাঁ হাতে লেডিজ ঘড়ি, ডান হাতে একটি মকরমুখী বালা—সোনার বলেই মনে হচ্ছে। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। ছেলেটি পাজামা-পাঞ্জাবি-চপ্পলে ভূষিত। তারও কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ।

—বলো এবার কী চাই?

—আমার নাম সুতপা, আর এ হচ্ছে বিশ্বনাথ পাল। আমরা দুজনেই প্রেসিডেন্সিতে পড়ি। ও অবশ্য আমার চেয়ে তিন বছর উঁচু ক্লাসে পড়ে। এবার হিস্ট্রিতে এম. এ.

দেবে। তা সে যা হোক, যে জন্য এসেছি তা বলি। আমরা একটা লিটল্ ম্যাগাজিন বার করেছি। আপনি যদি কাইন্ডলি ছাপার দায়িত্বটা—

—কত নম্বর সংখ্যা এটা? আগের সংখ্যাটা কোথায় ছেপেছিল?

এবার ছেলেটি জবাব দিল, না, মানে এটাই প্রথম সংখ্যা।

—অ! প্রেসিডেন্সিতে পড়ো বললে কিন্তু টেন্সে তোমাদের তাহলে ভুল হয়েছে। ম্যাগাজিন বার করেছি নয়, বার করতে চাইছি। তা কত ফর্মার বই হবে? কত কপি ছাপবে?

—প্রথম সংখ্যা ষোলোপেজি চার ফর্মা। আর ছাপব পাঁচশো কপি।

—টাকা-কড়ির জোগাড় আছে? আমি বাপু অ্যাডভান্স নেব—

—তা তো নেবেনই। টাকা-পয়সায় আটকাবে না। অ্যাডভান্স নিশ্চয় দেব। কাগজ ডেলিভারি নেবার আগে ফুল পেমেন্ট করে দেব।

অজিতেশবাবু রাজি হলেন। দরদাম স্থির হল। ওরা নগদে বেশ মোটা রকম অগ্রিম দিয়ে রসিদ নিয়ে গেল। বললে সোমবার পুরো ম্যানাসক্রিপ্ট জমা দেব। গ্যালি প্রুফ আমরা দেখব না। মেক-আপ প্রুফ থেকে শুরু করে প্রিন্টঅর্ডার আমরাই দেব।

অজিতেশবাবু ওদের ঠিকানা জানতে চাইলেন। দুজনে একটু ইতস্তত করল। তারপর ছেলেটি বললে, আমাদের ঠিকানা নিয়ে কী করবেন? কলেজফেরতা আমরা তো এখানে এসেই প্রুফ দেখে যাব।

বৃদ্ধের মনে হল, ওরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। কেন? প্রথম যে প্রশ্নটা মনে উদয় হল, সেটাই অকপটে পেশ করলেন, দেখো বাপু, আমি তোমাদের চিনি না, ঠিকানাও তোমরা জানাতে চাও না। খোলাখুলি বলো তো দাদুভাই-দিদিভাই, তোমরা কোন পলিটিকাল পার্টির?

দুজনেই শিউরে ওঠে, এ কী বলছেন দাদু! আমাদের পত্রিকা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক। আপত্তিকর কিছু দেখলে আপনি ছাপবেন না!

এরপর আর কথা চলে না।

পত্রিকা ছাপা হতে থাকে। না, রাজনৈতিক কোনো দলের নয়। যদিও প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার দু-তরফের বিরুদ্ধেই প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে পার্টির গন্ধ নেই। কিছু গল্প-কবিতা, বিজ্ঞাপনও আছে।

বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরে আবার দুজন এসে হাজির।

অজিতেশ বলেন, কালই তো বললাম দুদিন দেরি হবে; আমার কম্পোজিটারটার জ্বর হয়েছে। আসছে না।

—না দাদু, সে জন্য নয়: অন্য একটা বিশেষ কারণে...

—অ! তা বলো। কী বিশেষ কারণে এসেছ?

মেয়েটি বিশুদ্ধ ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের উচ্চারণে ইংরেজিতে বললে, আপনার ভৃত্যটিকে দয়া করে তিন কাপ চা আনতে পাঠান। কথাটা গোপন!

অজিতেশ শ্রীধরকে স্থানান্তরিত করে বললেন, এবার বলো।

মেয়েটি এক নিঃশ্বাসে বলে গেল ওদের যৌথ সমস্যার কথা।

সুতপার বাবা নীহারবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ. জি. ওয়েস্ট-বেঙ্গলের একজন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। সুতপারা তিন বোন, ও সবচেয়ে ছোট। আর বিশ্বনাথের তিন কুলে কেউ নেই। স্কলারশিপ নিয়ে পড়ছে। এম. এ. পাস করে আই.এ.এস. দেবার ইচ্ছে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু নীহারবিন্দু অত্যন্ত গোঁড়া—অব্রাহ্মণের সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিবাহ দেবেন না। তাই ওরা দুজন স্থির করেছে লুকিয়ে রেজিস্ট্রিমতে বিবাহ করবে। সুতপা প্রাপ্তবয়স্কা। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দেওয়াই আছে। এখন অজিতেশবাবু যদি ওদের একটু সাহায্য করেন তাহলে এই দুটি মিলনকামী প্রেমিক-প্রেমিকার একটা হিল্লে হয়।

অজিতেশবাবু অবাক হয়ে বলেন, তা আমি তোমাদের এ বিষয়ে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

—ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থেকে। খাতায় সই দিয়ে—

—বাঃ! সে তো তোমাদের ক্লাসের যে-কোনো ছেলে মেয়ে দিতে পারে। তোমার অথবা বিশ্বনাথের।

—তাহলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু তা হবার নয়, দাদু। আমরা ব্যাপারটা জানাজানি করতে চাই না।

—কিন্তু কেন বলো তো? এত লুকোছাপা কিসের? তোমাদের কি তেমন নিকট বন্ধু একজনও নেই?

এইবার বিশ্বনাথ আগ্ বাড়িয়ে বলে, আমার এক ক্লাস-ফ্রেন্ডকে বলেছি। সে রাজি আছে। আপনি দ্বিতীয় সাক্ষী। আপনার আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? আমরা সই করব, আপনি অ্যাটেস্ট করবেন। ব্যস! আর তো কিছু নয়?

অজিতেশ বললেন, কিছু মনে কোরো না বিশ্বনাথ। তুমি তো এখনো ছাত্র। বলছ যে, স্কলারশিপের টাকায় পড়ছ। সংসার চালাতে পারবে? আমি খোলা কথার মানুষ। খোলাখুলিই বলছি—সুতপা বলছে, ওর বাবা সরকারি অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। দুটি মেয়েকে তিনি পার করেছেন। সুতপাই কনিষ্ঠা কন্যা। অথচ ওকে যখনই দেখেছি তখনই দামি শাড়ি-পরা! হাতে সোনার বালা, ডিজিটাল বিদেশি ঘড়ি!

সুতপা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, থাক দাদু! এত জেরার মধ্যে পড়তে হবে জানলে আমরা এ প্রস্তাব আদৌ তুলতাম না।

অজিতেশ কৌতুক বোধ করেন। হেসে বলেন, মাথা গরম কোরো না। বসো! আমি বলছিলুম কী, এত তাড়াহুড়ার কী আছে?

বিশ্বনাথ জবাব দেয়, আছে বলেই তাড়াহুড়া করছি। নীহারবাবু একটি দোজবরের সঙ্গে সুতপার সম্বন্ধ করেছেন। পাত্রটি ওর চেয়ে বিশ বছরের বড়। তবে কুলীন ব্রাহ্মণ

বটে! বিনা পণে ওকে গ্রহণ করছেন যেহেতু তিনি বিপত্নীক, তাঁর তিন-তিনটি নাবালকের দায়িত্ব কোনো একটি গভর্নেস-কাম-মেড-সার্ভেন্টের জিম্মায় দিতে পারেন, শুধু পেট-ভাতারি চুক্তিতে!

বিশ্বনাথের চোখে আগুন! সুতপার চোখে জল।

অজিতেশ রাজি না হয়ে পারলেন না। হতে পারে পাল-বংশের ছেলে, কিন্তু বিশ্বনাথ সুদর্শন। দীর্ঘকান্তি বলিষ্ঠ গঠন, চৌখস ছেলে। পড়াশুনাতেও নিশ্চয় খুব ভাল—যে ছেলে স্কলারশিপে প্রেসিডেন্সিতে পড়ে তার মার্কশিট না দেখেও এ কথা বলা চলে। তিনি নিজে জাত-পাত মানেন না। এর আগেও অসবর্ণ বিবাহে মদত দিয়েছেন।

সেই সময়েই শ্রীধর ফিরে এল ট্রে-তে করে তিন কাপ চা নিয়ে। অজিতেশ বললেন, শুধু চায়ে তো এমন একটা ব্যাপারের 'সমাপয়েৎ' হতে পারে না। শ্রীধর, আবার যা। দোকান থেকে পাঁচ টাকার সন্দেশ নিয়ে আয়!

সুতপা চোখে আঁচল দিল আনন্দে!

পরের সপ্তাহে রেজিস্ট্রি মতে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। অজিতেশ অন্যতম সাক্ষী। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসেই ওরা দুজন ওঁকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিল। তার মাসখানেকের মধ্যে ওরা এসে লিট্‌ল-ম্যাগাজিনের পাঁচশো কপি ডেলিভারি নিয়ে গেল—নগদে পাই পয়সা মিটিয়ে।

ব্যস। তারপর থেকে আর তাদের পাত্তা নেই। সেটাই স্বাভাবিক। ত্রৈমাসিক পত্রিকা হবার কথা ছিল। মাস-তিনেক পরে ওরা আবার যুগলে আসবে এমন একটা আশা পোষণ করছিলেন বৃদ্ধ। ওরা এল না। অজিতেশ বুঝলেন, পত্রিকাটির শিশুমৃত্যু ঘটেছে। অধিকাংশ লিট্‌ল-ম্যাগাজিনের যে অনিবার্য অন্তিম গতি হয়ে থাকে। হয়তো নতুন-পাতা সংসারে এখন অন্য একটি শিশুর আগমনবার্তা শোনা যাচ্ছে বলেই।

কেটে গেল আরও তিন মাস।

আচ্ছা, নীহারবিন্দু কি শেষ পর্যন্ত অসবর্ণ বিবাহটাকে মেনে নিতে পেরেছিলেন! বিশ্বনাথও বিনা পণে বিবাহ করেছে। হোক না অব্রাহ্মণ; পাত্র হিসাবে সে তো হাজার গুণ বাঞ্ছনীয় সেই দোজবরের চেয়ে। কিন্তু ধর্মান্ধ মানুষের ভালমন্দ বিচারও তো অদ্ভুত। কে জানে, নীহারবিন্দু মেয়ে-জামাইকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন কি না। আর তারাও বলিহারি! একবার এসে তো বলে যেতে হয় তারা কেমন আছে, কী করছে। বিশ্বনাথের এম.এ. দেবার কথা ছিল সে সময়। এতদিনে রেজাল্ট বার হয়ে গেছে নিশ্চয়। ফার্স্টক্লাস পেয়েছে তো? একটা চাকরি জোগাড় হয়েছে তো এতদিনে? আশ্চর্য একালের ছেলে-মেয়েদের মতিগতি। কাজের বেলায় অতিভক্তি—যখন তখন পায়ের ধুলো নেওয়া। আর কাজ ফুরোলেই পাজি!

ক্রমে ভুলেই গেলেন ওদের কথা।

তারপর একদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল! একেবারে আচমকা! হিসাব মেলাতে বসে।

ফাইল দেখতে দেখতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। হাঁক পাড়েন, শ্রীধর...

—আজ্ঞে যাই!—শ্রীধর এসে দাঁড়ায় দ্বারপ্রান্তে।

—খগেনবাবুকে ডাক তো একবার।

একটু পরেই খগেনবাবু এসে দাঁড়ান, ডাকছিলেন স্যার?

খগেনবাবু পুরানো-আমলের কর্মী। অজিতেশের দক্ষিণ হস্ত! বলেন, এই বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রটা কে ছাপতে দিয়ে গিয়েছিল? কবে ডেলিভারি দিয়েছ?

—আজ্ঞে কে ছাপাতে দিয়েছিল তা তো জানি না। দিন-দশেক আগে ডেলিভারি দিয়েছি। কেন?

—কিছু না। মাস ছয়েক আগে আমরা একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছেপেছিলাম—'কলকাকলী'। মনে আছে? ফাইল কপিটা নিয়ে এসো তো?

মিলিয়ে দেখলেন! না! ভুল হয়নি। এ সেই সুতপাই! 'কলকাকলীর' যুগ্ম সম্পাদকের নাম সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশকের ঠিকানা যোধপুর পার্কের যে রাস্তার যত নম্বর বাড়ি—নিমন্ত্রণ পত্রেও তাই। একই ঠিকানার শ্রীনীহারবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সুতপার শুভবিবাহে নিমন্ত্রণ পত্র ছেপেছেন। আইভরি ফিনিশড্ দামি কাগজে—একপাশে বাংলা, একপাশে ইংরাজি বয়ান! এ. জি. ডাব্‌লু. বি-র কোন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের পক্ষে যে ধরনের নিমন্ত্রণপত্র ছাপতে দেওয়া অসম্ভব।

খগেনবাবুর চোখের সামনে প্রমাণটা মেলে ধরে বলেন, কী মনে হয়?

—হ্যাঁ, এই সুতপাই হবে। মেয়েটিকে দেখেছি। প্রুফ দেখতে আসত। তখন কিন্তু সে বলেনি যে, ওর বাবা অত বড় পুলিশ-অফিসার...

—অতবড় পুলিশ-অফিসার?

—হ্যাঁ। তাই তো! নীহারবিন্দু বাঁড়ুজ্জে হচ্ছেন ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জ!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অজিতেশ! সর্বনাশ! তিনি যে সুতপার রেজিস্ট্রিবিবাহে সাক্ষী ছিলেন এ-কথা ঘূণাক্ষরে কাউকে জানাননি। খগেনবাবুকেও নয়!

এ কী সর্বনাশের মধ্যে পড়লেন! এতবড় মিথ্যা কথা কেন বলেছিল সুতপা? তার চেয়েও বড় কথা এখনো সে চুপ করে আছে কেন? 'বিগামি' যে আইনত অপরাধ সেটা ওরা দুজনেই জানে—সুতপা আর বিশ্বনাথ! এখনো বছর ঘোরেনি। বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে না ইতিমধ্যে। তাহলে?

প্রায় আধঘণ্টা-খানেক চুপচাপ বসে রইলেন দুহাতে চুলের মুঠি ধরে। শ্রীধর যে চায়ের কাপটা রেখে গিয়েছিল তার কোনায়-কোনায় মাছির জটলা। তারপর মনস্থির করলেন। এমন একটা ব্যাপারে সব কিছু জেনেশুনে উনি নির্বাক দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। সাধারণ নাগরিক হিসাবে তাঁর একটা কর্তব্য আছে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এ নিয়ে থানা-কাছারি হবেই—অতবড় পুলিশ-অফিসারের মেয়ে! তার রেজিস্ট্রি-বিয়েতে

সাক্ষী ছিল তাদের একদিন-না-একদিন কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে হবে! কিন্তু তিনি একা, বৃদ্ধ মানুষ—নির্বিরোধী, সংসারের সাতে-পাঁচে থাকেন না! ঠিকানা জানাই আছে, নিমন্ত্রণপত্রের ফাইলকপিতে! কিন্তু কাল-বাদে পরশু বিয়ে! পুলিশ-সাহেবের বাড়ি এতক্ষণে নিশ্চয় আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবে গিজগিজ! এরকম একটা মারাত্মক দুঃসংবাদ আস্তিনের তলায় লুকিয়ে কি তাঁর একা-একা সেখানে উপস্থিত হওয়া নিরাপদ? ভগ্নদূতের মতো? কিন্তু সঙ্গেই বা নেবেন কাকে? খগেনবাবু বা শ্রীধরকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। হঠাৎ মনে পড়ল দীনবন্ধু জানার কথা। জানামশাই ওঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, 'দাদা' ডাকেন; তাঁর ইলেকশানের লিফলেট কাগজ-পত্র বহুবার ছাপিয়ে দিয়েছেন। দীনবন্ধু জানা রাজনৈতিক দলের এক মস্ত মাতব্বর, স্ট্যান্ডিং এম. এল. এ.। সবচেয়ে ভাল, সমস্যাটা নিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হওয়া। দীনবন্ধু অবশ্য সচরাচর দুর্গাপুরে থাকেন; কিন্তু কলকাতায় তাঁর একটা আস্তানা আছে। এখন অ্যাসেম্ব্লি চলছে; হয়তো ওঁকে বালিগঞ্জ প্লেসের বাসাতেই পাওয়া যাবে। বার পাঁচছয় তাঁর নাম্বারটা ডায়াল করলেন—যথারীতি ক্যাঁ-কো! ওয়ান-ডাব্‌ল্‌-নাইনের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারলেন না। অগত্যা ঐ নিমন্ত্রণ পত্রের পাণ্ডুলিপি, ছাপানো কপি, আর 'কলকাকলী'র ফাইল-কপিটা একটা অ্যাটাচি কেসে ভরে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলেন বালিগঞ্জ প্লেসের দিকে।

দুর্ভাগ্য অজিতেশের। দীনবন্ধু বাসায় নেই। দেখা পেলেন দীনবন্ধুর শ্যালকটির। অনেকবার ছেলেটি এসেছে প্রেসে—ইলেকশন-পেপার ছাপানোর প্রয়োজনে।

অজিতেশ বলেন, দীনবন্ধু তোমার ভগ্নিপতি, তাই নয়? কী নাম যেন তোমার?

—শ্যামল মাইতি। আপনি তো অজিতেশবাবু। বলুন, দাদাকে কেন খুঁজছেন।

অজিতেশ মনস্থির করেন। মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। এ ছেলেটি দীনবন্ধুর দক্ষিণহস্ত। করিতকর্মা। প্রতিটি মিনিট এখন মূল্যবান। বললেন, একটা ভীষণ বিপদে পড়ে দীনবন্ধুর কাছে ছুটে এসেছি, শ্যামল! ও কখন ফিরবে?

—আজ ফিরবেন না। বিপদটা কী জাতের?

আদ্যোপান্ত সবকিছু খুলে বললেন বৃদ্ধ। 'এভিডেন্স'গুলি মেলে ধরলেন।

শ্যামল সবকিছু শুনে বললে, ব্যাপারটা অত্যন্ত সিরিয়াস দাদু! নীহার বাঁড়ুজ্জেকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। আমাদেরই এলাকার ডি. আই. জি.! তাঁর মেয়ে সুতপাকেও দেখেছি, যদিও সে আমাকে চেনে না! দাদার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নেই। আপনাকে এখনি গিয়ে সবকিছু খুলে বলতে হবে। এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে! যেহেতু সুতপা বিবাহিতা! আশ্চর্য। মেয়েটা সবকিছু পরিণাম জেনে বুঝে এভাবে চুপ করে আছে কেন? আর সেই বিশু পালই বা কোথায়?

—আমি বিশ্বনাথের ঠিকানা জানি না। কিন্তু নীহারবিন্দুবাবুর বাড়িতে আমার একা-একা যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—না, না, একা কেন যাবেন? চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি!

টেবিলের টানা ড্রয়ার খুলে একগোছা নোট আর কালের রঙের কী একটা জিনিস নিয়ে সে হিপ-পকেটে ভরে নিল।

—ওটা কী নিলে সঙ্গে?

—ও কিছু নয়। দাঁড়ান, একটা ট্যাক্সি ধরি সবার আগে।

দুজনে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দুজনে উঠে বসবার পর শ্যামল ট্যাক্সি চালককে বললে, ধর্মতলা চলো...

অজিতেশ প্রতিবাদ করেন, না, না, ধর্মতলা নয়, নীহারবিন্দুর বাড়ি যোধপুর পার্কে—

সর্দারজি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে। বলে, সোচ্ লিজিয়ে পহিলে, কাঁহা যানা হ্যায়!

—বললাম তো, ধর্মতলা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি। বিধান রায়ের বাড়ির কাছে।

শ্যামল অজিতেশকে নিম্নস্বরে অন্বয় ব্যাখ্যা দাখিল করে, বুঝলেন না দাদু? সবার আগে আমাদের যেতে হবে সেই ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে। দরকার হলে বিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচও করতে হবে। তারিখটা মনে নেই আপনার? একখানা 'ফটোস্ট্যাট কপি' সঙ্গে না নিয়ে পুলিশ-সাহেবের ডেরায় যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না! আমরা যা বলছি, তার অকাট্য প্রমাণ নিয়ে যাওয়াটা দরকার।

অজিতেশ বুঝতে পারেন ছেলেটির ওপর নির্ভর করা যায়। আট-ঘাট বেঁধেও কাজ করতে জানে। না হলে দীনবন্ধু জানার দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠল কেমন করে?

যোধপুর পার্কের বাড়িটার সামনে পৌঁছে অজিতেশবাবুর মনে হল তাঁর পা দুটো পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। বাড়ির সামনে ফুটপাথ ঘিরে ফেলা হয়েছে, উপরে ম্যারাপ-বাঁধার কাজ চলছে। তিন তলা থেকে এক তলা পর্যন্ত লম্বা লম্বা টুনিবাল্বের তার ঝোলানো হচ্ছে। দু'-তিনটে গাড়ি বাড়ির সামনে পার্ক করা। একটা আবার পুলিশ-ভ্যান!

অবাধ্য চরণজোড়াকে বাধ্য করলেন সচল হতে। ট্যাক্সি-ফেয়ার কিছুতেই দিতে দিল না। শ্যামলই সেটা মেটাল। দুজনে গুটিগুটি এগিয়ে গেলেন গেট খুলে।

একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, কাকে চাই?

অজিতেশকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে শ্যামল বললে, স্যারকে। আই মিন, মিস্টার নীহারবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

—ও! কিন্তু কী দরকার? কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

সপ্রতিভাবে শ্যামলই জবাব দিল, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। অত্যন্ত জরুরি। এবং গোপন!

ভদ্রলোক বললেন, সাহেব এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। তাঁর সময় হবে না। বুঝতেই পারছেন—বিয়েবাড়ি এটা—তাঁর অফিস নয়। আপনাদের যা কিছু অভিযোগ...

বাধা দিয়ে শ্যামল বললে, আপনি ভুল করছেন। আমরা কোনো অভিযোগ বা আবেদন নিয়ে আসিনি। একটা অত্যন্ত গোপন ও জরুরি খবর দিতে এসেছি—যাতে স্যারের ইন্টারেস্ট ইনভল্‌ভ। নিজেদের কোনো স্বার্থ নেই!

ভদ্রলোক আধ-মিনিটটাক নীরবে অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, আসুন তাহলে...

ওদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে বসালেন ড্রয়িং রুমের একান্তে। ঘরে আরও দু-চারজন রয়েছেন। নিম্নস্বরে এবার বললেন, আমার নাম সতীশ চাটুজ্জে। নীহারবিন্দু হচ্ছেন আমার মেসোমশাই। ওঁর পক্ষে এখন নীচে নেমে আসা সম্ভবপর নয়। আপনাদের যা বক্তব্য—যত জরুরি এবং যত গোপন কথাই হোক—আমাকেই বলতে হবে। আমি উপরে গিয়ে ওঁকে জানাব। ওঁর হাই প্রেশার, বারে বারে সিঁড়ি ভাঙা বারণ।

অজিতেশ কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে শ্যামল বললে, মাপ করবেন সতীশবাবু! কথাটা এমন গোপনীয় যে, স্বয়ং নীহারবাবু ছাড়া আমরা আর কাউকে তা জানাতে পারছি না। উনি যদি একতলায় না নামতে পারেন তাহলে ব্যবস্থা করুন—যাতে আমরাই উপরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

কথা সামান্যই কিন্তু কী জানি কেন সতীশবাবু নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। বললেন, আয়াম সরি! মেসোমশাইকে এখন বিরক্ত করা চলবে না। আমাকে যদি বিশ্বাস করে কিছু না বলতে পারেন তবে আপনারা আসুন।

অজিতেশবাবুর মাথার রক্ত চড়ে গেল। বললেন, বেশ! তবে তাই হোক!

শ্যামল তাঁকে ধরে বসিয়ে দিল। সতীশবাবুকে বললে, এই যদি আপনার সিদ্ধান্ত—দায়িত্বটা যদি আপনিই নিতে চান তাহলে আপনাকে দয়া করে একটি উপকার করতে হবে। স্যারের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তারা শুনেছি একটা ভিজিটার্স স্লিপে নামধাম তারিখ লিখে দেয়—তেমন একটা কাগজ দিন, আমি তাতে আমার নামধাম আর তারিখ লিখে দিই—আপনি তার পিছনে 'দেখা হবে না' লিখে স্বাক্ষর করে দিন! ব্যস।

সতীশবাবুর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। বলেন, এ-কথার মানে?

—অত্যন্ত সহজ! ব্যাপারটা নিয়ে থানা-পুলিশ-কাছারি হবে। আমরা তখন ঐ কাগজখানা এভিডেন্স হিসাবে দাখিল করতে পারব—দায়িত্বটা আপনার উপর বর্তাবে!

এবার পুরো এক মিনিট উনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শ্যামলের দিকে।

তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না দেখে শ্যামল তার নিজের হিপ্‌-পকেট থেকে একটা নোট বই বার করে। একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে খসখস করে দুছত্র লিখে ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে। বলে, এটা স্যারকে দেখান!

সতীশবাবু কাগজখানা নিয়ে দেখলেন তাতে লেখা আছে—"আমরা দীনবন্ধু জানা এম. এল. এ-র কাছ থেকে একটা অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গোপন সংবাদ নিয়ে

এসেছি। সংবাদটা আপনার পক্ষে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার বিপদ সংক্রান্ত। আমরা নীচে অপেক্ষা করছি। দয়া করে মিনিট পাঁচেকের জন্য একান্ত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। শ্যামল মাইতি।"

একটু পরে দ্বিতলের ঘরে ওদের ডাক পড়ল। সতীশবাবু ফিরে এলেন না। বোধকরি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করায় তিনি অন্তরালে রইলেন। গৃহভৃত্য এসে ডেকে নিয়ে গেল ওঁদের।

চওড়া সিঁড়ি। ল্যান্ডিং-এর কুলুঙ্গিতে নানান কিউরিও। রেলিং-এর উপর দিয়ে একটা মানি-প্লান্ট একতলা থেকে দোতলায় উঠবার চেষ্টা করেছে। সিড়ি দিয়ে উঠেই একটা চওড়া বারান্দা। পাশাপাশি কয়েকটি দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে। একটির বাইরে ওদের দাঁড় করিয়ে গৃহভৃত্য ভিতরে ঢুকল। তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাবুদের নিয়ে এসেছি।

—ভিতরে আসতে বলো!

গৃহভৃত্য পর্দাটা তুলে ধরল। ওঁরা দুজনে প্রবেশ করলেন ঘরটায়।

ইটালিয়ান মার্বেলের মসৃণ মেজে। সোফা-সেটি দিয়ে সাজানো। পিছনের দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড পিতলের বুদ্ধমূর্তি, তার পাদদেশে কন্‌সিল্‌ড আলোর উৎস। তাতেই কামরাটায় স্তিমিত আলোক। গৃহস্বামী বসেছিলেন একটা ডিভানে। পায়জামা আর গেঞ্জি পরে। একটু দূরে আর একটা সোফায় সতীশচন্দ্র। গৃহভৃত্য নিষ্ক্রান্ত হতেই শ্যামল ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল—টাওয়ার বোল্ট তুলে দিয়ে। নমস্কার করে বললে, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি স্যার! জানি, আপনি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু...

জলদগম্ভীর স্বরে গৃহস্বামী বললেন, বসুন। ভনিতা না করে যা বলার আছে চট্‌পট্‌ বলে ফেলুন।

অজিতেশবাবু অনুরুদ্ধ হয়ে বসে পড়েছিলেন। বোধকরি বৃদ্ধের চরণদ্বয় আর তাঁর দেহভার বইতে পারছিল না। শ্যামল কিন্তু বসল না। বললে, দীনবন্ধুদা কিন্তু আমাকে বলেছিলেন আপনাকে নির্জনে সংবাদটা দিতে—তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না করে—

নীহারবিন্দু ধমকে ওঠেন, তৃতীয় ব্যক্তিটিকে তো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ দেখছি।

—উনিই খবরটা এনেছেন। উনি সবই জানেন। ওঁর কাছ থেকে গোপন করা যাবে না বলেই...আর তা ছাড়া আমি যা বলব তা 'হেয়ার-সে'। উনিই ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে সে তথ্যগুলো করোবোরেট করবেন।

—বিষয়টি কী নিয়ে? তোমার নাম তো শ্যামল মাইতি, ওঁর নাম কী?

অজিতেশ পুনরায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, শ্যামল তাঁর বাহুমূল চেপে ধরে থামিয়ে দেয়। বলে, বিষয়টা আপনার কন্যার বিবাহ-সংক্রান্ত। যে পাত্রটির সঙ্গে আপনি তার বিবাহ স্থির করেছেন...

মাঝপথেই থেমে পড়ে।

নীহারবিন্দু সোজা হয়ে উঠে বসলেন। ভ্রূ-যুগলে জাগল কুঞ্চন। বললেন, মিস্টার জানা কোনো চিঠি দিয়েছেন?

—না স্যার! মৌখিক জানাতে বলেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব আর 'ফর য়োর ইয়ার্স ওনলি।'

একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন নীহারবিন্দু। পাশের দিকে ফিরে বললেন, সতীশ, তুমি একটু পাশের ঘরে যাও তো—

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল সতীশবাবুর। এক লাফে উঠে দাঁড়ান তিনি। দুম্ দুম্ করে দ্বার খুলে চলে যান পাশের ঘরে। শ্যামল উঠে গিয়ে দরজাটায় পুনরায় ছিটকানি দিয়ে দিল। বসল না কিন্তু। গটগট করে এগিয়ে গেল নীহারবিন্দুর সামনে। পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে নামিয়ে রাখাল নীহারবিন্দুর সামনের টিপয়ে। এবার সে ধীরপদে ফিরে গিয়ে বসল তার সোফায়।

নীহারবিন্দু বলেন, এটা কী হল?

—নির্জন সাক্ষাৎ চেয়েছি। আপনি নিরস্ত্র, আমার পকেটে ওটা থাকা শোভন নয়।

নীহারবিন্দু যন্ত্রটা তুলে নিলেন। স্প্যানিশ রুবি-এক্সট্রা। ক্যাচ টিপে দেখলেন, ছয়টা চেম্বারেই তাজা বুলেট সারি-সারি সাজানো। বলেন, লাইসেন্সটা কার নামে?

—দাদার। আই মিন, দীনবন্ধু জানার।

—আই সি। তোমার কেরিয়ার লাইসেন্স আছে?

—আছে।

যন্ত্রটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলেন, এবার বলো, কী বলতে এসেছ। খুকুর জন্য যে পাত্র স্থির করেছি, তার বিরুদ্ধে কী জেনেছ তোমরা?

—কিছুই জানিনি স্যার। ওটা বাজে কথা বলেছিলাম, যাতে সতীশবাবু কিছু না আঁচ করেন। গোপন কথাটা সেই পাত্রের সম্বন্ধে নয়, আপনার মেয়ে সুতপা সংক্রান্ত।

কঠিন হয়ে উঠল নীহারবিন্দুর মুখ। বললেন, বটে! কী কথা!

শ্যামল প্রথম চালেই রঙের টেক্কাটা নামিয়ে দিল টেবিলে।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে সংগ্রহ করা ফটোস্ট্যাট কপি।

নীহারবিন্দু আই. পি. এস.-অফিসার। ইংরাজি জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট। তবু খুঁটিয়ে কাগজখানা দেখে বললেন, এর মানে কী?

—আপনার তৃতীয়া কন্যা সুতপা পাল, 'নী' বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহিতা। মাসছয়েক আগে রেজিস্ট্রি মতে বিবাহ করেছে। অবিলম্বে তার দ্বিতীয়বার বিবাহের আয়োজনটা বন্ধ করুন।

তবু যেন বোধগম্য হল না ব্যাপারটা। বলেন, বিশ্বনাথ পাল কে?

—আপনার জামাই! আর কিছু জানি না আমরা।

—এটা যে 'ফোর্জারি' নয়, তার প্রমাণ কী?

—ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘরে টেলিফোন আছে। নাম্বারটা আমি টুকে এনেছি স্যার। ওঁকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করুন ঘণ্টাখানেক আগে আমরা ওঁর অফিস-রেজিস্ট্রার থেকে এটা ফটোস্ট্যাট করিয়ে এনেছি কি না।

নীহারবিন্দু একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কাগজটার দিকে। টেলিফোন করতে উঠে গেলেন না। প্রশ্ন করলেন, এঁরা দুজন কে কে? বিকাশ সেন আর অজিতেশ দত্তগুপ্ত?

—বিকাশ সেন সম্ভবত বিশ্বনাথের ক্লাসফ্রেন্ড, অন্তত তার বন্ধুস্থানীয়। আর দ্বিতীয় সাক্ষী এই ইনি—অজিতেশবাবু। এঁর প্রেসেই আপনার লোক নিতান্ত ঘটনাচক্রে আপনার নিমন্ত্রণপত্রটা ছাপতে দিয়েছিল। তাই উনি ব্যাপারটা জানতে পারেন, আপনার প্রচণ্ড বিপদের কথা বুঝতে পেরে দীনবন্ধুদার শরণাপন্ন হন, কী কর্তব্য তা বুঝে নিতে। দীনবন্ধুদা বললেন, সমস্ত ব্যাপারটা গোপনে আপনাকে জানাতে।

নীহারবিন্দু এবার অজিতেশবাবুর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, এই 'বিশ্বনাথ পাল' ছোকরা কে? কোথায় থাকে সে?

অজিতেশ আম্‌তা আম্‌তা করেন, তা জানি না। বিশ্বনাথ আর সুতপা আমার কাছে এসে অনুরোধ করেছিল তাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজে সাক্ষী হতে...

—আর অমনি আপনি কন্যাকর্তাটি সেজে সাক্ষী দিতে ছুটলেন। পাত্রের ঠিকানা জানেন না, সে চোর-ছ্যাঁচোড়, মদো-মাতাল কি না জানেন না, কিন্তু এটুকু তো জানতেন যে সে বামুন নয়? তাহলে কেন রাজি হলেন সাক্ষী দিতে? কী স্বার্থ ছিল আপনার?

মানী নির্বিরোধী বৃদ্ধের মুখটা থমথম করতে থাকে। জবাব দিতে পারেন না।

নীহারবিন্দুর কণ্ঠস্বর আর এক কাঠি ওপরে ওঠে, আপনি যে মিছে কথা বলছেন না, আপনি যে ব্ল্যাকমেলিং করতে একটা ফোর্জড ফটোস্ট্যাট-কপি নিয়ে আসেননি তার প্রমাণ কী?

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ! জীবনের পঞ্চাশটা বছর যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন মুহূর্তে। দৃঢ়স্বরে বললেন, মিস্টার ব্যানার্জি! সাধারণ ল-অ্যাবাইডিং নাগরিক হিসাবে যেটুকু আমার কর্তব্য ছিল, তা আমি করেছি! ওটা 'ফোর্জড' কিনা সে অনুসন্ধান ইচ্ছে হলে আপনি করবেন, ইচ্ছে না হলে দ্বিতীয়বার মেয়ের বিয়ে দেবেন, আমার কিছু বলার নেই, এসো শ্যামল...

নীহারবিন্দু একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, কিছু একটা কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হল না তাঁর।

বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় বলেন, এটা আপনার বাড়ি। আমি অযাচিত এসেছি। আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কার করতে পারেন; কিন্তু জেনে রাখবেন, পুলিশকে আমি ডরাই না! আপনার জন্মের আগেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লিফ্‌লেট ছাপার অপরাধে আমাকে পুলিসি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে...

শ্যামল দ্রুত পরিস্থিতিটা সামলে নিল। নীহারবিন্দু অত্যন্ত বিচলিত, বাকশক্তি রহিত, অজিতেশ আগ্নেয়গিরি! সে হাত ধরে বৃদ্ধকে পুনরায় বসিয়ে দিল। নীহারবিন্দুকে শান্তস্বরে বললে, মাথা গরম করবেন না স্যার! এটা কি মাথা গরম করার সময়? আপনি স্থির হন। সুতপাকে ডেকে পাঠান। তার কৈফিয়তটা আগে শুনুন...

জাঁদরেল পুলিশ-অফিসার বহুকষ্টে আত্মস্থ হলেন। শ্যামলের যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করলেন ক্রমে। টলতে টলতে উঠে গিয়ে দরজাটা অর্গলমুক্ত করে বাইরে মুখ বার করে ডাকলেন, জগু, জগদীশ—

তৎক্ষণাৎ গৃহভৃত্যটি এগিয়ে এল। সে বোধহয় দ্বারের বাইরেই অপেক্ষায় ছিল।

—খুকুকে ডেকে দে—

একটু পরেই সুতপা এসে উপস্থিত হল। তাকে বাহুমূল ধরে টেনে নিলেন ঘরের ভিতর। পুনরায় দ্বারটি বন্ধ করে তর্জনী সঙ্কেতে অজিতেশবাবুকে দেখিয়ে বললেন, ঐ ওঁকে চিনিস?

সুতপার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল, একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল অজিতেশবাবুর দিকে। তার মনের মধ্যে তখন কী হচ্ছে তা ঈশ্বরই জানেন।

—চুপ করে আছিস্ কেন? জবাব দে! এঁকে তুই চিনিস?

যেন সংবিৎ ফিরে পায় এতক্ষণে। ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে নির্বাক জবাব দেয়, না!

—ওয়েল? এখন কী বলবেন?—নীহারবিন্দু রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইলেন।

অজিতেশবাবু কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন। আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্যামল বলে, আপনি চুপ করে বসে থাকুন। আমাকে প্রশ্ন করতে দিন।

অজিতেশের অ্যাটাচিকেস খুলে 'কলকাকলী'র সংখ্যাটা মেলে ধরে শ্যামল এবার মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, এই পত্রিকাটা আপনি আর বিশ্বনাথবাবু ওঁর প্রেস থেকে ছাপাননি?...না, না, এখনি জবাব দেবেন না। ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, না না বলার আগে ভেবে দেখুন—এই পত্রিকার প্রুফ দেখেছেন কিনা—নিজের হাতে প্রিন্ট অর্ডার দিয়ে সই করেছেন কিনা! আপনি অস্বীকার করলেও হস্তরেখাবিদ সেটা করোবরেট করবেন কিনা! তার চেয়ে বড় কথা এটা দেখুন—আপনার বাবাকে বলুন এই সার্টিফিকেটখানা জাল কিনা! হ্যাঁ, দেখুন—নিজের হাতে নিয়ে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখুন। ওটা অরিজিনাল নয়, ফটোস্ট্যাট কপি! ছিঁড়ে ফেললেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না!

কোথাও কিছু নেই দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে সুতপা!

নীহারবিন্দু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন মেঝের উপরেই!

তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা স্বগতোক্তি বার হল শুধু—'মাই গড!'

সুতপা তৎক্ষণাৎ ছিটকানি খুলে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

শ্যামল ওঁকে ধরে ফেলার আগেই কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়লেন নীহারবিন্দু!

অজিতেশ উঠে দাঁড়ান, এ কী হল? উনি যে অজ্ঞান হয়ে গেলেন!

শ্যামল বললে, আপনিও যেন হবেন না। স্থির হয়ে বসে থাকুন। আমি দেখছি।

দ্বারের বাইরে এসে শ্যামলের নজর হল সেখানে রীতিমতো একটা জটলা। আট-দশ জন পুরুষ ও রমণী। ঘরের ভিতর একটা চরম নাটক হচ্ছে এটা ওঁরা অনুমান করেছেন। সতীশচন্দ্রের মাধ্যমে কারও বোধহয় জানতে বাকি নেই কী একটা মর্মান্তিক গোপনীয় সংবাদ নিয়ে দু-দুজন উট্‌কো লোক এসে জুটেছে। সকাল থেকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ব্যাপারটা কী জাতের তা অনুমান করতে পারা যায়নি কিন্তু রোরুদ্যমানা সুতপাকে ঘর ছেড়ে ছুটে পালাতে দেখে ওঁদের আতঙ্ক আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। মিসেস ব্যানার্জি, সুতপার মা, রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতে এগিয়েই আসছিলেন। সেই চরম মুহূর্তে দ্বার খুলে বেরিয়ে এল শ্যামল। সামনেই দেখতে পেল একজন সুবেশ যুবককে। তাকেই বললে, স্যার অজ্ঞান হয়ে গেছেন। একটু জল, আর এক্ষুনি ডাক্তারকে একটা ফোন করুন। মানে, আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান—

এক ধাক্কায় শ্যামলকে সরিয়ে দিয়ে সতীশচন্দ্র প্রবেশ করলেন ঘরে। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মতো মাটিতে পড়ে আছেন নীহারবিন্দু, আর অজিতেশ একটা ইলাসট্রেটেড উইক্‌লি দিয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন! তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে একবার দেখে নিয়ে সতীশচন্দ্র ঐ যুবকটিকে বললেন, কল্যাণ, তুমি ওঁর পায়ের দিকে ধরো তো, মেসোমশাইকে ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিই।

শ্যামল বাধা দিল, না! যেমন আছেন ঐ রকমই থাকতে দিন। মাথার নীচে একটা বালিশ দিয়ে দিন বরং। ডাক্তার এসে আগে দেখুক। নড়ানো-চড়ানো ঠিক নয়...

কে একজন ছুটল জল আনতে। সতীশচন্দ্র নিজেই গেলেন ডাক্তারকে ফোন করতে। তৃতীয় জন নেমে গেল নীচে, গাড়ি নিয়ে ডাক্তারকে পাকড়াও করে আনতে। অনতিবিলম্বে শোনা গেল নীচে পুলিশ-ভ্যানটা 'ক্যাঁকো' শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। মিসেস ব্যানার্জি, সুতপার মা, বসলেন স্বামীর মাথার কাছে। শার্টের বোতামগুলো খুলে দিলেন। একটি মহিলা কোথা থেকে একটা টেব্‌ল-ফ্যান এনে বসিয়ে দিলেন মাথার কাছে।

যুবকটি এগিয়ে এসে শ্যামলকে বললে, আমার নাম কল্যাণ রায়, আমি ওঁর মেজ জামাই। হঠাৎ কী করে এমন হল বলুন তো?

শ্যামল তার হাত ধরে ঘরের দূরতম প্রান্তে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, উই আর সরি। একটা গোপন ও জরুরি খবর ওঁকে না দিলেই চলছিল না। সেটা শুনেই শক্‌ড হয়েছেন। মনে হয়, ভয়ের কিছু নেই...

—আপনারা জানতেন না, উনি হার্ট পেশেন্ট? হাই ব্লাডপ্রেশারে ভুগছেন!

—উপায় ছিল না কল্যাণবাবু। কিন্তু যা হয়ে গেছে তার চারা নেই। এখন কতকগুলো জরুরি কাজ আছে। আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু তার আগে

আমাকে কয়েকটা খবর বলুন তো। প্রথম কথা, স্যারের মাথার কাছে যিনি বসে আছেন উনিই কি মিসেস ব্যানার্জি, আপনার শাশুড়ি?

—হ্যাঁ।

—আর ঐ যিনি আঁচল দিয়ে ওঁর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছেন, উনি?

—আমার স্ত্রী। নীহারবিন্দুরবাবুর মেজ মেয়ে!

—শুনেছি ওঁর তিন মেয়ে। বড় মেয়ে-জামাই?

—ওঁরা আগামী কালকের ফ্লাইটে আসবেন। সানফ্রান্সিস্কো থেকে। কিন্তু এসব তথ্য কেন জানতে চাইছেন বলুন তো?

—বললাম যে এক্ষুণি। পারিবারিক প্রয়োজনে এখনি কয়েকটি স্টেপ নিতে হবে। 'স্যার' যদি সুস্থ থাকতেন তিনিই ব্যবস্থা করতেন। তিনি যেহেতু অসুস্থ তাই...আচ্ছা ওঁর কোনো ছেলে নেই। আপনার শালা বা সম্বন্ধী?

—না। ওঁর তিনটি সন্তান। তিনটিই মেয়ে।

—আই সি। কিন্তু সুতপা কোথায়?

কল্যাণ অবাক হয়ে দেখল, সমস্ত বাড়ি ভেঙে পড়েছে এ-ঘরে, অথচ তার ছোট শালী, যার বিয়েতে এই জনসমাগম সেই একমাত্র অনুপস্থিত। শ্যামল বললে, এখানে আপনার-আমার কিছু করণীয় নেই। আপনি আমাকে সুতপার কাছে নিয়ে চলুন। আপনার উপস্থিতিতে আমি তাকে কয়েকটি কথা বলতে চাই। খুব জরুরি কথা!

কল্যাণ শ্যামলকে চেনে না; কিন্তু তার কথাবার্তায় এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর আছে যে, সে বিশ্বাস করল—এ লোকটা এ পরিবারের ভালই করতে চায়। এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে। বললে, আসুন...

শ্যামল অজিতেশবাবুকে বলে গেল, আপনি নীচের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি এখনি আসছি।

সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠে গেল তিনতলায়। বাড়িটি দ্বিতল। তিনতলা বলতে ছাদ; কিন্তু একটা সিঁড়িঘর বা চিলেকোঠা আছে। বোধকরি এটাই সুতপার ঘর। দ্বার ভিতর থেকে রুদ্ধ। কল্যাণ বারকতক দরজায় ধাক্কা দিল, সুতপার নাম ধরে ডাকল, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

শ্যামল তখন এগিয়ে এল। অনুচ্চ কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বললে, সুতপা, শোনো। তোমার বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ডাক্তার ডাকতে লোক গেছে। ভয়ের কিছু নেই। আমাকে তুমি চিনবে না, কিন্তু এক্ষুনি আমি তোমাকে 'কলকাকলী' বইখানা দেখাচ্ছিলাম। কয়েকটা জরুরি কথা বলে যেতে চাই। তোমার ভালর জন্যই। এখানে আমি ছাড়া শুধু কল্যাণবাবু আছেন। দোর খুলে দাও—প্লিজ।

দরজা খুলে গেল। দশটা মিনিটও হয়নি। সুতপা যেন অন্য একটি রমণীতে পরিণত। তার মুখ রক্তশূন্য! আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে সে দিশেহারা।

শ্যামল কল্যাণকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে

দিল। বললে, সুতপা! শোনো, যা হয়ে গেছে তার চারা নেই! তোমার বাবা হঠাৎ শক্ড্ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। ডাক্তারবাবু এখনি আসবেন। খুব সম্ভবত ভয়ের কিছু নেই। তুমি যেন হঠাৎ কোনো 'ড্রাস্টিক স্টেপ' নিতে যেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ব্যবস্থা করে দেব। পারতপক্ষে এখন তোমার বাবার সামনে যেয়ো না। আর শোনো, বিশুবাবুর বর্তমান ঠিকানাটা কী?

ওর ওষ্ঠাধর অস্ফুটে বললে, আমি জানি না!

—বাজে কথা বোলো না সুতপা! তোমার না-জানা হতেই পারে না! বলো, বলো...

—বিশ্বাস করুন! মাস তিনেক তার কোনো খবরই পাইনি!

—আই সি। মাস-তিনেক আগে তার কী অ্যাড্রেস ছিল?

সুতপা একটা কাগজে খসখস করে লিখে দিল।

—বিকাশ সেনের ঠিকানা জানো?

—না!

—বিশুবাবুর কোনো আত্মীয়-বন্ধু? কলকাতায় কোনো লিঙ্ক-অ্যাড্রেস?

সুতপা ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল।

শ্যামলের ইচ্ছে করছিল মেয়েটার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিতে। তার পরিবর্তে অতি শান্ত কণ্ঠে বললে, এ বাড়িতে তোমার বাবা ছাড়া আর কেউ কিছু জানেন না। কাল তোমার বড়দি আসবেন শুনলাম। তাঁকে কি সব কথা খুলে বলা সম্ভবপর হবে? বড়দি আর তাঁর মারফতে বড় জামাইবাবুকে?

সুতপা মাথাটা নিচু করল। বেশ কিছুটা নীরব থেকে বলল, হবে!

—দ্যাটস গুড! বুঝতেই পারছ—পরশু তোমার বিয়েটা হচ্ছে না। কিন্তু এ অবস্থায় তোমার পক্ষে এ বাড়িতে থাকাটা ভাল নয়—না তোমার পক্ষে, না তোমার বাবার পক্ষে। বড়দিকে নিয়ে কদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে যাওয়া কি সম্ভব হবে? কাশ্মীর, গোয়া, দক্ষিণ ভারত—এনি হোয়্যার?

সুতপা জলভরা দুটি কৃতজ্ঞ চোখ তুলে বলল, খুব সম্ভবত হবে। বলব বড়দিকে...

—দ্যাটস এ গুড গার্ল! পারতপক্ষে এ দুদিন বাবার সামনে এসো না। কল্যাণবাবু কিছুটা আঁচ করেছেন। ন্যাচারালি তোমার ছোড়দিও জানতে পারবেন। ওঁরা যদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন তবে তোমার মাকেও জানাবেন। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে বলে যাই—ড্রাস্টিক কিছু করে বোসো না, প্লিজ।

—'ড্রাস্টিক কিছু' মানে?

—তুমি বুদ্ধিমতী। একটু ভেবে দেখো কথাটার কী মানে হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অনেকে কোনো মেলোড্রামাটিক সল্যুশানের চেষ্টা করে। বি বোল্ড! ট্রাই টু টেক দ্য পাঞ্চ! বিশ্বাস করো আমার উপর। একটা অ্যামিকেব্‌ল সেটলমেন্ট হবেই। তোমার ইচ্ছানুসারে। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি।

এতক্ষণে সুতপা ম্লান হাসল। বলল, থ্যাঙ্কস!

—তাহলে আমাকে কথা দিচ্ছ—মেলোড্রামাটিক কিছু করে বসবার চেষ্টা করবে না?

এবার আর কথা বলল না। দু চোখ বুজে ইতিবাচক ভঙ্গি করল একটা।

—এবার দরজাটা বন্ধ করে দাও! তোমার শোকাহত হবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কেউ কিছু মনে করবে না। আফটার অল, কাল বাদে পরশু তোমার বিয়ে হওয়ার কথা! বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেছ! অথচ বিয়েটা হচ্ছে না। তুমি এ ঘরে রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে কাঁদলে কেউ কিছু মনে করবে না!

এবার সে কল্যাণের দিকে ফেরে। বলে, আমার জরুরি কথাটা বলা হয়ে গেছে। চলুন, এবার নীচে যাই।

কল্যাণ দৃঢ়মুষ্টিতে শ্যামলের হাতটা ধরে ফেলল। বললে, না! আগে বলুন কী হয়েছে! আমার জানা দরকার!

শ্যামল একবার সুতপা একবার কল্যাণের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বললে, সব কথা আপনাকে বলবার অধিকার আমার নেই। 'স্যার' বলবেন। তবে আপনাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখলেও চলবে না। তাই যতটুকু না বললে নয় ততটুকুই বলছি। শুনুন—

সুতপার মুখ দিয়ে অস্ফুটে একটা শব্দ বার হয়ে এল, ন্‌না!

শ্যামল গ্রাহ্য করল না। বললে, আমরা একটা মারাত্মক সংবাদ নিয়ে এসেছি এটা নিশ্চয় বুঝছেন। সেটা 'কী' তা আমি বলব না, বলতে পারি না। ধরুন সেটা সুতপার সঙ্গে যে ছেলেটির সম্বন্ধ হয়েছে তার বিষয়ে একটা মারাত্মক তথ্য। ধরা যাক সে বিবাহিত, কিংবা খুনের আসামি, অথবা তার একটা 'কেপ্‌ট' আছে! এমন একটা সংবাদে আপনার শ্বশুর অজ্ঞান হয়ে যাবেন এটা কি অপ্রত্যাশিত? খবরটা নির্মম কিন্তু অবিসংবাদিত। এ ক্ষেত্রে এই শেষমুহূর্তে বিয়েটা ভেঙে দিতে হচ্ছে! মিস্টার ব্যানার্জিই স্থির করবেন—এ ক্ষেত্রে কী করণীয়। কিন্তু যেহেতু তিনি অসুস্থ...

কথাটা শেষ হল না। একতলা থেকে পুলিশ-ভ্যানের সাইরেন ভেসে এল।

—ঐ বোধহয় ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। চলুন নীচে যাই!

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। শ্যামল চোখ তুলে দেখতে পায় দুহাতে দুটি পাল্লা ধরে সুতপা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার দু চোখে জল টলটল করছে। তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা!

নীচে নেমে এসে দেখল ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করছেন। না, নীহারবিন্দু মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে তাঁকে একটা সোফা-কাম বেডে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মাথার কাছে প্রস্তরমূর্তির মতো বসে আছেন মিসেস ব্যানার্জি। ঘর ভর্তি আত্মীয়-স্বজন। ডাক্তার ব্লাডপ্রেশার দেখছিলেন। ওরা দুজন যে পিছন থেকে চুপিচুপি

ঘরে ঢুকে পড়েছে এটা কারও নজর হল না। সকলেরই রোগীর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। শ্যামল কল্যাণকে কানে কানে প্রশ্ন করে, কী নাম ডাক্তারবাবুর? উনিই কি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান?

—না, ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান নন। তবে শ্বশুরমশায়ের চিকিৎসাটা উনিই করছেন। উনি ডক্টর মৃণালকান্তি বাসু, এম. আর. সি. পি.। উনি একজন কার্ডিওলজিস্ট!

ততক্ষণে ডাক্তারবাবু রোগীর হাতে পায়ে প্লাগ লাগিয়ে ই. সি. জি. করছেন।

শ্যামল পুনরায় কল্যাণের হাত ধরে ইঙ্গিত করল ঘরের বাইরে যেতে। নিঃশব্দে দুজনে বার হয়ে এল বারান্দায়। সেখানে তখন কেউ নেই। চারপাশে একবার দেখে নিয়ে শ্যামল বললে, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে মিস্টার রায়। আমি ডাক্তারবাবুকে জনান্তিকে কয়েকটা তথ্য জানাতে চাই। ইটস মেডিক্যালি নিডেড ফর হিম। আপনি সুযোগ করে দিন—

কল্যাণ বলে, তার আগে আপনার পরিচয়টা দেবেন? বুঝতে পারছি আপনি এ পরিবারের কল্যাণকামী; কিন্তু...

—ইয়েস! আমার নাম শ্যামল মাইতি। আমি পুলিশ-বিভাগে আছি। আপনার শ্বশুরমশায়ের অধীনে। তবে অত্যন্ত অধস্তন কর্মচারী। উনি আমাকে চিনতেই পারেননি, কারণ আমার মতো কয়েক হাজার কর্মচারী ওঁর অধীনে কাজ করে...

—সুতপাকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?

—দিন নয়। আধঘণ্টা আগে তার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছি।

—স্ট্রেঞ্জ!

—না, অবাক হবার কিছু নেই। সুতপা বুদ্ধিমতী। সে বুঝতে পেরেছে আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী! এখন বলুন, আমি যা চাইছি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? ডাক্তারবাবুর রোগী দেখা শেষ হলে এ ঘরেই আমি তাঁকে 'ক্লু'-টা দিতে চাই। কিন্তু ঘরে তখন রোগী আর ডাক্তারবাবু ছাড়া শুধু থাকবেন মিসেস ব্যানার্জি আর আপনার স্ত্রী।

—আমিও থাকব না?

—না! আপনি অনায়াসে মেজদির কাছ থেকে পরে জেনে নিতে পারবেন আমি ডাক্তারবাবুকে কী বলেছি। কিন্তু ঘরটা ফাঁকা করে দিতে হলে আপনার নিজের পক্ষেও স্থান ত্যাগ করা শোভন হবে। আফটার অল, আপনি এ বাড়ির জামাই। নয় কি?

—ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ঘরে ফিরে আসার পর ওরা শুনতে পেল ডাক্তারবাবু বলছেন, না, ভয়ের কিছু নেই। একটা সিডেটিভ দিচ্ছি। ওঁকে ঘুমাতে দিন। ওঁর জ্ঞান হলে আমাকে একটা ফোন করে দেবেন।

সতীশবাবু আগ্ বাড়িয়ে বলেন, এটা কি 'স্ট্রোক' নয়?

—না। বাট হি ওয়ান্টস অ্যাবসলিউট রেস্ট! জ্ঞান হবার পর যদি বাথরুমে যেতে

চান, যেতে পারেন। তবে ঘরের বাইরে যাবেন না। একজন সর্বক্ষণ ওঁর কাছে থাকবেন।

কল্যাণবাবু এগিয়ে এসে বললেন, ডক্টর বাসু। কেস-হিস্ট্রি সম্বন্ধে আপনাকে ইনি কিছু বলতে চান। মানে, কী পরিস্থিতিতে উনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন আমরা কেউ ছিলাম না। ইনি একাই ছিলেন ঘরে।

—আই সি! কী করে উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন হঠাৎ?—ডাক্তারবাবু জানতে চাইলেন শ্যামলের কাছে।

শ্যামল জবাব দিল না। কল্যাণের দিকে তাকাল। কল্যাণ তৎক্ষণাৎ বলল, ব্যাপারটা কন্‌ফিডেনশিয়াল। আসুন, আমরা সবাই বাইরে যাই। উনি জনান্তিকে আপনাকে জানাবেন।

অনেকেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কল্যাণ সতীশচন্দ্রের দিকে ফিরে স্পষ্টভাবে বললে, দাদা আপনিও আসুন। ...না, না, মা থাকুন। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললে, তুমিও থাকতে পারো।

সতীশচন্দ্র শ্যামলের দিকে একজোড়া অগ্নিঝরা চোখ মেলে সবার শেষে নিস্ক্রান্ত হলেন। কল্যাণের পিছু পিছু।

ডাক্তারবাবু বলেন, এবার বলুন? কী যেন বলতে চান আপনি? কীভাবে উনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন?

শ্যামল বললে, একটা অত্যন্ত মর্মান্তিক সংবাদ আমাকে জানাতে হয়েছিল। সেটা শুনেই উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মনে হয়—মেন্টাল শক্-এ।

—আপনি জানতেন না যে, উনি হার্ট পেশেন্ট? হাইপার-টেনশনে ভুগছেন?

শ্যামল সে কথার জবাব না দিয়ে মিসেস ব্যানার্জির দিকে ফিরে হাত দুটি জোড় করে বলে, মা! আমাকে ক্ষমা করবেন! যে-কথাটা বলতে এসেছিলাম, ওঁকে বলেছি, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক! কিন্তু বিশ্বাস করুন, না বলে আমার কোনো উপায় ছিল না!

অদ্ভুত সংযম ভদ্রমহিলার। শান্তকণ্ঠে বললেন, সেটা কি এখন আমাদের বলতে পারো? উনি তো অজ্ঞান। এ আমার মেজ মেয়ে। আর ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে কোনো কিছুই গোপন করা উচিত নয়।

শ্যামল একই কথা আবার জানাল। যুক্ত করে। সবিনয়ে।

—মাপ করবেন মা! দুঃসংবাদটা 'কী' তা আমি আর কাউকে জানাতে পারব না। স্যার সুস্থ হলে নিজেই আপনাকে বলবেন। তবে এটুকু বলতে পারি খবরটা জরুরি এবং অত্যন্ত গোপন। ধরুন, আপনার ছোট মেয়ের সঙ্গে যে ছেলেটির বিবাহ হতে যাচ্ছে তার সম্বন্ধে আমরা একটা গোপন খবর পেয়েছি—ধরা যাক সে বিবাহিত, কিংবা খুনের আসামি, অথবা তার একটা দুরারোগ্য গোপন ব্যাধি আছে! এমন একটা খবর শুনে উনি 'শকড্' হতে বাধ্য! তাই হয়েছেন! একটা ব্যাপার নিশ্চিত! আপনার ছোট মেয়ের

বিয়েটা 'স্যার' এখন ভেঙে দিতে চান। জ্ঞান হলে সে কথা তিনি নিজেই আপনাকে বলবেন। হয়তো তখন প্রকৃত কারণটাও জানাবেন।

এবার মিসেস ব্যানার্জিই লুটিয়ে পড়ছিলেন। তাঁর মেয়ে মাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, ওসব কী বলছেন আপনি? সুভাষের সম্বন্ধে বাবা এত খবর নিয়েছেন অথচ তিনি তা জানতে পারেননি?

—সুভাষ কে?

—যার সঙ্গে সুতপার পরশু বিয়ে হবে।

—না দিদি। পরশু এ বিয়ে হবে না!

—কিন্তু এখন, এই শেষ মুহূর্তে কীভাবে সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যাবে? নিমন্ত্রিতরা সবাই...তা ছাড়া, আপনি যে অভিযোগটা এনেছেন তা সত্য কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কী?

—তার অকাট্য প্রমাণ দেখেই স্যার সেন্স হারান। সেটা আমার পকেটেই রয়েছে; কিন্তু তা আপনাদের দেখাতে পারছি না। জ্ঞান হবার পর স্যারই তা বলতে পারেন। আমার অধিকার নেই।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, আমাকে আর কিছু কি বলবার আছে?

—আছে ডাক্তারবাবু! আমার একটা 'হাম্বল সাজেশান'!

হঠাৎ মিসেস ব্যানার্জির দিকে ফিরে হাত দুটি জোড় করে বলে, আপনি অনুমতি দিচ্ছেন ধরে নিয়েই অযাচিতভাবে এই 'সাজেশন' দিচ্ছি।

ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরে শ্যামল দৃঢ়স্বরে বলে, আপনি আপনার মতামতটা বদলে ফেলুন ডক্টর বোস। স্যারকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কোনো নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সব চেয়ে ভাল হয় দিন তিনেক কোনো 'ইন্টেনসিভ্ কেয়ার য়ুনিটে' লোকচক্ষুর আড়ালে ওঁকে রাখতে পারলে। সেই অজুহাতেই আমরা আপাতত বিয়েটা পোস্টপন্ড করতে পারি। অর্থব্যয় যা হবার তা হয়েছে, হয়তো আরও কিছু হবে; কিন্তু লোকলজ্জা, সামাজিকতা...

ডাক্তার বাসু বলেন, ইম্পসিব্‌ল্! ওঁর কিছু হয়নি! নিতে গেলে ওঁকে পি. জি.-তে নিতে হয়—অথবা বেল-ভিউ। কিন্তু সেখানে এমার্জেন্সিতে ওঁকে পরীক্ষা করেই তো ওরা ফেরত পাঠাবে। ওঁর প্রেশার নর্মাল, ই. সি. জি-তে যা ছিল তাই—কী অজুহাতে ওঁকে হাসপাতালে আটকে রাখব?

—সরকারি হাসপাতাল বা খানদানি নার্সিংহোমে যে যেতেই হবে তার কোনো মানে নেই। আপনিও জানেন, আমরাও জানি—ওঁর কিছু হয়নি। ভয়ের কিছু নেই। এ শুধু একটা স্ট্র্যাটেজি। বিয়েটা পোস্টপন্ড করার একটা অছিলা খুঁজছি আমরা...

ডাক্তার বাসু মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বলেন, আয়াম সরি! মেডিক্যাল এথিক্‌স্ বলে তো একটা কথা আছে। তা ছাড়া বিয়েটা পোস্টপন্ড করতে আপনি চাইছেন—আপনার কোনো স্বার্থ আছে কিনা তাও আমার অজানা। আপনি কে...কোন সূত্রে এমন একটা স্ক্যান্ডালাস...

—ডাক্তার!

শব্দটা যেন অন্তরীক্ষ থেকে ভেসে এল। ঘর-সুদ্ধ সবাই চমকে উঠেছেন।

অন্তরীক্ষ নয়, কথাটা বলেছেন রোগী স্বয়ং। তাঁর চোখ দুটি খোলা।

সবাই ঝুঁকে পড়ে তাঁর উপর। স্পষ্ট উচ্চারণে নীহারবিন্দু বললেন, ও ছোকরা কে তা আমি জানি না; কিন্তু ও কার স্বার্থে এ-কথা বলছে তা জানি। দেয়ার্স নো সেকেন্ড অল্টারনেটিভ! তোমার বিশ্বস্ত কোনও নার্সিংহোমে আমাকে নিয়ে চলো। দিন-তিনেক আটকে রাখো।

মিসেস ব্যানার্জি ঝুঁকে পড়ে বলেন, তুমি...তুমি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলে? বুঝতে পাচ্ছিলে?

নীহারবিন্দু এ বাহুল্য প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু বললেন, একটা কথা শুনে রাখো! আগামী বাহাত্তর ঘণ্টা আমার জ্ঞান থাকবে না। ডাক্তার গ্লুকোস ইনজেকশান দেবে! কিন্তু খুকির বিয়েটা পোস্টপন্ড করতে হবে। ক্যানসেলই বলতাম, তবে আমি সুস্থ হয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত পোস্টপন্ড বলাই শোভন!

—তার মানে...তার মানে সুভাষের নামে এ যা বলছে...

—সে-সব কথা সুযোগ মতো পরে আলোচনা করা যাবে গিন্নি! অপরাধটা যে সুভাষই করেছে এ-কথা ও-ছোকরা বলেনি কিন্তু, এটা ভুলো না। বলেছে, যুক্তি হিসাবে, 'ধরুন সুভাষ বিবাহিত অথবা...' কোনো ড্রাস্টিক স্টেপ নিয়ো না। আমাকে একটু ধীর-স্থির ভাবে ভাবতে দাও। ...ডাক্তার! প্লিজ হেল্প মি। আমি কিন্তু আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি এবার। ফর সেভেন্টি টু আওয়ার্স! তিনদিন আমার জ্ঞান থাকবে না!

পরমুহূর্তেই নীহারবিন্দু নিথর হয়ে গেলেন!

আধঘণ্টা-খানেক পরে যখন অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানটা এসে দাঁড়াল ম্যারাপ-বাঁধা বিয়েবাড়ির সামনে, তখন রাস্তায় ভিড়ে ভিড়। সমস্ত পাড়ার লোক জমায়েত হয়েছে সড়কে। নীহারবিন্দু এপাড়ার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। পাড়ার পূজায়, স্পোর্টিং ক্লাবে, লাইব্রেরিতে মোটা হাতে চাঁদা দিয়ে থাকেন। তাই মুখে-মুখে খবরটা ছড়িয়ে গেছে। 'অচৈতন্য' পুলিশ-সাহেবকে স্ট্রেচারে করে নামিয়ে আনা হল। অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলেন সতীশচন্দ্র, ডাক্তার বাসুকে নিয়ে। সঙ্গে চলল দু-তিনখানা গাড়ি বোঝাই আত্মীয়বন্ধুরা। অ্যাম্বুলেন্সের সমুখে সাইরেন বাজাতে বাজাতে একটা পুলিশ-ভ্যান—তাতে বেশ কিছু হোমরা-চোমরা। সতীশচন্দ্র দৃঢ় আপত্তি করেছিলেন নার্সিংহোমের নামটা শুনে। শহরে এত-এত খানদানি নার্সিংহোম থাকতে ডক্টর বাসু কেন ওঁকে নিয়ে যাচ্ছেন এমন একটা অখ্যাত চিকিৎসা-কেন্দ্রে? কিন্তু মিসেস ব্যানার্জির দৃঢ়তর আপত্তিতে তাঁর প্রতিবাদ ভেসে গেল। মিসেস ব্যানার্জি বলেছিলেন, ডক্টর বাসু যা চাইবেন তাই হবে। ডাক্তারের উপর কথা বলা চলবে না।

অ্যাম্বুলেন্স রওনা হয়ে যাবার পর অজিতেশবাবু আতিপাতি করে খুঁজলেন কিন্তু

শ্যামলের টিকিটুকু দেখতে পেলেন না! আশ্চর্য মানুষ তো! ওঁকে নীচে অপেক্ষা করতে বলে কখন নিঃসাড়ে সরে পড়েছে! যাক, তাঁর কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে। এবার নিশ্চিন্ত মনে নিজের ডেরায় ফিরতে পারেন।

রাস্তা দিয়ে মোড়ের কাছে এসে দেখেন শ্যামল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছে!

—বাঃ! তুমি এখানে? আমি ভাবলাম চলে গেছ তুমি।

—তাই কি পারি? আপনাকে নিয়ে যেতে হবে না?

—তাহলে এতদূরে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছ কেন?

—বুঝলেন না? এখনি যে আমার তলব হত! মিসেস ব্যানার্জি এখনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আড়ালে ডেকে যদি প্রশ্ন করতেন তখন আমি যে উভয়-সঙ্কটে পড়তাম! না পারতাম সত্যি কথাটা বলতে, না লুকাতে!

—কেন? সত্যি কথা স্বীকার করলে কী হত?

—সুতপার উপর নির্যাতন শুরু হয়ে যেত। 'স্যার' যেভাবে সমস্যাটা সমাধান করতে চাইবেন হয়তো তা ভেস্তে যেত—

—আর সত্য গোপন করলে?

—আপনি কি বুঝবেন? 'বস'-এর 'বেটারহাফ'কে চটিয়ে দিলে চাকরির ক্ষেত্রে সমূহ সর্বনাশ! চাকরি তো কখনো করেননি, এসব আপনি বুঝবেন না!

অজিতেশবাবু বলেন, সে যাই হোক বাবা শ্যামল, তুমি আজ আমার যে উপকার করলে...

—কী যা তা বলছেন দাদু! উপকার তো করলেন আপনি, আমার! সাহেব এখনো এ ছোকরার পরিচয় জানেন না; কিন্তু একদিন জানতে পারবেন। এ ছোকরাকে তিনি আজীবন ভুলতে পারবেন না! এটা কি কম লাভ? একদিন-না-একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন নিজে থেকেই!

শ্যামলের অনুমান মিথ্যা নয়—'একদিন-না-একদিন' নয়, মাসখানেকের ভিতরেই শ্যামল ডাক পেল।

খবরটা দীনবন্ধু দিলেন ওকে, ওরে শ্যামল, ডি. আই. জি. সাহেব তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় তাঁর রেসিডেন্সে দেখা করিস। দুপুরের ট্রেনে চুঁচুড়ায় চলে যা।

ডি. আই. জি., বার্ডওয়ান-রেঞ্জের অফিস চুঁচুড়ায়।

কিন্তু খবরটা দীনবন্ধু জানার মাধ্যমে এল কেন? নীহারবিন্দু, নিশ্চয় ওর পরিচয় পেয়েছেন এতদিনে। দুর্গাপুরের থানা-অফিসারের মাধ্যমেই তো এই নগণ্য কনস্টেব্‌লটাকে তলব করতে পারতেন। তাহলে অফিশিয়ালি সে যেতে পারত, ছুটি নিতে হত না। প্রশ্নটা করায় জামাইবাবুর কাছে ধমক খেতে হল, তোর এত বুদ্ধি শ্যামল, এমন চৌখস ছেলে তুই, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় একেবারে গর্দভ! বুঝলি না? ডি. আই. জি. সাহেব ব্যাপারটাকে অফিশিয়াল পর্যায়ে নিতে চান না। আর সেজন্য বলেছেন সন্ধ্যাবেলা ওঁর বাড়িতে দেখা করতে, অফিসে নয়! দ্যাখ, তোর বেড়ালের ভাগ্যে বোধহয় শিকেটা ছিঁড়ল!

মোটামুটি খবরটা জানত। পুলিশ বিভাগের সবাই যেটুকু জানে—নীহারবিন্দু হঠাৎ 'থ্রম্বোসিসের অ্যাটাকে' শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন! পাক্কা বাহাত্তর ঘণ্টা তাঁকে 'ইন্‌টেনসিভ কেয়ার য়ুনিটে' লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞান অবস্থায় রাখা হয়েছিল। তখন আত্মীয়-স্বজন, মায় মিসেস ব্যানার্জিকে পর্যন্ত ঘরের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তারপর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। হপ্তা-দুয়েক কেবিনে থেকে একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। লম্বা ছুটি নিতে হয়েছে। গত সপ্তাহে কলকাতা থেকে চুঁচুড়ায় তাঁর সরকারি ডেরায় এসেছেন। এখন একবেলা করে অফিসেও যাচ্ছেন। তবে ট্যুর-এ বার হচ্ছেন না। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা—ওঁর ছোট মেয়েটির বিবাহ স্থগিত রাখতে হয়েছে। প্রায় বিয়ের-পিঁড়ি থেকে উঠে আসা মেয়েটিকে লোকলজ্জার হাত থেকে রেহাই দিতে সুতপার বড়দি আর বড় জামাইবাবু ওকে নিয়ে কোথায় নাকি বেড়াতে গেছেন। ওঁরা তিন মাসের ভিসা নিয়ে এসেছেন। ফলে এই সুযোগে, অথবা দুর্যোগে, ভারত দর্শনটা সেরে ফেলছেন! জনশ্রুতি, বড়দির সঙ্গে সুতপা মাসতিনেকের জন্য মার্কিন-মুলুকে বেড়াতে যাবে! আহা! তা তো যেতেই পারে। এমন একটা শক্ পেয়েছে!

শ্যামল গুটিগুটি গিয়ে উপস্থিত হল সাহেবের বাংলোতে।

বোঝা গেল সে প্রত্যাশিত অতিথি। দারোয়ানের কাছে মনোগত বাসনাটা জানানোর আগেই সে প্রশ্ন করল, আপনি শ্যামলবাবু আছেন?

—আছি!

—তব আইয়ে ভিতর।

শ্যামল অনেক বুদ্ধি-বিবেচনা করে ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছে। পুলিশ য়ুনিফর্মে নয়। তখনো সে পুলিশ-কনস্টেব্‌ল্। ড্রইংরুমের সামনে চপ্পল-জোড়া খুলে রেখে কার্পেট মাড়িয়ে সে গিয়ে বসল একটা সোফায়। দারোয়ান পাখাটা খুলে দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হল।

একটু পরেই শোনা গেল পদশব্দ। ভিতরের দিক থেকে। ঢিলেঢালা একটা পায়জামা আর সিল্কের একটা গাউন গায়ে ডি. আই. জি. সাহেব প্রবেশ করলেন সেদিক থেকে। তাঁর হাতে ধূমায়িত একটা বর্মা চুরুট।

যদিও ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছে তবু তড়াক করে উঠে দাঁড়াল শ্যামল। অ্যাটেনশান হল।

—সিডাউন, সিডাউন!—নিজেও বসলেন উনি।

শ্যামল অনুরুদ্ধ হয়েও বসল না। নীহারবিন্দু এক নজর দেখে নিয়ে বলেন, কী হল? বসতে বললাম তো?

—না স্যার! সেদিন পরিচয়টা দিইনি, শুধু নামটুকুই বলেছিলাম। আমি আপনার অধীনেই একজন সামান্য কনস্টেব্‌ল্ স্যার!

—নো! য়ু আর নট! তুমি সাব-ইন্‌সপেক্টর!

শ্যামল অবাক হয়। সে নিজে কী, তা জানে না? সাহেব এসব কী বলছেন!

নীহারবিন্দু বলেন, কনস্টেব্‌ল্‌ অর সাব-ইন্‌সপেক্টর—মেক্‌স্‌ নো ডিফারেন্স! য়ু হ্যাভ বিন অর্ডার্ড টু টেক য়োর সিট! সিট ডা-উ-ন!

শ্যামল ধপ করে বসে পড়ে।

—ফিরে গেলে অর্ডারটা পাবে। য়ু হ্যাভ বিন প্রমোটেড। তুমি জানো না শ্যামল, তুমি পুলিশ-বিভাগে একটা 'প্রিসিডেন্স' হয়ে রইলে—একজন নন্‌-ম্যাট্রিক কনস্টেব্‌ল্‌ শুধু সুপারিশের জোরে বিনা ডিপার্টমেন্টাল-পরীক্ষায় সাব-ইন্‌সপেক্টর হয়ে গেলে।

য়ূনিফর্মে নেই। শ্যামল এগিয়ে এসে ওঁর পদধূলি নিল। পরক্ষণেই সে দাঁড়িয়ে উঠল। ভিতর থেকে প্রবেশ করেছেন মিসেস ব্যানার্জি। তাঁর পিছন-পিছন সাহেবের আর্দালী। তার হাতে একটা বড় খাবারের থালা।

শ্যামল মিসেস ব্যানার্জিকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

তিনিই প্রথম কথা বললেন, তুমি সেদিন যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছ শ্যামল, তাতে আমরা মুগ্ধ। আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। দীনবন্ধু জানা মশাইকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ো—তিনি সুসময়ে খবরটা জানিয়েছিলেন বলেই শুধু নয়, তোমার মতো একজন চৌখস ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন বলে।

শ্যামল স্বীকার করল না যে, দীনবন্ধু জানা ব্যাপারটার বিন্দু-বিসর্গও তখন জানতেন না।

—অজিতেশবাবুকেও আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ো। সেদিন তাঁকে শুধু শুধু কিছু কটু কথা শুনতে হয়েছিল। সুযোগ পেলেই আমরা...

ঠিক আছে, ঠিক আছে, মা। তাঁকে বলব। তিনি বিচক্ষণ লোক। বুঝতে পেরেছিলেন কী মর্মান্তিক আঘাতে সেদিন আপনারা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন! ভাল কথা...সুভাষবাবুর বাবাকে কী জানানো হয়েছে...

এবার জবাব দিলেন নীহারবিন্দু, সবটা নয়। কিছুটা! অর্থাৎ আসল কারণটা জানানো হয়নি। ওঁরা জানেন, খুকু জি. আর. ই. দিচ্ছে। মার্কিন মুলুকে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য। এখন সে বিয়ে করতে চায় না। ফলে বিয়েটা ভেঙে গেছে।

শ্যামল নীরব রইল।

—খাও বাবা। আমি চা পাঠিয়ে দিই। চা, না কফি?

—চা-ই খাব।

মিসেস ব্যানার্জি নিষ্ক্রান্ত হলেন। শ্যামল আহারে মন দিল। নীহারবিন্দু ইতিমধ্যে দীনবন্ধু জানার বিষয়ে কিছু খোঁজখবর নিলেন। শ্যামলের সম্বন্ধেও। আহারপর্ব মিটলে নীহারবিন্দু বললেন, শোনো শ্যামল, যে জন্য তোমাকে ডেকেছি তা বলি। খুকুর ব্যাপারটা এখনো কেউ জানে না—মানে আমার পরিবারের বাইরে। ইন ফ্যাক্ট—আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে, ন্যাচারালি দুই জামাই ছাড়া আর কেউ জানে না, সুভাষের মতো একটি

সুপাত্রের সঙ্গে কেন আমি খুকুর বিবাহ দিতে পারলাম না। এই কয়জনের বাইরে, তুমি, দীনবন্ধুবাবু আর অজিতেশবাবু জানেন তা আমার জানা। আর কেউ কি জানে?

—আমাদের তরফ থেকে কেউ নয়। ডাক্তার বাসু কি জানেন?

—না। তাহলে ইন-টোটাল আমরা নয় জন খবরটা জানি।

—না স্যার। 'নয়' নয়, 'বারো' জন।

—বাকি তিনজন কে কে?

—এক, বিশ্বনাথ পাল। দুই, বিকাশ সেন। তিন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

—শেষোক্ত জন আমার কাছে প্রতিশ্রুত, খবরটা তিনি গোপন রাখবেন। বিকাশ সেন যে কে তার পাত্তা পাইনি। সে যে ঠিকানা দিয়েছিল সেটা ভুয়ো। ঐ ঠিকানায় ঐ নামে কেউ কোনোদিন থাকে না বা ছিল না! আর বিশ্বনাথ পাল...

—বিশ্বনাথ পাল?

—একটা পাক্কা স্কাউনড্রেল!

—মানে?

নীহারবিন্দু অকপটে সব কথা জানালেন শ্যামলকে।

আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ল্ডে ওর নাম 'শিশুপাল'। এক নম্বর অ্যান্টিস্যোশাল! পুলিশের খাতায় তার নাম আছে। অনেকবার ধরা পড়েছে, কিন্তু প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি, স্মাগলিং, ওয়াগন ব্রেকার দলের মাথা—তার নানান গুণ! দু-দুটি খুনের চার্জ আছে ওর নামে; কিন্তু প্রমাণ নেই! বিশ্বনাথ পাল সত্যিই ভাল ছাত্র। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক—সে ঐ পথে গেছে। বর্তমানে কোথায় আছে তা জানা যায়নি। নীহারবিন্দু এ বিষয়ে জোরদার তদন্তও করে উঠতে পারছেন না—পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। অমন একটা এক-নম্বর অ্যান্টিস্যোশাল যে বড়-সাহেবের জামাই—এ খবরটা দুর্দান্ত রকমের মুখরোচক। কোনো ছিদ্র-পথে খবরটা প্রকাশ পেলে দাবানলের মতো গোটা পুলিশ বিভাগে ছড়িয়ে পড়বে। সেটা কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। এজন্যই শ্যামলকে ডেকে পাঠিয়েছেন নীহারবিন্দু। হয়তো এজন্যই তাকে উন্নীত করা হয়েছে কনস্টেব্‌ল থেকে সাব-ইন্‌সপেক্টার পদে। শীঘ্রই শ্যামলের থানাঅফিসার একটি কনফিডেনশিয়াল পত্র পাবেন—শ্যামল মাইতিকে দেওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ গোপন দায়িত্ব! অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি!

তার 'অ্যাসাইনমেন্ট'টা কী, তা জানতে পারবেন না এমনকী তার 'বস্‌'!

সে তার তদন্ত রিপোর্ট সরাসরি দাখিল করবে ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জকে।

তার টি. এ. বিল, এক্সপেন্স-ভাউচার ইত্যাদি মেটানো হবে ডি. আই. জি. সাহেবের দপ্তর থেকে।

শ্যামল সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে, শিশুপালের কোনো ফটো কি জোগাড় হয়েছে?

—হয়েছে। এই নাও!—ড্রয়ার খুলে একটা গ্রুপ ফটো বার করে দিলেন। তাতে একটি যুবকের মাথার উপর ক্রুশচিহ্ন দেওয়া।

—আর কোনো তথ্য, স্যার?

—হ্যাঁ, এই ফাইলটা রাখো। ওর পার্সোনাল-ফাইল। কোথায় কোন কেস-এ তাকে ধরা হয়েছিল, কী-কী এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছিল এবং তার বেকসুর-খালাস হওয়ার কোর্ট অর্ডার।

—তার মানে আপনি চান, এই বারো জনের বাইরে যেন কেউ না জানতে পারে যে, ঐ শিশুপালের বিরুদ্ধে আমাকে স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

—হ্যাঁ, তবে 'বারো' নয়, 'তেরো'!

—তেরো? ত্রয়োদশ ব্যক্তিটি কে?

—স্বয়ং ইন্‌সপেক্টর জেনারেল আমার বস্‌! তাঁকে না জানিয়ে আমি কিছু করতে পারি না।

—ঠিক আছে স্যার। তবে আমি কিন্তু দাদাকে...আই মিন দীনবন্ধু জানাকে সব কিছু জানাব। তাঁর সাহায্য ছাড়া...

—আই নো! আই নো! শোনো শ্যামল। একটা কথা বলি। বুঝতেই পারছ, বিশু পাল কেন এই চালটা চেলেছে! যাতে আমি তাকে ছুঁতে না পারি! ধরা পড়লেও আমি তাকে কাঠগড়ায় তুলতে সাহস পাব না—পারিবারিক প্রেস্টিজটা বাঁচাতে। এজন্য মনে হয়, সে নিজে থেকে খবরটা প্রচার করবে না। এটা তার তুরুপের টেক্কা!

শ্যামল হাত দুটি জোড় করে বলে, কিছু মনে করবেন না স্যার, প্রশ্নটার জবাব না জেনে আমি অগ্রসর হতে পারব না বলেই জানতে চাইছি, মানে এখন কি সুতপা...

—না! তুমি যে আশঙ্কা করছ তা ঠিক নয়। সুতপার মোহভঙ্গ হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, বিশু পাল তাকে নিয়ে খেলা করেছে শুধু। মেয়েটা এমনিতে বুদ্ধিমতী; কিন্তু কীভাবে যে তাকে সম্মোহিত করে...

—সুতপা কী বলছে? তার কোনো বান্ধবী কি ব্যাপারটা জানে?

—আমার কাছে স্বীকার করেনি। তার মায়ের কাছে, বা দিদির কাছেও নয়।

—ধরুন যদি কোনো শো-ডাউনের সময় ডাইরেক্ট অ্যাকশনে...।

নীহারবিন্দু তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। শ্যামল মাঝপথেই থেমে যায়।

নিপুণভাবে সিগারটা আবার ধরালেন উনি। বললেন, তুমিও যথেষ্ট বুদ্ধিমান শ্যামল। কাকে কোন প্রশ্ন করতে নেই তা তোমার জানা থাকা উচিত। আমি একজন ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন, একজন দায়িত্বশীল পুলিশ-অফিসার। এ-সব কথা আমার কাছে বলতে হয়?

—আয়াম সরি, স্যার।

নীহারবিন্দু তাঁর হিপ-পকেট থেকে একটা নোটের তাড়া বার করলেন। রাবার-ব্যান্ডে

জড়ানো একশো-টাকার একটা বান্ডিল। সেটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললেন, এসব কাজে অনেক রকম খরচ করতে হয়। যার ভাউচার থাকে না। যা 'আন্-আকাউন্টেব্‌ল্'—আমি জানি। ওটা তুলে নাও।

শ্যামল আপত্তি করে না। অম্লানবদনে নোটের বান্ডিলটা পকেটে ভরে নেয়।

'শিশুপাল বধের' কাহিনীটা আপাতত মুলতবি থাক। সেটা এসে পড়েছিল 'জরাসন্ধে'র চালচিত্র হিসাবে। শিশুপালের দৌলতেই নন্-ম্যাট্রিক শ্যামল মাইতি বিনা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় সাধারণ কনস্টেব্‌ল্ থেকে উন্নীত হয়েছিল সাব্-ইন্‌সপেক্টার পদে! ঐ 'শিশুপালবধ' সুসম্পন্ন করেই দ্বিতীয়বার বিনা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায়—শুধুমাত্র সুপারিশের জোরে : ইন্‌সপেক্টার! সে-সব কথা যথাসময়ে। আপাতত যে-কথা বলছিলাম।

জরাসন্ধের কথা।

অরুকে কথা দিয়ে গিয়েছিল ওর স্বপ্নলোকের রাজপুত্রের হাল-হদিশ নিয়ে সাত দিনের মধ্যেই তার কাছে ফিরে আসবে। তাই এসেছিল সে। পরের সপ্তাহে শ্যামল আবার এসে হাজির হল অরুর হস্টেলে। আজও সে ধড়া-চূড়ো-পরা পুলিশ ইন্‌সপেক্টার। মাজায় ঝুলছে সার্ভিস-রিভলভার। হস্টেল সুপারের অনুমতি নিয়ে ট্যাক্সি চেপে এল লেকের ধারে সেই পরিচিত কিনারে।

সন্ধ্যা তখনো ঘনিয়ে আসেনি। বায়ুসেবীরা ইতস্তত পদচারণরত। কেউ কেউ এসেছেন কুকুর নিয়ে। জোড়ায়-জোড়ায় বসে আছে তরুণ-তরুণীরা—যাদের ছাপোষা ঘরে নির্জনতার একান্ত অভাব। কেউ কেউ জগিং করছে।

শ্যামল সোজাসুজি নেমে এল কাজের কথায়! তুই কান ঘেঁষে বেঁচে গেছিস রে অরু। লোকটা টপ-টু-বটম্ জরাসন্ধ।

—জরাসন্ধ। মানে?

—মনে আছে 'শিশুপাল'কে?

—তা আর নেই। এখনো মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। কিন্তু তার সঙ্গে কুণালের কী সম্পর্ক?

—বিশুপাল যেমনভাবে অজগর সাপের মতো সুতপাকে জড়িয়েছিল—সে গল্প তো তোকে সবিস্তারে করেছি—এই জরাসন্ধও তেমনি তোকে গিলে খেতে চায়।

—ইম্‌পসিব্‌ল্। কুণাল সে রকম নয়।

—হুবহু সেই রকম রে অরু। তুই একটা অব্‌সেশনে ভুগছিস। ওর রূপে মুগ্ধ হয়েছিস। ঠিক যেভাবে সম্মোহিত হয়েছিল সুতপা বাঁড়ুজ্জে। ওদের ঐ একই ট্যাকটিক্স—আর তোরা জেনে-বুঝে ওদের ফাঁদে পা দিস। ...না, না, আমাকে বাধা দিস না। তোর ন'দাকে তুই তো চিনিস, অরু,—আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান করে এটা স্থির নিশ্চয় জেনেছি। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানোই ওর বিলাস। না, বিশুপালের মতো অ্যান্টিস্যোশাল নয়, কিন্তু অন্য দিক থেকে আরও বড় জাতের অ্যান্টিস্যোশাল।

রূপ আর রুপোর টোপ ফেলে একের পর এক মেয়েদের ও ফাঁসায়। ও ইচ্ছে করেই গা ঢাকা দিয়েছে। বর্তমানে একটা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে নিয়ে মেতেছে...

—হতেই পারে না। ও যে আমাকে কথা দিয়েছে যে,...

—এমন কথা সে অনেক-অনেক মেয়েকে দিয়েছে রে, অরু!

—কিন্তু ও যে আমাকে টি. ভি সেন্টারে নিয়ে গেছে অডিশান দিতে, আকাশবাণীতেও। তা ছাড়া বহরমপুরের একটা মিউজিক কনফারেন্সে...

—বহরমপুর। অত দূরে? ট্রেনে?

—না, গাড়িতে। আমরা পাঁচ-ছয় জন ছিলাম।

শ্যামল গম্ভীর হল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, এসব পাগলামি করিস না। ওসব ছেলে ভাল নয়। ওদের খপ্পরে পড়লে পস্তাতে হবে। সুতপার কেসটা শুনেই বুঝতে পারছিস না? তোদের হস্টেল-সুপার ঐ দলের সঙ্গে তোকে বহরমপুর যেতে দিলেন? একদিনের মধ্যে ফিরতে পারিসনি নিশ্চয়?

অরুন্ধতী জবাব দিল না। মুখ নিচু করে একটা চোরকাঁটার ডাঁটা চিবাতে থাকে।

—কী রে? জবাব দিচ্ছিস না যে? হস্টেল সুপারকে মিছে কথা বলেছিলি, তাই নয়? বলেছিলি, দুর্গাপুরে যাচ্ছিস মামার কাছে। বল সত্যি করে?

এবারও সে জবাব দিল না।

শ্যামল একটু ইতস্তত করে বললে, একটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করব? কিছু মনে করবি না তো?

—মনে করার মতো কথা না হলে মনে করব কেন?

—কিন্তু আমি যে 'মনে-করা'র মতো কথাই জানতে চাইছি রে অরু?

—কী?

—তুই কতটা ফেঁসেছিস সত্যি করে বল তো?

অরুন্ধতী গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

শ্যামল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝেছি। অনেক জল ঘোলা করে ফেলেছিস। কিন্তু আর নয়। আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্র থেকে খবর নিয়ে এসেছি। ওকে আর একদম পাত্তা দিবি না। ওর কথা স্রেফ ভুলে যা—

—তা যে এখন আর হবার নয়, ন'দা!

বলেই মুখটা লুকায়। দুহাঁটুর ফাঁকে।

—হবার নয়! কেন? ...কী হয়েছে? একী রে! তুই কাঁদছিস কেন?

অবরুদ্ধ কান্নার মধ্যে কোনোক্রমে অস্ফুটে শুধু বললে, আমার...আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে...

শ্যামল বজ্রাহত!

তবে সব রকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে। আশপাশে তাকিয়ে দেখল।

লোকজন খুব কাছে-পিঠে নেই। তা-হোক, যে-কোনো মুহূর্তে কারও নজরে পড়ে যেতে পারে। পুলিশের য়ুনিফর্ম-পরা একটি যুবকের এক্তিয়ারে একটি তরুণী লেকের ধারে বসে কাঁদছে। তার নানান রকম ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। অথচ এখন অরুকে কিছুটা কাঁদতে দিতে হবে, মনটা হালকা করতে।

বললে, এমন প্রকাশ্য স্থানে অমন করে কাঁদিস না অরু! লোকে কী ভাববে? আমি একটু পায়চারি করে আসি—কাছেই আছি, ভয় নেই—তুই ততক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নে—

শ্যামল একটু দূরে সরে গেল। নজরের বাইরে নয়। অরু যা বলছে তার একটাই ব্যাখ্যা! কিন্তু তাই কি? 'সর্বনাশ হয়ে যাওয়া' মানে কি ওর কুমারী মনে সেই ছেলেটার প্রতিচ্ছবি এমন চিরস্থায়ী ছাপ ফেলেছে যে, সে আর কাউকে জীবনে ভালবাসতে পারবে না, আর কারও কণ্ঠলগ্না হতে অশক্ত? অর্থটা যদি তাই হয় তবে ভাবনার কিছু নেই। মন-ক্যামেরায় অমন বহু ছবির আভাস পড়ে। ভাবালু কুমারী মনের 'শাটার' যখনই খোলে তখনই ফিল্‌মে পড়ে একটা ছাপ। ক্যামেরা ভাবে এটাই শাশ্বত! তারপর বিয়ের রাত্রে কনে-চন্দন পরে যখন মন-ক্যামেরার পিছনটা খোলে তখন আলো লেগে সব সাদা হয়ে যায়! কিন্তু তা যদি না হয়? 'সর্বনাশ হয়ে যাওয়া' বলতে সে যদি অন্য কিছু 'মিন' করে থাকে? কথাটা কীভাবে জেনে নেওয়া যায়? অরুকে সরাসরি প্রশ্ন করলে সে অফেন্স নেবে না তো? কিন্তু বাস্তব তথ্যটা যে তার জানা দরকার? কার মাধ্যমে জানবে? মামি? বড় বৌদি? নাঃ! আদৌ যদি কারও কাছে স্বীকার করে তবে সে তার ন'দার কাছেই মন উজাড় করে দেবে।

দুই প্যাকেট চিনেবাদাম কিনল। মিনিট-পাঁচেক আরও পায়চারি করল। তারপর পায়ে পায়ে ঘনিয়ে এসে বসল ওর পাশটিতে। দেখে অরুন্ধতী ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে নিজেকে। চোখ দুটি রাঙা জবার মতো; কিন্তু কাঁদছে না আর। ওর কোলের উপর চিনেবাদামের ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে বলে, নে খা!

নিজেই আর একটা ঠোঙা থেকে চিনেবাদাম ভেঙে চিবোতে থাকে। আড়চোখে দেখে অরু স্থির হয়ে বসে আছে। বাদাম খাচ্ছে না। বলে, তোর ঠোঙায় নুন-ঝাল আছে, দে—

অরু নিঃশব্দে ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরে।

শ্যামল সেটা হাত বাড়িয়ে নেয়। খোলে না। হঠাৎ বলে ওঠে, একটা কথা সত্যি করে বল দিকিন! আমি যা আশঙ্কা করছি, ব্যাপারটা কি তাই? তাই মিন, তুই চিঠিতে যে বিপদের কথা লিখেছিলি সেটা কি তোর শারীরিক?

অরুন্ধতী মাথাটা তুলতে পারে না। কিন্তু গ্রীবা সঞ্চালনে 'ইতিবাচক' জবাবটা জানায়।

আবার একটু ভেবে নিয়ে শ্যামল প্রশ্ন করে, দুর্ঘটনাটা কি ঘটেছিল বহরমপুরে?

আবার দু-হাঁটুর মধ্যে মুখটা লুকাল।

শ্যামল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এমন একটা ব্যাপারের বিষয়ে মেয়েরা বিস্তারিত কিছু বলতে চায় না। শ্যামল যেটাকে 'দুর্ঘটনা' বলছে, বাস্তবে যেটা 'দুর্ঘটনা' বই আর কিছু নয়—সেটা যে ঐ হতভাগিনীর কাছে একটা পরম 'সুখস্মৃতি'! সেটার আলোচনা যে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে করার নয়! তা একারও নয়—তা দুজনের। তৃতীয় জন সেখানে অবাঞ্ছিত—তা সে হোক না কেন অরুর ন'দা!

কিন্তু বাস্তব তথ্যটা যে জানা দরকার! সর্বনাশের পরিমাণটা! এবার সে অন্য ভাবে প্রশ্নটা পেশ করে, শালীনতা বজায় রেখে, তোর সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ কতদিন আগে? মাস চারেক?

—না। তিন মাস!

শ্যামল উঠে দাঁড়ায়। চিনেবাদামের ঠোঙা দুটো লেকের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, নে, ওঠ! ঘাবড়াস না। আমি তো আছি। ব্যবস্থা করে দেব।

—না।

—না? 'না' মানে?

—আমি তাতে রাজি নই।

শ্যামল থমকে গেল। বললে, কী? কিসে রাজি নস?

—সেটা তুমিও বুঝছ, আমিও বুঝছি।

—তাহলে তুই কী চাস?

শ্যামল আবার ধীরে ধীরে বসে পড়ে। একটা সিগ্রেট ধরায়। দুজনেই নির্বাক। পুরো সিগ্রেটটা ধ্বংস করতে করতে শ্যামল পরিস্থিতিটা তলিয়ে বুঝে নিল। দীনবন্ধু জানার ডান হাত সে। ক্ষুরধার বুদ্ধি। ইতিমধ্যে সে জেনে এসেছে ঐ ছেলেটা একটা পাক্কা স্কাউনড্রেল—শিশুপালের বড়দা জরাসন্ধ! কিন্তু অরুকে তা এখন বোঝানো যাবে না। সে একটা অবসেশনে ভুগছে। তার কুমারীমনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে একটা অজগর সাপ। রূপ আর রুপায়। 'সিডাকশান' যদি একটা বিজ্ঞান হত তাহলে ডন জুয়ান, রাসপুটিনের মতো কুণালও সেই অপরাবিদ্যায় একজন ডক্টরেট। তদন্ত করে যেটুকু জেনেছে, তাতে সন্ধান পেয়েছে, এভাবেই একের পর এক মেয়ে নিয়ে স্কাউনড্রেলটা খেলা করে। এই তার বিলাস। তাই ওদিক দিয়ে গেল না। বললে, তুই যদি তাই চাস, তবে তাই হবে। তোদের নির্জন সাক্ষাৎ করিয়ে দেব আমি—

—কেমন করে?

—'কেমন করে' তা এখনি কীভাবে বলি? ফন্দি-ফিকির করতে হবে কিছু। তুই তো নিজেই বলিস তোর ন'দার অসাধ্য কাজ নেই। কিন্তু কথা দে—কাউকে কিছু বলবি না?

অশ্রুআর্দ্র দুটি চোখ মেলে অরু বলেছিল, এ-কথা কি কাউকে বলার?

ম্লান হেসে শ্যামল বলেছিল, তাহলে আমাকে বললি কী করে?

—তোকে যে আমার সব, স—ব কথা বলা যায় রে, ন'দা!

শ্যামল আর আত্মসংবরণ করতে পারেনি। অরুর দুটি হাত নিজের মুঠিতে টেনে নিয়ে বলেছিল, এই কথাটা জীবনে ভুলিস না অরু! ন'দাকে তোর সব স—ব কথা বলা যায়।

বোকা মেয়েটা সেদিন বোঝেনি—শ্যামল 'শ্যামা' নাটকে 'উত্তীয়'-র ভূমিকায় অভিনয় করছিল তখন!

অরুকে বারণ করেছিল, কিন্তু নিজে সেটা মানতে পারেনি।

এতবড় একটা ব্যাপারে সে গোটা দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারেনি। যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। শিশুপালের ব্যাপারটা ছিল আলাদা—সেখানে দীনবন্ধু কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না; কিন্তু জরাসন্ধের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু ইনভল্‌ভ্‌ড্‌। যেহেতু এবার সর্বনাশ হতে বসেছে ওর বসের মেয়ের নয়, দীনবন্ধুর আদরের ভাগ্নির! অরুর!

দুর্গাপুরে ফিরে এসেই আদ্যোপান্ত সব কথা সে খুলে বলল তার দীনুদাকে।

দীনবন্ধু জানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। কোনো কিছুতেই তিনি উত্তেজিত হন না। এত বড় মর্মান্তিক সংবাদেও মনে হল না তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছেন। ওঁর মনের ভিতরটা শ্যামল দেখতে পায় না, আন্দাজ করে সেখানে সব কিছুই ঘটে—সুখের সংবাদে সে মনের আকাশে রামধনু ওঠে, দুঃখের আঘাতে নামে শ্রাবণের প্লাবন—কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ কখনো হতে দেখেনি। ইলেকশানে জেতার পর সবাই যখন তাঁকে কাঁধে তুলে নাচছিল তখনো তিনি হাসেননি; আবার আজকের এই মর্মান্তিক সংবাদেও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল না। সব কিছু শুনে বললেন, অরু অ্যাবর্শানে রাজি নয় বললি?

—আমাকে তো তাই বললে।

—হুঁ। তা হলে একমাত্র সমাধান সেই ছোকরার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলা!

—কিন্তু তা যে হবার নয় দীনুদা।

—হবার নয়? কেন? বাধা কোথায়?

—বাধা দু-তরফা। আমার যা ইনফরমেশন তা হচ্ছে কুণাল ছেলেটার এটা একটা হবি। ক্রমাগত নতুন-নতুন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা। বিয়ে সে করবে না, কাউকেই। মাত্র সাতদিনে আমি পাঁচটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি—যারা ইতিপূর্বে ওর প্রেমিকা ছিল। তার ভিতর একটি সুইসাইড করেছে। একটির শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে এখনো জানতে পারিনি। বাকি তিনটির মধ্যে দুটির বিয়ে হয়ে গেছে। আর একজন বিবাহিতাই ছিল ওর সঙ্গে প্রেম করার সময়। আমি ছেলেটিকে চোখে দেখিনি, শুনেছি অত্যন্ত সুদর্শন—'হি-ম্যান'। মেয়েরা নাকি ওকে দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়।

—বুঝলাম। কিন্তু তুই কেন বললি, 'বাধা দু-তরফা'?

—দুতরফা হল না? কুণাল অরুকে বিয়ে করতে রাজি হবে না—সে শুধু ওকে 'সিডিউস্‌' করতে চেয়েছিল, এনজয় করতে চেয়েছিল। ব্যস। অরু প্রাপ্তবয়স্কা। সে যদি স্বেচ্ছায়...তা ছাড়া আমরাও অমন একটা থার্ডক্লাস স্কাউনড্রেলের সঙ্গে অরুর বিয়ে দিতে

নিশ্চয়ই চাইব না।

—বিয়েটা তো আমরা করছি না, করছে অরু। তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি হাত দিতে পারি না। সে যদি অ্যাবর্শনে রাজি হত তাহলে নিশ্চয় ও পাপকে বিদায় করতাম; কিন্তু অরু যদি তাতে রাজি না হয়—আমি তো আমার পারিবারিক মর্যাদাটা না দেখে পারি না।

শ্যামল কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

দীনবন্ধু বলেন, তা ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে ছেলেটি সুপাত্র। সুদর্শন, লেখাপড়া জানা, রোজগেরে, বড়লোক বাপের একমাত্র সন্তান...

তা তো বটেই। শ্যামল নীরব থাকে।

—মুশকিল হচ্ছে—ছোকরাকে ফাঁদে ফেলতে হবে। ওকে এখানে নিয়ে আসা দরকার। কলকাতায় জুৎ হবে না। দুর্গাপুরের চৌহদ্দিতে যদি একবার তাকে এনে ফেলা যায়, তবে দেখে নিতাম সে কত বড় ডন জুয়ান।

শ্যামল বললে, সে-কথাও আমি ভেবে রেখেছি দীনুদা। ওকে কীভাবে এখানে নিয়ে আসা যায়। তোমার গণ্ডির ভিতর।

—কী করে?

—আমার যা প্ল্যান, তাতে তোমার ভূমিকা নাটকের প্রথম ও শেষ অঙ্কে। মাঝের অংশে আমার ভূমিকাটাই মুখ্য। শোনো! বেনাচিতির মোড় ছাড়িয়ে তোমার যে জমিটা আছে জি. টি. রোডের উপর, তার উপর তুমি একটা সিনেমাহাউস বানাতে চাইছ। জমির প্ল্যানটা নিয়ে তুমি গিয়ে দেখা করো 'চৌধুরী চক্রবর্তী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'-এর সিনিয়ার পার্টনার দয়ানন্দ চৌধুরীর সঙ্গে। প্ল্যান এস্টিমেট-ডিজাইন আর আর্কিটেকচারাল ডিটেইল্সের জন্য বিল্ডিং-কস্টের তিন থেকে চার পার্সেন্ট কমিশন দিতে রাজি হয়ো—বেশ একটু দরাদরি করে—মেশিং কস্ট, ইলেক্ট্রিকাল ইন্সটলেশন্স বা ফিক্স্চার্স বাদে। এসবই মৌখিক কিন্তু—লিখিত কোনো এগ্রিমেন্ট কোরো না। একটা টেলিফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে দয়ানন্দর সঙ্গে পার্সোনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে নিয়ো—যেন, জুনিয়ার পার্টনারকে তুমি চেনোই না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে গেলে দেখবে খুব সম্ভবত কুণালও থাকবে; কারণ দয়ানন্দ এখন বস্তুত স্লিপিং পার্টনার। বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কুণালই বলে। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গেলে তুমি সাজেস্ট করো কুণাল যেন একবার জমিটা দেখে যায়। জমিটা দেখে, একটা ফিনানশিয়াল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট খাড়া করে। তুমি বলো এখানকার আর পাঁচটা সিনেমাহলের হিসেব—কত টিকিট বিক্রি হয়, কেমন লাভ থাকে এসব স্ট্যাটিসটিক্স তুমি আগে ভাগে জোগাড় করে রাখবে। কুণাল এখানে তোমার গেস্ট হয়ে এক রাত থাকবে। তারপর সেই ইকনমিক্ প্রজেক্টটা বিচার করে তুমি এগ্রিমেন্টে সই করবে। যদি তুমি পিছিয়ে যাও তাহলে ঐ ফিনানশিয়াল প্রজেক্টটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য

—তোকে যে আমার সব, স—ব কথা বলা যায় রে, ন'দা!

শ্যামল আর আত্মসংবরণ করতে পারেনি। অরুর দুটি হাত নিজের মুঠিতে টেনে নিয়ে বলেছিল, এই কথাটা জীবনে ভুলিস না অরু! ন'দাকে তোর সব স—ব কথা বলা যায়।

বোকা মেয়েটা সেদিন বোঝেনি—শ্যামল 'শ্যামা' নাটকে 'উত্তীয়'-র ভূমিকায় অভিনয় করছিল তখন!

অরুকে বারণ করেছিল, কিন্তু নিজে সেটা মানতে পারেনি।

এতবড় একটা ব্যাপারে সে গোটা দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারেনি। যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। শিশুপালের ব্যাপারটা ছিল আলাদা—সেখানে দীনবন্ধু কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না; কিন্তু জরাসন্ধের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু ইনভল্‌ভ্‌ড্‌। যেহেতু এবার সর্বনাশ হতে বসেছে ওর বসের মেয়ের নয়, দীনবন্ধুর আদরের ভাগ্নির! অরুর!

দুর্গাপুরে ফিরে এসেই আদ্যোপান্ত সব কথা সে খুলে বলল তার দীনুদাকে।

দীনবন্ধু জানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। কোনো কিছুতেই তিনি উত্তেজিত হন না। এত বড় মর্মান্তিক সংবাদেও মনে হল না তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছেন। ওঁর মনের ভিতরটা শ্যামল দেখতে পায় না, আন্দাজ করে সেখানে সব কিছুই ঘটে—সুখের সংবাদে সে মনের আকাশে রামধনু ওঠে, দুঃখের আঘাতে নামে শ্রাবণের প্লাবন—কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ কখনো হতে দেখেনি। ইলেকশানে জেতার পর সবাই যখন তাঁকে কাঁধে তুলে নাচছিল তখনো তিনি হাসেননি; আবার আজকের এই মর্মান্তিক সংবাদেও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল না। সব কিছু শুনে বললেন, অরু অ্যাবর্শানে রাজি নয় বললি?

—আমাকে তো তাই বললে।

—হুঁ। তা হলে একমাত্র সমাধান সেই ছোকরার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলা!

—কিন্তু তা যে হবার নয় দীনুদা।

—হবার নয়? কেন? বাধা কোথায়?

—বাধা দু-তরফা। আমার যা ইনফরমেশন তা হচ্ছে কুণাল ছেলেটার এটা একটা হবি। ক্রমাগত নতুন-নতুন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা। বিয়ে সে করবে না, কাউকেই। মাত্র সাতদিনে আমি পাঁচটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি—যারা ইতিপূর্বে ওর প্রেমিকা ছিল। তার ভিতর একটি সুইসাইড করেছে। একটির শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে এখনো জানতে পারিনি। বাকি তিনটির মধ্যে দুটির বিয়ে হয়ে গেছে। আর একজন বিবাহিতাই ছিল ওর সঙ্গে প্রেম করার সময়। আমি ছেলেটিকে চোখে দেখিনি, শুনেছি অত্যন্ত সুদর্শন—'হি-ম্যান'। মেয়েরা নাকি ওকে দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়।

—বুঝলাম। কিন্তু তুই কেন বললি, 'বাধা দু-তরফা'?

—দুতরফা হল না? কুণাল অরুকে বিয়ে করতে রাজি হবে না—সে শুধু ওকে 'সিডিউস্‌' করতে চেয়েছিল, এনজয় করতে চেয়েছিল। ব্যস। অরু প্রাপ্তবয়স্কা। সে যদি স্বেচ্ছায়...তা ছাড়া আমরাও অমন একটা থার্ডক্লাস স্কাউনড্রেলের সঙ্গে অরুর বিয়ে দিতে

নিশ্চয়ই চাইব না।

—বিয়েটা তো আমরা করছি না, করছে অরু। তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি হাত দিতে পারি না। সে যদি অ্যাবর্শনে রাজি হত তাহলে নিশ্চয় ও পাপকে বিদায় করতাম; কিন্তু অরু যদি তাতে রাজি না হয়—আমি তো আমার পারিবারিক মর্যাদাটা না দেখে পারি না।

শ্যামল কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

দীনবন্ধু বলেন, তা ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে ছেলেটি সুপাত্র। সুদর্শন, লেখাপড়া জানা, রোজগেরে, বড়লোক বাপের একমাত্র সন্তান...

তা তো বটেই। শ্যামল নীরব থাকে।

—মুশকিল হচ্ছে—ছোকরাকে ফাঁদে ফেলতে হবে। ওকে এখানে নিয়ে আসা দরকার। কলকাতায় জুৎ হবে না। দুর্গাপুরের চৌহদ্দিতে যদি একবার তাকে এনে ফেলা যায়, তবে দেখে নিতাম সে কত বড় ডন জুয়ান।

শ্যামল বললে, সে-কথাও আমি ভেবে রেখেছি দীনুদা। ওকে কীভাবে এখানে নিয়ে আসা যায়। তোমার গণ্ডির ভিতর।

—কী করে?

—আমার যা প্ল্যান, তাতে তোমার ভূমিকা নাটকের প্রথম ও শেষ অঙ্কে। মাঝের অংশে আমার ভূমিকাটাই মুখ্য। শোনো! বেনাচিতির মোড় ছাড়িয়ে তোমার যে জমিটা আছে জি. টি. রোডের উপর, তার উপর তুমি একটা সিনেমাহাউস বানাতে চাইছ। জমির প্ল্যানটা নিয়ে তুমি গিয়ে দেখা করো 'চৌধুরী চক্রবর্তী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'-এর সিনিয়ার পার্টনার দয়ানন্দ চৌধুরীর সঙ্গে। প্ল্যান এস্টিমেট-ডিজাইন আর আর্কিটেকচারাল ডিটেইল্‌সের জন্য বিল্ডিং-কস্টের তিন থেকে চার পার্সেন্ট কমিশন দিতে রাজি হয়ো—বেশ একটু দরাদরি করে—মেশিং কস্ট, ইলেক্‌ট্রিকাল ইন্‌সটলেশন্স বা ফিক্‌স্‌চার্স বাদে। এসবই মৌখিক কিন্তু—লিখিত কোনো এগ্রিমেন্ট কোরো না। একটা টেলিফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে দয়ানন্দর সঙ্গে পার্সোনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে নিয়ো—যেন, জুনিয়ার পার্টনারকে তুমি চেনোই না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে গেলে দেখবে খুব সম্ভবত কুণালও থাকবে; কারণ দয়ানন্দ এখন বস্তুত স্লিপিং পার্টনার। বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কুণালই বলে। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গেলে তুমি সাজেস্ট করো কুণাল যেন একবার জমিটা দেখে যায়। জমিটা দেখে, একটা ফিনানশিয়াল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট খাড়া করে। তুমি বলো এখানকার আর পাঁচটা সিনেমাহলের হিসেব—কত টিকিট বিক্রি হয়, কেমন লাভ থাকে এসব স্ট্যাটিসটিক্স তুমি আগে ভাগে জোগাড় করে রাখবে। কুণাল এখানে তোমার গেস্ট হয়ে এক রাত থাকবে। তারপর সেই ইকনমিক্ প্রজেক্টটা বিচার করে তুমি এগ্রিমেন্টে সই করবে। যদি তুমি পিছিয়ে যাও তাহলে ঐ ফিনানশিয়াল প্রজেক্টটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য

আর্কিটেক্টস্ ফার্মকে পৃথকভাবে পেমেন্ট করবে। এতে ওঁরা নিশ্চয়ই রাজি হবেন।

দীনবন্ধু বললেন, বুদ্ধিটা তুই ভালই করেছিস্। কিন্তু তারপর?

—ঐ সময় অরুকেও আমি নিয়ে আসব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা...

পরিকল্পনাটা অনুমোদন করলেন দীনবন্ধু।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন থাকল, এমনকী স্ত্রীকেও কিছু জানালেন না। মন্ত্রগুপ্তি দীনবন্ধুর মজ্জায়-মজ্জায়। বাড়ির সকলে জানল, দীনবন্ধু সত্যিই এবার একটা সিনেমা-হল বানাতে চাইছেন।

প্রস্তাবমতো দীনবন্ধু গিয়ে কলকাতায় দয়ানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এলেন।

কুণাল সরেজমিনে জমিটা দেখতে আসতে রাজি হল। তবে জানাল যে সে এখানে রাত্রিবাস করবে না। সকালের ট্রেনে এসে জমিটা দেখে, অন্যান্য সিনেমাহলের মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাবে। ফিনানশিয়াল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট সে কলকাতার অফিসে বসে তৈরি করবে। অগত্যা তাই।

কুণাল এল। দীনবন্ধু গাড়ি নিয়ে তাকে স্টেশানে রিসিভ করলেন। শ্যামল আড়ালে রইল। জমিটা দেখে কুণাল খর-মধ্যাহ্নে ফিরে এল আর্যভট্ট রোডে। অবাক কাণ্ড, বিকালের দিকে সে বলল—শরীরটা খারাপ, রাতটা থেকে যাওয়াই ভাল। দীনবন্ধু খুব খুশি। বললেন, সারাটা দিন ধকল গেছে, একটা রাত টানা ঘুম দিন। কালকেই শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।

কুণাল বললে, আমারও তাই মনে হয়, আসলে প্রচণ্ড মাথা ধরেছে আমার।

সেটা আসল কারণ নয়! মিথ্যা কথা বলেছিল কুণাল। আসল কারণ দীনবন্ধুর বাড়িতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে। সেঁই পরিবেশন করছিল। কুণাল অবাক হয়ে বলে ফেলেছিল, কী ব্যাপার! তুমি এখানে?

দীনবন্ধুও অবাক হয়ে বলেন, খুকিকে চেনেন নাকি?

কুণাল চট করে নিজেকে সামলে নেয়। বলে, হ্যাঁ। একটা মিউজিক কনফারেন্সে ওঁর গান শুনেছি। দারুণ গলা।

দীনবন্ধু বলেন, ও আমার বোনঝি। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে।

কুণাল বলেছিল, তাহলে আজ সন্ধ্যায় দু-একটা গান শুনব কিন্তু।

মেয়েটি সলজ্জে বলেছিল, সন্ধ্যার ট্রেনে তো আপনি ফিরে যাবেন।

—গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি পেলে একটা রাত থেকেও যেতে পারি।

এ ঘটনা দ্বিপ্রহরের। খাবার টেবিলে। অপরাহ্নে যখন মাথাধরার অজুহাতে ও যাত্রা স্থগিত রাখল তখন গান-শোনানোর প্রশ্ন আর ওঠেনি। যে লোকটা মাথা ধরার যন্ত্রণায় বিশ্রাম নিচ্ছে তার পক্ষে গান শোনার প্রশ্ন ওঠে না।

গেস্ট-রুমটা ড্রইংরুমের সংলগ্ন। একটা স্তিমিত সবুজ আলো জ্বেলে ঘুমের ভান করে অপেক্ষা করছিল কাগজের টুকরোটা বালিশের নীচে নিয়ে। কুণালের দৃঢ় বিশ্বাস

ও বুঝতে পেরেছে, কেন হঠাৎ কুণালের এমন মাথা ধরেছে। কেন সে রাতটা থেকে গেল। সুযোগ মতো একবার সে আসবেই। মাস-তিনেক দেখা নেই, কুণাল ইতিমধ্যে মেতেছিল একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে নিয়ে। কমার্শিয়াল ফার্মের স্টেনো-টাইপিস্ট। পাঁকাল-মাছের মতো মেয়েটা ক্রমাগত পিছলে যাচ্ছে। তাতেই ঐ শ্যামলা-রঙের সুকণ্ঠর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে উঠতে পারেনি; যদিচ তার কাছ থেকে খান-কতক আর্জেন্ট-মার্কা আক্রমণ পেয়েছে গত তিন-চার সপ্তাহে। ও যে দীনবন্ধু জানার ভাগনি, এ তথ্যটা জানা ছিল না অবশ্য।

কুণালের আন্দাজ অমূলক নয়। সন্ধ্যার পর সে এল। দরজাটা খোলাই ছিল। 'নক' করে ঢোকেনি। ঘরে স্তিমিত একটা সবুজ আলো। দ্বারপথে দাঁড়িয়েই বললে, চা খাবেন আর এক কাপ?

কুণাল লক্ষ করে সে একা। চট করে উঠে বসে। কিন্তু নজর হল—ওর তর্জনীটা ঠোঁটের উপর। অর্থাৎ আশে-পাশেই লোকজন আছে! নির্লিপ্তভাবে বললে, শুধু চা কিন্তু—

—আমি জানতাম। নিয়েই এসেছি। নিন ধরুন।

এগিয়ে আসে কয়েক পা। যথেষ্ট দূরত্ব রেখেই বাড়িয়ে ধরে চায়ের কাপটা। পাশের ড্রইংরুমে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। সেখানে নিশ্চয়ই কেউ আছে, তা ছাড়া দরজাটা খোলা। কুণাল বালিশের তলা থেকে চিরকুটটা টেনে নিয়ে গুঁজে দেয় ওর হাতে, কাপটা নেবার অবকাশে। এমন একটা আশা বোধহয় ছিলই ওর—বিস্মিত হল না আদৌ। কাগজের টুকরোটা চট করে গুঁজে দিল বুকের উপত্যকায়।

খালি চায়ের কাপটা একটু পরে এসে নিয়ে গেল গৃহভৃত্য। নৈশাহারের অবকাশে মেয়েটিকে দেখা গেল না। কুণাল প্রশ্নও করল না সে বিষয়ে। দীনবন্ধুর স্ত্রী ওদের আহার্য পরিবেশন করলেন। মাথা ধরেছে বলে নয়, যদিও সেই অজুহাতেই কুণাল অল্প আহার করল। বাস্তবে দ্বিপ্রহরে ভোজনটা গুরুতর হয়েছিল।

ক্রমে গভীর হয়ে এল রাত। একে একে নিবে গেল গোটা বাড়ির আলো—শুধু বাগানে জ্বলছে একটা বাল্ব। ওটা বোধহয় সারারাতই জ্বলে। নিশিকুটুম্বদের বিতাড়নমানসে! কিন্তু তস্কর চূড়ামণি যখন বিশিষ্ট অতিথি? যখন সে ঘরের ভিতরেই?—ভাবে কুণাল। বাগানের ঐ আলোর একটা আবছা ছোঁয়ায় গেস্ট-রুমটা আলো-আঁধারী। ঘুমের ব্যাঘাত তাতে হবার কথা নয়, যদিও মানুষজন ঠিক চেনা যায় না। না যাক—মনে মনে বলে কুণাল—তার প্রত্যাশিতা নায়িকা আহামরি রূপসীও কিছু নয়। তা চোখ মেলে দেখার নয়, অনুভবের!

চিরকুটের নির্দেশ মতো ঠিক সওয়া বারোটার সময়েই এল সে।

দরজাটা ভেজানো ছিল শুধু। নিঃশব্দে পাল্লাটা খুলল, বন্ধ হল। আলো-আঁধারীতে চোখটা সয়ে গেছে, স্পষ্ট বুঝতে পারল—ঘরে ঢুকেই সাবধানী অভিসারিকা পিছন ফিরে টাওয়ার বোল্টটা তুলে দিল। এগিয়ে এল এক পা।

কুণাল লাফ দিয়ে উঠে পড়ল খাট থেকে। শব্দ হল না একটুও। এগিয়ে গেল ওর দিকে। সবলে আলিঙ্গনপাশে জড়িয়ে ধরল ওকে। মেয়েটি যেন নেতিয়ে পড়ল ওর বাহুপাশে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মুখটা। না প্রতিদান, না প্রতিবাদ! যেন এই ঘরের ভিতর এসে পৌঁছতেই ওর সর্বশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কুণাল ওর বাহুমূল ধরে বসিয়ে দিল খাটে। ব্লাউজের বোতামে হাত দিতেই মেয়েটি চেপে ধরল ওর হাত। বললে, অত ব্যস্ত কেন? আগে বলো, আমার একটা চিঠিরও জবাব দিলে না কেন?

—চিঠি! কই আমি তো কোনো চিঠি পাইনি তোমার!

—মিছে কথা বোলো না। তিন-তিনখানা চিঠি দিয়েছি আমি।

—ঠিকানা ভুল লিখেছ নিশ্চয়ই। কোন ঠিকানায় লিখেছিলে?

—ভুল ঠিকানা হতেই পারে না। আচ্ছা, তোমাদের টেলিফোন অপারেটর মেয়েটা অমন কেন বলো তো? যখনই ফোন করে জানতে চাই তুমি আছ কিনা, ও প্রতিপ্রশ্ন করে 'আপনি কে কথা বলছেন?'

—সেটাই নিয়ম। নিয়মটা আমি করিনি। আমাদের সিনিয়ার পার্টনার প্রবর্তন করেছেন, যাতে হঠাৎ লাইনটা কেটে গেলেও জানা যায়, ফোনটা কে করেছিল। তুমি বুঝি আমাকে অফিসে ফোনও করেছিলে ইতিমধ্যে?

—সাত আটবার। যখনই ফোন করি, শুনি তুমি ট্যুরে আছ!

কুণাল বলল না, তারই নির্দেশে টেলিফোন-অপারেটর ঐ কথা জানিয়েছে। বরং বললে, গত মাস-তিনেক খুব ঘোরাঘুরি গেছে।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতেই অভ্যস্ত আঙুলে সব কয়টা বোতাম খুলে ফেলেছে সে। ব্রা-তে হাত দিতেই আবার বাধা ছিল। বলল, যে কারণে বার বার চিঠি লিখেছিলাম সে কথাই বলি আগে, শোনো...আমার দারুণ ভয় করছে...জানো? ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড হয়েছে...

—তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে বুঝি? ছুতো-নাতায় ভেঙে দাও...

—না। তা নয়...গত তিন-মাস আমার...

—গত তিনমাস তোমার...আই সি! না, না, সেসব কিছু হয়নি।

—কিন্তু যদি হয়ে থাকে?

মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল! নেকি! এতটা বয়স হল, প্রিকশান তো তুমিই নেবে! তবে এ জাতীয় দুঃসংবাদ সে ইতিপূর্বেও শুনেছে। সমাধানের পথও জানে। বললে, তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মাত্র দু-তিনমাস তো? এখন 'ওরাল-মেডিসিন'ই যথেষ্ট...

এবার ও দৃঢ়স্বরে বললে, না। তাতে আমি রাজি নই।

—তার মানে? রাজি নও, মানে?

—তুমি অ্যাবর্শানের কথা বলছ তো? আমি তাতে রাজি নই।

—ছেলেমানুষী কোরো না অরু। এ ছাড়া আর কী পথ খোলা আছে?

—তুমি তা জানো। বিয়েটাকে আর পিছনো চলবে না। বাচ্চাটাকে লিগালাইজ করতে হলে এখনি তুমি মামার কাছে প্রস্তাবটা তোলো—

—সেটা অসম্ভব অরু। আমার বাবা ভীষণ কন্‌জারভেটিভ। অব্রাহ্মণ কোনো মেয়েকে—

—এটা কী বলছ কুণাল? কই এ-কথা তো সেদিন বলোনি, কোনোদিনই বলোনি—

—হয়তো বলিনি। কিন্তু তা হতে পারবে না!

—শুধু 'বলোনি' নয়, উলটো কথাটাই বলেছিলে—

—কী উলটো কথা?

—তুমি বলেছিলে, বাবার মতামতকে তুমি থোড়াই কেয়ার করো। বলোনি? তুমি চাকরি করছ, উপার্জন করছ—এখন তোমার ইচ্ছাই তাঁকে মেনে নিতে হবে—এসব কথা বলোনি?

কুণাল জবাব দিতে পারে না। এমন বিশ্রী ঝামেলায় পড়ে যাবে জানলে রাতটা থেকে যাবার হাঙ্গামায় যেত না আদৌ। অরুন্ধতী কিন্তু থামতে পারে না। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, কী? চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও! বলোনি?

—আস্তে! সবাই উঠে পড়বে!

—পড়ুক। সবাই জানুক। আই কেয়ার এ ফিগ্। ইন ফ্যাক্ট, তুমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক এ-কথা জানানোর পরেই তো আমি...

—কী তুমি?

—ন্যাকামি কোরো না। যেন বুঝতে পারছ না কিছু!

কুণাল ধীরে সুস্থে বলে, তোমার হয়তো ঠিক মনে পড়ছে না অরুন্ধতী। কিন্তু আমি একাই সে রাতে মজা লুটিনি, য়ু এনজয়েড দ্য অর্গাজম্ অ্যাজ ওয়েল!

—ওটা আমার কথার জবাব নয়। তুমি বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলে কি না?

কুণাল ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছে। বলে, দায়িত্ব তো অস্বীকার করছি না আমি। বলছি তো, আ'ল সল্‌ভ্ য়োর প্রব্লেম!

অরুন্ধতী ওর একটা হাত চেপে ধরে। বলে, তুমি ক্রমাগত কথা ঘোরাচ্ছ, কুণাল। বলো, তুমি ম্যারেজ-প্রোপোজাল দিয়েছিলে কিনা। বলো, আমি তা অ্যাকসেপ্ট করার পরেই আমরা দুজন...

ওর কথার মাঝখানেই কুণাল বলে ওঠে, আই কান্ট ম্যারি অল দ্যা গার্লস্ আই হ্যাপ্‌ন্ টু স্লিপ উইথ।

অরুন্ধতী আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসে ওর গালে।

কুণাল লাফ দিয়ে উঠে পড়ল খাট থেকে। শব্দ হল না একটুও। এগিয়ে গেল ওর দিকে। সবলে আলিঙ্গনপাশে জড়িয়ে ধরল ওকে। মেয়েটি যেন নেতিয়ে পড়ল ওর বাহুপাশে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মুখটা। না প্রতিদান, না প্রতিবাদ! যেন এই ঘরের ভিতর এসে পৌঁছতেই ওর সর্বশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কুণাল ওর বাহুমূল ধরে বসিয়ে দিল খাটে। ব্লাউজের বোতামে হাত দিতেই মেয়েটি চেপে ধরল ওর হাত। বললে, অত ব্যস্ত কেন? আগে বলো, আমার একটা চিঠিরও জবাব দিলে না কেন?

—চিঠি! কই আমি তো কোনো চিঠি পাইনি তোমার!

—মিছে কথা বোলো না। তিন-তিনখানা চিঠি দিয়েছি আমি।

—ঠিকানা ভুল লিখেছ নিশ্চয়ই। কোন ঠিকানায় লিখেছিলে?

—ভুল ঠিকানা হতেই পারে না। আচ্ছা, তোমাদের টেলিফোন অপারেটর মেয়েটা অমন কেন বলো তো? যখনই ফোন করে জানতে চাই তুমি আছ কিনা, ও প্রতিপ্রশ্ন করে 'আপনি কে কথা বলছেন?'

—সেটাই নিয়ম। নিয়মটা আমি করিনি। আমাদের সিনিয়ার পার্টনার প্রবর্তন করেছেন, যাতে হঠাৎ লাইনটা কেটে গেলেও জানা যায়, ফোনটা কে করেছিল। তুমি বুঝি আমাকে অফিসে ফোনও করেছিলে ইতিমধ্যে?

—সাত আটবার। যখনই ফোন করি, শুনি তুমি ট্যুরে আছ!

কুণাল বলল না, তারই নির্দেশে টেলিফোন-অপারেটর ঐ কথা জানিয়েছে। বরং বললে, গত মাস-তিনেক খুব ঘোরাঘুরি গেছে।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতেই অভ্যস্ত আঙুলে সব কয়টা বোতাম খুলে ফেলেছে সে। ব্রা-তে হাত দিতেই আবার বাধা ছিল। বলল, যে কারণে বার বার চিঠি লিখেছিলাম সে কথাই বলি আগে, শোনো...আমার দারুণ ভয় করছে...জানো? ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড হয়েছে...

—তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে বুঝি? ছুতো-নাতায় ভেঙে দাও...

—না। তা নয়...গত তিন-মাস আমার...

—গত তিনমাস তোমার...আই সি! না, না, সেসব কিছু হয়নি।

—কিন্তু যদি হয়ে থাকে?

মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল! নেকি! এতটা বয়স হল, প্রিকশান তো তুমিই নেবে! তবে এ জাতীয় দুঃসংবাদ সে ইতিপূর্বেও শুনেছে। সমাধানের পথও জানে। বললে, তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মাত্র দু-তিনমাস তো? এখন 'ওরাল-মেডিসিন'ই যথেষ্ট...

এবার ও দৃঢ়স্বরে বললে, না। তাতে আমি রাজি নই।

—তার মানে? রাজি নও, মানে?

—তুমি অ্যাবর্শানের কথা বলছ তো? আমি তাতে রাজি নই।

—ছেলেমানুষী কোরো না অরু। এ ছাড়া আর কী পথ খোলা আছে?

—তুমি তা জানো। বিয়েটাকে আর পিছনো চলবে না। বাচ্চাটাকে লিগালাইজ করতে হলে এখনি তুমি মামার কাছে প্রস্তাবটা তোলো—

—সেটা অসম্ভব অরু। আমার বাবা ভীষণ কন্জারভেটিভ। অব্রাহ্মণ কোনো মেয়েকে—

—এটা কী বলছ কুণাল? কই এ-কথা তো সেদিন বলোনি, কোনোদিনই বলোনি—

—হয়তো বলিনি। কিন্তু তা হতে পারবে না!

—শুধু 'বলোনি' নয়, উলটো কথাটাই বলেছিলে—

—কী উলটো কথা?

—তুমি বলেছিলে, বাবার মতামতকে তুমি থোড়াই কেয়ার করো। বলোনি? তুমি চাকরি করছ, উপার্জন করছ—এখন তোমার ইচ্ছাই তাঁকে মেনে নিতে হবে—এসব কথা বলোনি?

কুণাল জবাব দিতে পারে না। এমন বিশ্রী ঝামেলায় পড়ে যাবে জানলে রাতটা থেকে যাবার হাঙ্গামায় যেত না আদৌ। অরুন্ধতী কিন্তু থামতে পারে না। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, কী? চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও! বলোনি?

—আস্তে! সবাই উঠে পড়বে!

—পড়ুক। সবাই জানুক। আই কেয়ার এ ফিগ্। ইন ফ্যাক্ট, তুমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক এ-কথা জানানোর পরেই তো আমি...

—কী তুমি?

—ন্যাকামি কোরো না। যেন বুঝতে পারছ না কিছু!

কুণাল ধীরে সুস্থে বলে, তোমার হয়তো ঠিক মনে পড়ছে না অরুন্ধতী। কিন্তু আমি একাই সে রাতে মজা লুটিনি, য়ু এনজয়েড দ্য অর্গাজম্ অ্যাজ ওয়েল!

—ওটা আমার কথার জবাব নয়। তুমি বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলে কি না?

কুণাল ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছে। বলে, দায়িত্ব তো অস্বীকার করছি না আমি। বলছি তো, আ'ল সল্ভ্ য়োর প্রব্লেম!

অরুন্ধতী ওর একটা হাত চেপে ধরে। বলে, তুমি ক্রমাগত কথা ঘোরাচ্ছ, কুণাল। বলো, তুমি ম্যারেজ-প্রোপোজাল দিয়েছিলে কিনা। বলো, আমি তা অ্যাকসেপ্ট করার পরেই আমরা দুজন...

ওর কথার মাঝখানেই কুণাল বলে ওঠে, আই কান্ট ম্যারি অল দ্যা গার্লস্ আই হ্যাপ্ন্ টু স্লিপ উইথ।

অরুন্ধতী আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসে ওর গালে।

কুণালও খেপে যায় যেন। সজোরে ওর বাহুমূল চেপে ধরে চিত করে শুইয়ে দেয় ওকে...

ঠিক তখনই খণ্ড-মুহূর্তের জন্য আলোয়-আলো হয়ে গেল ঘরটা।

ব্যাপারটা কী ঘটল বুঝে উঠতে পারে না। প্রচণ্ড আলোর ক্ষণিক ঝলকানিতে সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে যেন। নিজের অজান্তেই ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটার বাহুমূল। সে শুয়ে আছে, না উঠে বসেছে, জানে না। ও নিজে বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে আছে ঘনান্ধকারে। ঠিক তখনই শুনতে পেল ঘরের ও-প্রান্ত থেকে অন্ধকারে কে-যেন বলে ওঠে, জামা-কাপড় সামলে নিয়েছিস তো অরু? আমি আলোটা জ্বালছি কিন্তু!

আরও দশ-সেকেন্ড পরে জ্বলে উঠল বিজলি বাতি। ঘরের বিপরীত দিকে ছিল আর একটি দরজা। পর্দা ফেলা। দেখা গেল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন। প্রায় কুণালেরই বয়সী। স্বাস্থ্যবান চেহারা, শ্যামলা রঙ। তার এক হাতে একটা অ্যাটাচিকেস, অপর হাতে ক্যামেরা আর ফ্লাশ-গান! ধীরে সুস্থে সে এগিয়ে এল সামনে। বসল একটা চেয়ারে। অরুন্ধতী তখনো দেওয়ালের দিকে মুখ করে ব্লাউসের বোতামগুলো আঁটছে।

জিনিসপত্র টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। চোখ তুলে চাইছে না সে। অরুন্ধতীর দিকে একবারও তাকায়নি। কুণাল ততক্ষণে ধীরে ধীরে বসে পড়েছে খাটের ওপর। দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছে বালিশটাকে—অহেতুক। লোকটা বললে, সবার আগে আমার পরিচয়টা দেওয়া দরকার। নাম যাই হোক, আমি বেনাচিতি পুলিশ স্টেশনে পোস্টেড। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আছি—অফ-ডিউটি বলে। আমি একজন ইন্‌সপেক্টর। মাঝ রাতে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কাল সকালে কথা হবে। এসো অরু—

অরুন্ধতী ততক্ষণে বেশবাস সামলে ভদ্রস্থ হয়েছে। বললে, তুমি...তুমি কোথা থেকে এলে?

—বললাম তো এখনি। মাঝরাতে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সবাই জেগে উঠবে। সেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। কথা হবে, আজ নয়, কাল। আয়—

অরুন্ধতীর বাহুমূল ধরে এগিয়ে যায় দ্বারের দিকে। হঠাৎ কী মনে করে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, বাই দ্য ওয়ে মিস্টার চক্রবর্তী, আপনি কি জানেন—আপনার ঐ কথাটা আদৌ 'অরিজিনাল ডায়ালগ' নয়? ওটা একটা কোটেশান। ভার্বাটিম্!

কুণাল এতক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে নিজেকে। বলে, কোন কথাটা?

'—আই কান্ট ম্যারি অল দ্য গার্লস্ আই হ্যাপ্‌ন্ টু স্লিপ উইথ!'?

কুণাল নির্বাক! জবাব দেয় অরুন্ধতীই। বলে, প্লিজ ন'দা! এটাকে ভাল্‌গার করে তুলিস না।

—না রে অরু! কিন্তু কথাটা আজ রাত্রেই বলে নেওয়া ভাল! তুই জানিস না—

কিন্তু তুই আজ রাত্রে আমাদের দুজনেরই প্রাণ দিয়েছিস্! ঐ ডায়ালগটা আহুজার! বিখ্যাত 'নানাবতী কেস'-এর। ঠিক সময়ে তুই চড়টা না কষালে এ ঘরে এতক্ষণে মিস্টার চক্রবর্তীর লাশটা পড়ে থাকার কথা, আর আমি ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেসের আসামি!

পাঞ্জাবির পাশ-পকেট থেকে লোডেড্ সার্ভিস রিভলভারটা বার করে দেখায়।

কুণালকে বলে, অহেতুক পালাবার চেষ্টা করবেন না। দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকবে। জানলার গ্রিলগুলোও মজবুত। কাল সকালে ফয়সালা হবে! গুড-নাইট!

পরদিন সাত সকালে বন্দির সঙ্গে দেখা করতে এলেন দীনবন্ধু জানা। সঙ্গে সেই ছেলেটি। কী যেন নাম? হ্যাঁ, শ্যামল। অরুন্ধতী অনুপস্থিত। বাড়ির আর সবাই শয্যা ত্যাগ করেছে কিনা বোঝা গেল না। ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দীনবন্ধু বসলেন ওর মুখোমুখি। শ্যামল বসল না! দাঁড়িয়ে রইল দ্বারের পাশে। তার হাতে একটা কালো-রঙের অ্যাটাচি-কেস। সরাসরি কাজের কথায় এলেন দীনবন্ধু। কোনো তিরস্কার, ভর্ৎসনা বা উত্তেজক কোনো কিছুর ধার দিয়েও গেলেন না। সেটা ওঁর ধাতে নেই। বললেন, ব্যাপারটা আমরা চারজন ছাড়া এখনো আর কেউ জানে না। আমার স্ত্রীও জানেন না। এবার বলুন, আপনি কী স্থির করলেন?

সারাটা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি। কী প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে পড়ে গেল হঠাৎ। অরুন্ধতী এমন ডবল্-ক্রসিং করতে পারে তা তো ও স্বপ্নেও ভাবেনি। সে অবশ্য শ্যামলকে বলেছিল, 'তুমি...তুমি, কোথা থেকে এলে?'—কিন্তু সেটা কি ওর অভিনয়? এত নিখুঁত? এই পুলিশ-ইন্‌সপেক্টার কেমন করে জানবে রাত সওয়া-বারোটায় অরুন্ধতী এঘরে আসবে? কেমন করে ফ্লাশগান আর ক্যামেরা নিয়ে এভাবে প্রতীক্ষা করবে রুদ্ধকক্ষের পর্দার ওপাশে? অরুন্ধতীই ওকে ফাঁসিয়েছে! ট্রেচারাস ভাইপার।

—কী হল? জবাব দিন। কী স্থির করলেন আপনি?

কুণাল গলাটা সাফ করে কোনোক্রমে বললে, বিশ্বাস করুন, আমি জানতুম না ও আপনার ভাগনি—

—এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমি জানতে চাইছি—আপনি কী স্থির করলেন?

—কী বিষয়ে? মানে, ঠিক কী জানতে চাইছেন আপনি?

দীনবন্ধু জানার অসীম ধৈর্য, রাগারাগি-চেঁচামেচি করা তাঁর ধাতে নেই। এদিকে নীরব কর্মী। পরপর দুবার বিপুল ভোটে জয় লাভ করে অ্যাসেমব্লিতে টিকে আছেন। গুজব ঐ নীরব কর্মীর ইঙ্গিতে নাকি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্য যে ওঁর এলাকায় নেই একথা বলা যাবে না, কিন্তু তারা

সমাজের সেই অংশেই দৌরাত্ম্য করে যেখানে দীনবন্ধুর স্বার্থ জড়িত নয়। শান্তভাবে তিনি বললেন, ও! আপনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না বুঝি? আমি বল্‌ছি আমার ভাগ্নীকে বিবাহ করার বিষয়ে।

কুণাল দীনবন্ধুর পরিচয় ঠিক জানত না। তাঁর শান্তরূপে সে কিছু আশ্বস্ত হল। বলল, সেক্ষেত্রে আপনার ভাগ্নিকে ডেকে আনুন। আপনাদের সামনেই আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ওর মা-বাবাকেও ডাকুন—

দীনবন্ধু এবার শ্যামলের দিকে ফিরে বললেন, তুই ঠিকই বলেছিস শ্যামল। লোকটা থরোব্রেড স্কাউন্ড্রেল। যে মেয়েটিকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে যে পিতৃ-মাতৃহীন এ খবরটাও ওর অজানা!

কুণাল বললে, আ'য়াম সরি। আমি জানতাম না—আপনিই ওর লিগাল গার্জেন; কিন্তু ওটা আপনি ভুল বললেন মিস্টার জানা। তাকে কোনো প্রতিশ্রুতিই দিইনি আমি—

দীনবন্ধু পুরো একটা মিনিট কুণালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর শ্যামলের হাত থেকে অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে খুলে ফেললেন। দেখা গেল, তার ভিতরে একটি ব্যাটারি-সেট টেপ-রেকর্ডার। উনি বোতামটা টিপে দিতেই সেটা সরব হল—

"তুমি বলেছিলে, বাবার মতামতকে তুমি থোড়াই কেয়ার করো। বলোনি? তুমি চাকরি করছ, উপার্জন করছ—এখন তোমার ইচ্ছাই তাঁকে মেনে নিতে হবে—এসব কথা বলোনি? ...আস্তে! সবাই উঠে পড়বে! ...পড়ুক। সবাই জানুক! আই কেয়ার এ ফিগ্‌! ইন ফ্যাক্ট্‌, তুমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক একথা জানানোর পরেই তো..."

দীনবন্ধু সুইচ-অফ করে দিলেন।

কুণাল বিস্মিত হয়ে গেল। সামলে নিয়ে বললে, আই সি! ব্ল্যাকমেলিং-এর যাবতীয় ব্যবস্থাই নিয়েছেন আপনারা। কিন্তু থামিয়ে দিলেন কেন, সবটা বাজিয়ে শুনুন—ওতে এক পক্ষের অভিযোগই আছে শুধু, অপর পক্ষের স্বীকৃতি নেই। এভিডেন্স হিসাবে ওটা...

—আপনি বোধহয় 'আইন'-এর কথা ভাবছেন। ওটা অবান্তর। আমি আমার পারিবারিক ইজ্জতের কথা আলোচনা করছি, 'আইন' নয়!

—সেটা বুঝেছি। কিন্তু 'অবান্তর' বললেই তো দেশের আইন উবে যাবে না? আমি কোনো অন্যায় করিনি, অপরাধ করিনি। দিস ইজ নট এ কেস অব রেপ! আপনার ভাগনি প্রাপ্তবয়স্কা। সে যদি স্বেচ্ছায়...

—আপনি এখনো অবসেশনে ভুগছেন, ভাবছেন, এটা 'আদালত ও একটি মেয়ে'-র রকমফের। আমি সে লাইনে আদৌ চিন্তা করছি না। আপনি যে সমস্যাটা বানিয়েছেন তার একটি মাত্র সমাধান। বেলা সাড়ে-দশটায় দপ্তর খুলবে। তখন

আপনাকে আমার সঙ্গে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে যেতে হবে। খুকিকে বিয়ে করার পরেই আপনি কলকাতায় ফিরতে পারবেন।

—কী বলছেন আপনি! সেটা কেমন করে সম্ভব? ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারকে নোটিস পর্যন্ত দেওয়া নেই—

—সেটা আমার বিবেচ্য। দেখবেন, ওঁর ফাইলে ব্যাকডেটেড নোটিস দেওয়াই থাকবে। দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন—আমি ও শ্যামল আছি। পাত্র-পাত্রী দুজনেই হাজির। আপনি তৈরি হয়ে নিন।

দীনবন্ধু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

যে দৃঢ় সঙ্কল্পের ভঙ্গিতে নিদান হাঁকলেন তাতে একটু ঘাবড়ে গেল কুণাল। বললে, আমাকে...কয়েকদিন ভাববার সময়ও দেবেন না?

—ভেবে তো কোনো কূলকিনারা হবে না মিস্টার চক্রবর্তী। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই!

—আর আমি যদি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই?

ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন উনি। এ-কথায় আবার কুণালের মুখোমুখি হলেন। বললেন, সে-কথা ঠিক। ঘাড়ে ধরে ঘোড়ার মুখটা জলের গামলায় চেপে ধরার ক্ষমতাটুকুই শুধু আমার আছে, কিন্তু তাকে দিয়ে জল খাওয়ানো আমার ক্ষমতার বাইরে!

কুণাল নীরবে অপেক্ষা করে। উনিও একটু অপেক্ষা করে বলেন, সেখানে বাধ্য হয়ে আমাকে শ্যামলের বিকল্প প্রস্তাবটাই মেনে নিতে হবে—

ব্যাপারটা কুণাল আন্দাজ করতে পারে না। পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে, সেটা কী?

—আপনি যে অঘটনটা ঘটিয়েছেন সেটা না ঘটলে হয়তো ঐ শ্যামলের সঙ্গেই খুকির বিয়ে হত। ছেলেটা এমন পাগল যে, ঘণ্টা-খানেক আগেও সে আমাকে বলেছে—খুকির সঙ্গে আপনার বিয়ে না দিতে। সে নাকি ইতিমধ্যে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কী সব জেনে ফেলেছে! ওর ধারণা—খুকি আপনার স্ত্রী হিসাবে সুখী হবে না।

কুণাল চোখ তুলে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে যেন পাথরের মূর্তি! কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলছে।

—ও এতবড় নির্বোধ যে, খুকির বাচ্চাটার পিতৃত্বের দায় পর্যন্ত ঘাড় পেতে নিতে প্রস্তুত!

এটা অবাক-করা খবর। কুণাল দ্বিতীয়বার শ্যামলের দিকে তাকায়। দেখল, তার চোখে পলক পড়ছে না।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস পড়ল কুণালের। বললে, তবে তো লেঠা চুকেই গেল—

—না! গেল না! আমি তাতে রাজি নই!

সমাজের সেই অংশেই দৌরাত্ম্য করে যেখানে দীনবন্ধুর স্বার্থ জড়িত নয়। শান্তভাবে তিনি বললেন, ও! আপনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না বুঝি? আমি বল্‌ছি আমার ভাগ্নীকে বিবাহ্‌ করার বিষয়ে।

কুণাল দীনবন্ধুর পরিচয় ঠিক জানত না। তাঁর শান্তরূপে সে কিছু আশ্বস্ত হল। বলল, সেক্ষেত্রে আপনার ভাগ্নিকে ডেকে আনুন। আপনাদের সামনেই আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ওর মা-বাবাকেও ডাকুন—

দীনবন্ধু এবার শ্যামলের দিকে ফিরে বললেন, তুই ঠিকই বলেছিস শ্যামল। লোকটা থরোব্রেড স্কাউন্ড্রেল। যে মেয়েটিকে বিবাহ্‌ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে যে পিতৃ-মাতৃহীন এ খবরটাও ওর অজানা!

কুণাল বললে, আ'য়াম সরি। আমি জানতাম না—আপনিই ওর লিগাল গার্জেন; কিন্তু ওটা আপনি ভুল বললেন মিস্টার জানা। তাকে কোনো প্রতিশ্রুতিই দিইনি আমি—

দীনবন্ধু পুরো একটা মিনিট কুণালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর শ্যামলের হাত থেকে অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে খুলে ফেললেন। দেখা গেল, তার ভিতরে একটি ব্যাটারি-সেট টেপ-রেকর্ডার। উনি বোতামটা টিপে দিতেই সেটা সরব হল—

"তুমি বলেছিলে, বাবার মতামতকে তুমি থোড়াই কেয়ার করো। বলোনি? তুমি চাকরি করছ, উপার্জন করছ—এখন তোমার ইচ্ছাই তাঁকে মেনে নিতে হবে—এসব কথা বলোনি? ...আস্তে! সবাই উঠে পড়বে! ...পড়ুক। সবাই জানুক! আই কেয়ার এ ফিগ্‌! ইন ফ্যাক্ট্‌, তুমি বিবাহ্‌ করতে ইচ্ছুক একথা জানানোর পরেই তো..."

দীনবন্ধু সুইচ-অফ করে দিলেন।

কুণাল বিস্মিত হয়ে গেল। সামলে নিয়ে বললে, আই সি! ব্ল্যাকমেলিং-এর যাবতীয় ব্যবস্থাই নিয়েছেন আপনারা। কিন্তু থামিয়ে দিলেন কেন, সবটা বাজিয়ে শুনুন—ওতে এক পক্ষের অভিযোগই আছে শুধু, অপর পক্ষের স্বীকৃতি নেই। এভিডেন্স হিসাবে ওটা...

—আপনি বোধহয় 'আইন'-এর কথা ভাবছেন। ওটা অবান্তর। আমি আমার পারিবারিক ইজ্জতের কথা আলোচনা করছি, 'আইন' নয়!

—সেটা বুঝেছি। কিন্তু 'অবান্তর' বললেই তো দেশের আইন উবে যাবে না? আমি কোনো অন্যায় করিনি, অপরাধ করিনি। দিস ইজ নট এ কেস অব রেপ! আপনার ভাগনি প্রাপ্তবয়স্কা। সে যদি স্বেচ্ছায়...

—আপনি এখনো অবসেশনে ভুগছেন, ভাবছেন, এটা 'আদালত ও একটি মেয়ে'-র রকমফের। আমি সে লাইনে আদৌ চিন্তা করছি না। আপনি যে সমস্যাটা বানিয়েছেন তার একটি মাত্র সমাধান। বেলা সাড়ে-দশটায় দপ্তর খুলবে। তখন

আপনাকে আমার সঙ্গে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে যেতে হবে। খুকিকে বিয়ে করার পরেই আপনি কলকাতায় ফিরতে পারবেন।

—কী বলছেন আপনি! সেটা কেমন করে সম্ভব? ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারকে নোটিস পর্যন্ত দেওয়া নেই—

—সেটা আমার বিবেচ্য। দেখবেন, ওঁর ফাইলে ব্যাকডেটেড নোটিস দেওয়াই থাকবে। দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন—আমি ও শ্যামল আছি। পাত্র-পাত্রী দুজনেই হাজির। আপনি তৈরি হয়ে নিন।

দীনবন্ধু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

যে দৃঢ় সঙ্কল্পের ভঙ্গিতে নিদান হাঁকলেন তাতে একটু ঘাবড়ে গেল কুণাল। বললে, আমাকে...কয়েকদিন ভাববার সময়ও দেবেন না?

—ভেবে তো কোনো কূলকিনারা হবে না মিস্টার চক্রবর্তী। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই!

—আর আমি যদি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই?

ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন উনি। এ-কথায় আবার কুণালের মুখোমুখি হলেন। বললেন, সে-কথা ঠিক। ঘাড়ে ধরে ঘোড়ার মুখটা জলের গামলায় চেপে ধরার ক্ষমতাটুকুই শুধু আমার আছে, কিন্তু তাকে দিয়ে জল খাওয়ানো আমার ক্ষমতার বাইরে!

কুণাল নীরবে অপেক্ষা করে। উনিও একটু অপেক্ষা করে বলেন, সেখানে বাধ্য হয়ে আমাকে শ্যামলের বিকল্প প্রস্তাবটাই মেনে নিতে হবে—

ব্যাপারটা কুণাল আন্দাজ করতে পারে না। পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে, সেটা কী?

—আপনি যে অঘটনটা ঘটিয়েছেন সেটা না ঘটলে হয়তো ঐ শ্যামলের সঙ্গেই খুকির বিয়ে হত। ছেলেটা এমন পাগল যে, ঘণ্টা-খানেক আগেও সে আমাকে বলেছে—খুকির সঙ্গে আপনার বিয়ে না দিতে। সে নাকি ইতিমধ্যে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কী সব জেনে ফেলেছে! ওর ধারণা—খুকি আপনার স্ত্রী হিসাবে সুখী হবে না।

কুণাল চোখ তুলে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে যেন পাথরের মূর্তি! কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলছে।

—ও এতবড় নির্বোধ যে, খুকির বাচ্চাটার পিতৃত্বের দায় পর্যন্ত ঘাড় পেতে নিতে প্রস্তুত!

এটা অবাক-করা খবর। কুণাল দ্বিতীয়বার শ্যামলের দিকে তাকায়। দেখল, তার চোখে পলক পড়ছে না।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস পড়ল কুণালের। বললে, তবে তো লেঠা চুকেই গেল—

—না! গেল না! আমি তাতে রাজি নই!

কুণাল ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এভাবে জোর করে বিয়ে দিলে কি অরু সুখী হতে পারবে? আপনি আসলে কী চান? যাতে আপনার ভাগনি জীবনে সুখী হয়, তাই নয়? আমি স্বভাগতভাবে বোহিমিয়ান—শ্যামলবাবু আমার সম্বন্ধে কী তথ্য সংগ্রহ করেছেন জানি না, তবে সম্ভবত তিনি ভুল খবর পাননি। হয়তো দু-এক বছরের ভিতরেই—

—বধূহত্যা?

—না, ডিভোর্স!

—সেখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই। সে আপনাদের দুজনের ফয়সালা। খুকির আর আপনার। আমি শুধু আমার পারিবারিক ইজ্জতটার জন্যই চিন্তিত। 'জারজ' সন্তানকে আমি মেনে নেব না আমার সংসারে।

—কিন্তু আইনত বাচ্চাটা তো 'জারজ' হবে না। শ্যামলবাবু যদি আজই রেজিস্ট্রিমতে ওকে বিয়ে করেন। সাক্ষী হিসাবে আমি সই দিতে রাজি।

দীনবন্ধু আবার একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনি পরিস্থিতিটা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারছেন না মিস্টার চক্রবর্তী। 'আইন' এক্ষেত্রে অবান্তর! আমাকে যদি শ্যামলের ঐ বিকল্প প্রস্তাবটা মেনে নিতে বাধ্য করেন তাহলে শুধু আমার সমস্যাটারই সমাধান হবে, আপনারটা হবে না...

—তার মানে?

—সে-ক্ষেত্রে আপনি তো আর আমার ভাগ্নি-জামাই থাকছেন না। ফলে, কলকাতায় ফিরে যাওয়াটা আর সম্ভবপর হবে না আপনার পক্ষে—

—বুঝলাম না। কেন ফিরে যেতে পারব না?

—বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রয়োজনে আদালতে হলফ্ নিয়ে আমি বলে আসব, আমি নিজে আপনাকে ডাউন কোল্ড-ফিল্ডে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। কেন আপনি কলকাতায় পৌঁছলেন না, কেন আপনার লাশ পুলিশে খুঁজে পাচ্ছে না, তার কিছুই আমি জানি না...

ওঁর শান্ত সমাহিত এ উক্তিটায় কুণালের মনে হল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা সাপ নেমে গেল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান সে! বুঝে নিল, এটা ফাঁকা বুলি নয়! লোকটা এ অঞ্চলের একমাত্র সম্রাট। রাজনৈতিক নেতা! সে ওর কব্জায়! হয়তো এ জাতীয় কাজ লোকটা আগেও করেছে, প্রয়োজনে আবারও করবে! না, এটা মোটেই ফাঁকা আওয়াজ নয়।

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বললে, আমি এক শর্তে স্বীকৃত। আপনি অরুকে ডাকুন, সে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বছর-খানেক পরে সে ডিভোর্সের জন্য দরখাস্ত করবে, আর আপনারা যদি খবরটা গোপন রাখেন তাহলে আমি রাজি!

দীনবন্ধু পুনরায় শান্তভাবেই বললেন, খুকির কোনো ভূমিকা নেই এখানে। কিন্তু খবরটা কেন গোপন রাখতে চাইছেন বলুন তো?

—আবার বাবা অত্যন্ত কন্‌জারভেটিভ! অব্রাহ্মণ কোনো মেয়েকে বিয়ে করেছি জানলে তিনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন—

—আই সি! হ্যাঁ, শুনেছি বটে আপনার বাবার বিরাট সম্পত্তি। বেশ, তাতে আমি স্বীকৃত।

কুণাল এবার শ্যামলের দিকে ফিরে বলল, আপনি কথা দিচ্ছেন যে, ডিভোর্স হয়ে গেলে অরুন্ধতীকে বিয়ে করবেন?

শ্যামল এতক্ষণে প্রথম কথা বলল, দ্যাটস্ নান অব য়োর বিজনেস! তবে এটুকু বলতে পারি, অরু আপনাকে ডিভোর্স দিলে আমিই সবচেয়ে খুশি হব! কারণ, আজ যে শাস্তিটা আপনার পাওনা রইল সেটা দিতে তখন আর আমার কোনো বাধা থাকবে না!

কুণাল দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া অসীম শক্তির অধিকারী! দৈহিক ও মানসিক। এতক্ষণে সে স্বাভাবিক হয়েছে। পকেট থেকে এবারে বার করে তার সিগ্রেট-কেস। একটা ইন্ডিয়া-কিং-এর মুখাগ্নি করে বললে, আই উইশ য়ু অল সাকসেস্!

দীনবন্ধু আর শ্যামল প্রস্থানের উদ্যোগ করেন। বোঝা যাচ্ছে, দরজাটা ওরা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে যাবে। দুর্ধর্ষ হ্যারিকেন-হিটার ব্যাটসম্যানটা এতক্ষণ ক্রমাগত ডিফেন্সে ব্যাট করেছে। পিছনের তিনকাঠি যাতে ছিটকে না যায় এই চিন্তাতে ক্রমাগত ব্লক করে গেছে। এই শেষ ম্যান্ডেটারি ওভারের শেষ বলটায় ও ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে একটা ছক্কা হাঁকড়াতে চাইল। বললে, একটা কথা শ্যামলবাবু—

শ্যামল দাঁড়িয়ে পড়ে দরজার কাছে। দীনবন্ধু ততক্ষণে দ্বারের ওপাশে।

কুণাল একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নিচু গলায় বললে, মামাবাবুর কথায় মনে হল অরুর সঙ্গে আপনারও অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। আমি ওকে বিয়ে করলে আপনাকে আবার বিড়ম্বনায় ফেলব না তো? আই মিন, ওর পেটে যেটা আছে—বাই এনি চান্স—সেটা আপনার নয় তো?

শ্যামলের জবাব দিতে দেরি হল। সে নিজেও দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া। দীনবন্ধুর দক্ষিণ-হস্ত হিসাবে অনেক-অনেক মারাত্মক-ঘটনার নায়ক সে। আজই না-হয় পুলিশে কাজ করছে, সংযত হয়েছে! সে দাঁতে দাঁত দিয়ে বললে, এ কথার জবাবে আপনার নাকটা থেঁতলে দিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। বিশ্বাস করুন, সেটা মুলতুবি রাখছি এজন্য যে, নাকে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না!

কুণাল জবাবে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। তার আগেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

বাসের জানলায় মাথা রেখে ও সারাটা দিন শুধু ভেবেছে, আর ভেবেছে।

এখন ও কী করবে? কী এমন 'নতুন কথা' থাকতে পারে ঐ লোকটার, যাতে ও অন্তর থেকে ঘৃণা করে এবং ভালবাসে! এতক্ষণে মনে হচ্ছে ঐ 'হঠাৎ-দেখা'টা না ঘটলেই বোধহয় ভাল ছিল। সে তো দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার একক সন্ন্যাসিনীর জীবনে। স্কুলের বাচ্চাদের নিয়েই দিন কাটে। ঐ তির্যক পথেই তৃপ্ত হয়েছে তার মাতৃহৃদয়। সংসারও করছে—পালা করে সপ্তাহে একদিন রান্না করে। ওদের ওয়াকিং-গার্লস্ মেসে ওরা রাঁধুনি রাখেনি। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ চার বছর—না, চার নয়, তিন বছর এগারো মাস সাতাশ দিনের ভিতর ঐ সীমন্তিনীর স্বামী-সহবাস একদিনও হয়নি। দৈহিক সান্নিধ্যের স্মৃতি যেটুকু, তা প্রাক্‌বিবাহ পর্যায়ের। দেহের খিদে যে একেবারে নেই সে-কথা বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে, তবে ইদানীং সেটা কমে এসেছে। ভেবেছিল মরেই গেছে—কিন্তু আজ সকালে ঐ আগুনবরণ ছেলেটার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কয়েকটা খণ্ডমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করেছে—সেটা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ও বোধহয় খুব দামি কিছু আফটার-শেভ লোশন ব্যবহার করেছিল। দারুণ একটা মোহময় সৌরভ—পৌরুষের।

মনে পড়ছে ওর বিবাহ রাত্রির কথা—রাত্রি নয়, দিন। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে ফিরে এসে কুণাল গাড়ি থেকে নামেনি। মেজদাকে বলেছিল, আমার সুটকেসটা পাঠিয়ে দাও তো ভাই, আমাকে এই গাড়িটাই স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

সবাই হাঁ-হাঁ করে আপত্তি করেছিল। কিন্তু বহু অনুরোধ-উপরোধেও ওকে টলানো যায়নি।

তারপর বহু জল বয়ে গেছে গঙ্গা এবং অরুন্ধতীর দু-গাল বেয়ে।

এমনকী অরুন্ধতী যখন 'মিস ক্যারেজ' হয়ে মরতে বসেছিল, নার্সিং-হোমে ওর শিয়রে বসে ন'দা দিনের-পর-দিন রাতের-পর-রাত সেবা করেছে, তখনো সে ছুটে আসেনি। দীনবন্ধু কর্তব্যবোধে টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন। তার কোনো জবাব আসেনি। অবশ্য তার কারণও আছে ন'দা গোপন তদন্ত করে পরে জেনে এসেছিল—কুণাল কলকাতায় নেই, তার এক বান্ধবীকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গেছে।

জটিলতা দেখা দিয়েছিল দীনবন্ধু হঠাৎ করোনারি থ্রম্বোসিস্-এ মারা যাওয়ায়। দীনবন্ধু ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। অরুন্ধতীকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোতে অথবা ডিভোর্সে উদ্বুদ্ধ করতে কোনো চেষ্টাই করেননি। কিন্তু মামার মৃত্যুর পর পরিস্থিতিটা বদলে গেল। বড়দা, মেজদা, সেজদা এবং ছোড়দা এ বিষয়ে একমত, এমনকী মামিমাও। অরু হয় মিটমাটে উদ্যোগী হোক, না হয় বিবাহবিচ্ছেদে। এমন নির্লিপ্ত হয়ে দিন কাটানোর কোনো মানে হয় না! ন'দা অবশ্য কোনো কথা বলেনি। বস্তুত অপ্রয়োজনে সে তখন দেখাই করত না অরুর সঙ্গে। মামার শ্রাদ্ধে সে জান দিয়ে পরিশ্রম করেছে; কিন্তু তার পরেই সে না-পাত্তা। তার অজুহাত ছিল অফিসের

চাপ—কিন্তু অরু বুঝতে পেরেছিল আসল কারণটা অন্য জাতের। পাছে অরু ভুল বোঝে। দীনবন্ধুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হয়েছিল কুণালের। সে আসেনি।

খড়গপুরের জগত্তারিণী স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর দুর্গাপুর ছাড়ার আগে অরু অবশ্য চিঠি দিয়েছিল তার ন'দাকে।

শ্যামল এসে দেখা করে গেছিল। চিরাচরিত ভঙ্গিতে বলেছিল, যখনই প্রয়োজন হবে আমাকে জানাবি অরু। মনে আছে তো—তুই কথা দিয়েছিলি আমাকে? সেই লেকের ধারে।

অরুর দুচোখ জলে ভরে এসেছিল। হ্যাঁ, মনে আছে তার। সে-সন্ধ্যার কথা ভোলার নয়। বলেছিল, তোকে একটা অনুরোধ করব, রাখবি ন'দা?

—অনুরোধ! তোর কোন কথাটা আমি রাখিনি বল?

—তুই নিজে এবার একটা বিয়ে কর!

হো-হো করে হেসে উঠেছিল শ্যামল। বলেছিল, ও, এই কথা? তাহলে তো বাধ্য হয়ে আমাকেও একটা কথা জেনে নিতে হয়। তুই কী স্থির করলি?

—আমার যেমনভাবে দিন যাচ্ছে, সে ভাবেই কেটে যাবে বাকি জীবন।

—কী লাভ? ডিভোর্স দিয়ে দে বরং ওকে। না রে। নিজের স্বার্থে বলছি না আমি। তোর স্বার্থে। নিজেকে বন্ধনমুক্ত রাখাটাই তো ভাল। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? তুই ভাবছিস কুণালকে শাস্তি দিচ্ছিস এভাবে; আসলে তুই নিজেই শাস্তি পাচ্ছিস! ও যে জাতের ছেলে সারাজীবনই ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াবে। সংসার করবে না। ফলে তুই ওকে ছাড়পত্র লিখে না দিলে ওর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অথচ তুই নিজে যে ওর সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িয়ে পড়ছিস...

—বিবাহের বন্ধন তো অচ্ছেদ্যই হওয়ার কথা।

—না রে। ওটা নাইন্টিন্থ-সেঞ্চুরির কথা। দুনিয়া এখন অনেক-অনেকটা এগিয়ে গেছে। ভুল ভুলই। সুতপার কথা মনে নেই। সে তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল, ভুল শুধরে নিয়েছে। এখন সে সুখেই আছে—স্বামী, সংসার, সন্তান...

—তুই কি একই জাতের সমাধানের কথা ভাবছিস?

—তার মানে?

—যেভাবে 'শিশুপাল বধ' করে একটা রাজ্য জয় করেছিলি, ঠিক সেইভাবে এবার 'জরাসন্ধ বধ' করে...

মাঝপথেই থেমে যায়।

শ্যামল মাথাটা নিচু করে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। বলে, তোর এ-কথা মনে হতে পারে। হয়তো দীনুদা বা দিদি তোকে বলেছিলেন সে-সময়ে আমি তাঁদের কাছে...বিশ্বাস কর অরু, এ-কথা নিজের স্বার্থে বলছি না। শুধু তোর স্বার্থে! তোকে আমি সুখী দেখতে চাই।

অরুন্ধতী তার ন'দার হাত দুটি টেনে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিল, জানি রে ন'দা জানি! তুই সেদিন মামাকে যে-কথা বলেছিলি তা শুধু আমাকে বাঁচাতে! তোকে আমি বড়দা-মেজদা-ছোড়দাদের সঙ্গে আলাদা করে কোনোদিন দেখিনি। ইন ফ্যাক্ট্, মামির মুখে সেদিন তোর প্রস্তাব শুনে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম, ভেবেছিলাম—এ আবার কী কথা! তাও কখনো হয়? ভাই-বোনের বিয়ে?

শ্যামল ম্লান হেসে বলেছিল, সেসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ অরু? আগামীদিনের কথা ভাব বরং—

—তাই তো বলছি। তুই নিজে একটা বিয়ে কর এবার! বিয়ে ঠিক হলে আমাকে খবর দিস, আমি লম্বা ছুটি নেব! ন'বৌদিকে প্রথম বরণ করে ঘরে তুলব।

সেদিন অরু বুঝতে পারেনি, আজ বুঝতে পারে, কেন এ-কথায় খুশিয়াল হয়ে উঠতে পারেনি ওর ন'দা। না, অরুকে প্রচণ্ড বিপদ থেকে রক্ষা করতেই শুধু নয়, শ্যামল ওকে সন্তানবতী অবস্থায় বিয়ে করতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

শ্যামল অরুকে ভালবাসত!.

বোকা মেয়েটা সেদিন তা টের পায়নি।

—আচ্ছা দিদি, এটা 'আনফেয়ার মিন্‌স' নয়?

স্মৃতিচারণ থেকে অরুন্ধতী বাস্তবে ফিরে আসে—দীঘাগামী বাসের গর্ভে। দেখে, অধিকাংশই বাসের দোলানিতে ঢুলছে। অমিয়াদি অঘোর নিদ্রায় মগ্ন। অতসীর ঘাড়টাও কাত হয়ে আছে। অঞ্জলিদি জানলার ধারে গিয়ে বসেছেন। খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন অপসৃয়মান দুনিয়ার দিকে। বোধকরি তিনিও তাঁর ফেলে-আসা জীবনের খতিয়ানটা উলটে-পাল্‌টে দেখছেন মনে মনে। ওদের সামনের বেঞ্চিতে বসেছে কয়েকটি উঁচু ক্লাসের মেয়ে। তারা এতক্ষণ 'অন্তাক্ষরী' খেলছিল—সচেতনভাবে সেটা খেয়াল করেনি এতক্ষণ, তবে ধূসর ছায়াচ্ছন্ন কৈশোরের স্মৃতিচারণের মাঝে মাঝে কেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচিত সুর বার-বার গুনগুন করে উঠছিল তা টের পেল। উঁচু ক্লাসের যে মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নটা পেশ করেছিল সেই রেবাকেই প্রতিপ্রশ্ন করে, কোনটাকে 'আনফেয়ার মিন্‌স্' বলছ? আমি শুনতে পাইনি তোমার আগের প্রশ্নটা।

—আমরা 'অন্তাক্ষরী' খেলছি। আমার আগেই আছে শিপ্রা। সে বারে-বারে শেষ করছে 'ত' দিয়ে। ইচ্ছে করে। জোচ্চুরি করে...

শিপ্রা হাউমাউ করে প্রতিবাদ করে, বা—রে! আমি যখন যেখানে ইচ্ছে থামব। এটাই তো খেলার আইন! তাই না দিদি? রেবার 'ত'-অক্ষরের স্টক কম তাই ও অহেতুক আপত্তি করছে।

রেবা বলে, দেখুন দিদি, ও বারে-বারে কায়দা করে 'ত' দিয়ে শেষ করছে। সবাই হেরে গেছে। এখন শুধু আমরা দুজন আছি, আমি আর শিপ্রা। আমি গেয়েছিলাম

'ওগো মিতা, সুদূরের মিতা'। তার শেষ অক্ষর তো 'ত'? তাই শিপ্রা গাইল 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে...' তাহলে ওকে থামতে হবে লাইনের শেষ শব্দে 'যাই'—'ই' দিয়ে। কিন্তু ও চোট্টামি করে আরও এগিয়ে গেল—'তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ...' বেশ, তা যাক, কিন্তু তাহলে ওকে সম্পূর্ণ লাইনটা গেয়ে থামতে হবে 'চাই' দিয়ে, 'ই' দিয়ে! তাই নয়? কিন্তু ও 'তোমা হতে যবে'-র 'তো' বলেই থেমে গেল! এটা কাঠামি নয়?

শিপ্রা আরও কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বলে, ই—স! কাঠামি কেন? আমি যেখানে খুশি থামতে পারি। পারি না দিদি?

অরুন্ধতী ওদের গান শেখায়। সে কৌতুক বোধ করে। কিশোর বয়সে 'অন্তাক্ষরী' খেলায় সে দারুণ উৎসাহ পেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী হত। ওর রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্টক বেশ ভাল। বললে, আগে স্থির করো, তোমরা ঝগড়াটা চালিয়ে যাবে, না আমার বিচারটা শুনবে?

ওরা দুজনেই থতমত খেয়ে থেমে যায়।

অরুন্ধতী বলে, প্রথম কথা, রেবা, তোমার প্রথম অভিযোগটা টেকে না। শিপ্রা একাই 'ত' দিয়ে শেষ করছিল না। আসল কথা—তোমাদের প্রতিযোগিতাটা এসে ঠেকেছে 'ত'য়ের ঘাটে। 'ত'-ওয়ালা গানের ঘাটতি হয়েছে। তোমাদের দুজনেরই। তাই তুমি 'ওগো মিতা, সুদূরের মিতা'য় থেমেছিলে। তোমার যুক্তি অনুসারে তোমার নিজেরও উচিত ছিল পুরো লাইনটা গেয়ে থামা। তাহলে তোমায় শেষ করতে হত 'ন'য়ে—'আমার কী বেদনা সে কি জান?' বলে। তা তুমি গাওনি। কারণ 'ন' দিয়ে শেষ করতে চাওনি তুমি, সত্যি কিনা বলো?

রেবা আমতা-আমতা করে।

অরুন্ধতী বলে, শিপ্রা, তুমিও অন্যায় করেছ। 'তোমা হতে যবে'র 'তো' বলে তুমি থামতে পারো না। 'অন্তাক্ষরী' খেলায় তুমি থামতে পারো তিন ভাবে। যেখানে পঙক্তি বা অর্ধপঙক্তিটা শেষ হচ্ছে, অথবা 'সম'-এর মাথায়, কিংবা লিখিত কবিতাতে যেখানে 'যতি' আছে। একটা শব্দের যে-কোনো অক্ষরে শেষ করা যায় না। একটা কথা মনে রেখো, 'অন্তাক্ষরী' খেলাটার মূল উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতামূলক নয়—আনন্দ দেওয়া আর আনন্দ পাওয়া। ঐ সঙ্গে গানের স্টক বাড়ানো। এটাকে মল্লযুদ্ধের আসর কোরো না তোমরা। ...আচ্ছা, বলো তো 'ত' দিয়ে কটা গান গেয়েছ তোমরা?

—তা আট-দশটা হবেই!

—তবেই দেখো! খড়গপুরে ফিরে গিয়ে গীতবিতানে দেখো, শুধু 'ত'-অক্ষর দিয়ে অন্তত দেড়শো গান সেখানে লেখা আছে।

—দেড়শো?—ওরা অবাক মানে!

—বেশি বই, কম নয়। তোমাদের পুঁজি অল্প, তাই ঝগড়া-বিবাদ করছ—

—তাহলে আপনার বিচারের রায়টা কী হল দিদি?

—বিচারের রায় হল আর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত। গাও সকলে কোরাসে—

নিজেই শুরু করে দেয়—"অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়..."

ওরাও ঝগড়া-বিবাদ ভুলে কোরাসে গান গেয়ে ওঠে।

অরু ওদের গানটা ধরিয়ে দিয়ে কখন আবার চুপ করে যায়।

আবার ডুবে যায় তার অন্তর্লীন স্মৃতিচারণে। শ্রুতিপথে লেগে থাকে গানের রেশ :

"নদীতট সম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,

একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়।"

ঢেউগুলি চলে যায়, কিন্তু ঢেউয়ের আঘাতে যে বেদনা পেয়েছিল, সেগুলি মিলিয়ে যায় না!

...হ্যাঁ, কী যেন ভাবছিল সে? ন'দার সেই ডবল্-ক্রসিং!

না! কথাটা ঠিক নয়। তখন তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে ধীর-স্থির ভাবে ভেবে দেখেছে—ন'দা অন্যায় করেনি কিছু। এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। এতবড় একটা ব্যাপার মামার কাছ থেকে সে গোপন রাখতে পারে না, পারেনি। মামা অরুর 'লিগ্যাল গার্জেন' বলেই শুধু নয়, তিনি ন'দার খুঁটি বলে, রাজনৈতিক দাদা বলে! অথচ ঠিক সেই মুহূর্তে শ্যামল অরুকে সে-কথা বলতে পারেনি। জানায়নি যে, মামাকে সবকিছু জানিয়েছে।

অরুন্ধতীকে সে এসে বলেছিল অর্ধসত্য। জামাইবাবু ঘটনাচক্রে বেনাচিতি মোড়ের জমিটায় একটা সিনেমা হল বানাতে ইচ্ছুক। ঐ ছেলেটি—কুণাল চক্রবর্তী—যাচ্ছে জমিটা দেখতে। ওদের বাড়িতেই অতিথি হবে। অরুকে সেখানে নির্জন সাক্ষাতের একটা সুযোগ করে দিতে পারবে শ্যামল।

বেচারি অরুন্ধতী। সে সন্দেহ করেনি কিছু। সারাটা দিনের ভিতর নির্জনসাক্ষাতের সুযোগ করে দিতে পারল না শ্যামল। কিন্তু কুণাল নিজে থেকেই রাতটা থেকে যাবার প্রস্তাব দিল। ন'দা ওর কানে-কানে বলে গেল, বুঝেছিস নিশ্চয়ই, মাথা ধরার অজুহাতটা নেহাত বাজে ওজর। ও ঐ গেস্টরুমে শুয়ে আছে, তুই এক কাপ চা নিয়ে ঐ ঘরে যা। আমি দরজার বাইরে পাহারা দেব। কী তোদের কথাবার্তা আছে ঝটপট সেরে নিস; দেখিস বাড়াবাড়ি কিছু করে বসিস না!

খুশিয়াল অরু তার ন'দাকে ছদ্মতাড়না করেছিল; আমি কি পাগল? কিন্তু যা বলেছিলাম তা ঠিক কিনা?

—কী?

—ওর চেহারা।

—হ্যাঁ; নির্ময়ূর কার্তিক! তবে খেয়াল রাখিস দরজা কিন্তু খোলা থাকবে!

—খেয়াল থাকবে গো মশাই, থাকবে! এদিকে কেউ আসছে দেখলেই তুই গলা খাঁকারি দিবি কিন্তু...

সেসব কিছুর প্রয়োজন হয়নি। ঘরে ঢুকেই ও বেরিয়ে আসে। শ্যামল ছোড়নেওয়ালা নয়। বলে, কী ব্যাপার? তুই যে ঢুকলি আর বেরুলি?

অরু সলজ্জে বলেছিল, ঠিক আছে! যা কথা হবার তা হয়ে গেছে। তোকে আর ভাবতে হবে না।

—কিন্তু তুই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছিস! তুই না সেদিন গর্ব করে বলেছিলি— 'ন'দাকে সব কথা বলা যায়'?

খুশিতে ডগমগ অরু ব্লাউসের ভিতর থেকে একটা চিরকুট বার করে বলে, এতে কী লেখা আছে, তা আমি নিজেই যে জানি না ন'দা, তোকে কী বলব?

—ঠিক আছে। পড়ে দেখ। যেটুকু আমাকে বলা যায় তাই বলিস।

ন'দার কাছ থেকে লুকোতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বেচারি স্বপ্নেও ভাবেনি শ্যামল ওকে না জানিয়ে এতসব কাণ্ড করেছে—ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার...

অরু আজও ঠিক জানে না এসবের কতখানি শ্যামলের স্বকীয় চিন্তা, আর কতখানি মামার নির্দেশে। ঘটনা ঘটে যাবার অনেক পরে মামিমার মুখ থেকে জানতে পারে ন'দার ঐ অদ্ভুত কথাটা। সে নাকি মামা-মামির কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল অরুন্ধতীকে বিবাহ করতে চায়। মামিকে বলেছিল, দিদি, আমি জানি যে, আমি অরুর পায়ের নখের যোগ্যও নই! কিন্তু ঐ পাষণ্ডটার হাড়িকাঠে ওকে বলি দিয়ো না! লোকটা থরো-ব্রেড স্কাউন্ড্রেল। মাত্র সাতদিনের অনুসন্ধানে আমি পাঁচপাঁচটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি, যাদের ও সর্বনাশ করেছে! তার ভিতর একটি মেয়ে সুইসাইড করেছে। তিনটির বিয়ে হয়ে গেছে। তারা লজ্জায় স্বীকার করেনি ওর অপকীর্তির কথা। পঞ্চম মেয়েটার পাত্তা আমি পাইনি। দীনবন্ধু বলেছিলেন, খুকি যদি অ্যাবর্শানে রাজি থাকে, তাহলে এটা কোনো সমস্যাই নয়। ঐ পাঁচটা মেয়ের ভাগ্য আমি ফেরাতে পারব না, কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ে যাতে বিপদে না পড়ে সে ব্যবস্থা করব। আমার বংশে যে কালি দিয়েছে তাকে....

অরুন্ধতী তার মামাকে চিনত। ধীর-স্থির কম কথার মানুষটিকে। পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিতে তাঁর চোখের পলক পড়ে না! আজ নিজের কাছে স্বীকার করে অরুন্ধতী—শুধু সেই কারণেই ও ভারমুক্ত হতে স্বীকৃত হয়নি!

যতই ঘৃণা করুক, কুণালকে সে ভালবাসত, ভালবাসে। ও জানত, সে ভারমুক্ত হলে কুণালের লাশ পুলিশে কোনোদিন খুঁজে পাবে না!

অরু রাজি হল না। ফলে, দীনবন্ধুও রাজি হতে পারলেন না। ঘোড়ার নাকটা শুধু জলে চুবিয়ে ধরেই ক্ষান্ত হননি, তাকে দিয়ে জল খাইয়েছিলেন যথারীতি! 'মিস-

ক্যারেজ' হয়ে ও যখন মরতে বসেছিল তখন কুণাল আসেনি। বস্তুত তখন ও কলকাতাতেই ছিল না। কিন্তু মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন এসে হাজির।

দীনবন্ধু সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন ভাগ্নিজামাইকে। পূর্বকথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন যেন: এসো, এসো, কুণাল। একটা খবর দিলে না কেন? স্টেশানে গাড়ি রাখতাম।

—না, ট্রেনে আসিনি আমি। এসেছি বাই রোড।

—গাড়িতে আর কেউ আছে নাকি?

—না আমি একাই। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল...

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! একটা ছেড়ে দশটা কথাই হবে। ওরে বাবলু, দেখ তো চাকর-বাকররা কে আছে। কুণালের গাড়ি থেকে মালপত্রগুলো নামিয়ে আনুক।

কুণাল বলে, ব্যস্ত হবেন না। গাড়িতে মালপত্র কিছু নেই। আমি উঠেছি দুর্গাপুরে টুরিস্ট লজে। আপনার সঙ্গে জরুরি কথাটা সেরে নিয়েই ফিরে যাব।

দীনবন্ধু গম্ভীর হলেন। বলেন, বেশ, তাই যদি তোমার ইচ্ছে, তাহলে বলো।

—আপনি আপনার ভাগ্নিকে একটু ডাকুন। আর কথাটা গোপন। কেউ যেন না ওভারহিয়ার করে।

দীনবন্ধু নিজেই উঠে গেলেন ভিতর বাড়িতে।

অরুন্ধতী তখন দ্বিতলে নিজের ঘরে একা বসে রেওয়াজ করছিল। দরজা খোলাই ছিল। হঠাৎ পাল্লাটা খুলে গেল। দেখা গেল, দ্বারপথে মাসিমা। ঠিক তার পিছনেই মামাবাবু।

মামিমা বললেন, খুকি...ইয়ে হয়েছে। তুই একটু নীচে নেমে আয়। কুণাল এসেছে। তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আচমকা কথাটা শুনে ও কেমন যেন অভিভূত হয়ে যায়। খণ্ডমুহূর্তের জন্য ও বোধহয় ভুলে গিয়েছিল—কুণাল ওর গোপন প্রেমিক নয়, স্বামী! ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখে তানপুরাটা। হাত বাড়িয়ে টেপ-রেকর্ডারটা বন্ধ করে দেয়। সেটায় ঢিমে তালে 'ত্রিতাল' বাজছিল ডুগি-তবলায়। ন'দা যখন থাকে না তখন ঐ যন্ত্রটাই তার সঙ্গে সঙ্গত করে। প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো দ্বারের দিকে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে মামা বলে ওঠেন, অত তাড়াহুড়ার কিছু নেই। শোন! ও যদি তোকে নিয়ে যেতে চায়, যাবি?

—যাব না?—অবাক বিস্ময়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছিল অরুন্ধতী।

—না। আমি কিছুই বলব না। যা তোর ইচ্ছা। তবে ছেলেটা যে কী জাতের...

অরু নীরব রইল।

—আর ও যদি ডিভোর্স দেওয়ার কথা বলে?

—আগে শুনি, দেখি কী বলতে চায়।

—ঠিক আছে। আয়।

তিনজনেই নেমে এলেন বাইরের ঘরে। পাশেই গেস্ট রুম। কিন্তু তার সঙ্গে কিছু অবাঞ্ছিত স্মৃতি জড়িত। তাই কুণালকে নিয়ে এসে বসানো হল ওপাশের একটা ঘরে।

মামা নিজেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। অরুন্ধতী আর মামিমা বসলেন পাশাপাশি। কুণাল অহেতুক একটা অপ্রিয় কথা বলল, আমি ঐ চেয়ারটায় বসব?

—বসো না, যেখানে খুশি।

—না, মানে আপনার কনসিলড টেপ-রেকর্ডারের মাউথপিসটা কোথায় তা তো ঠিক জানি না। এ চেয়ারে বসলে অসুবিধা হবে না তো কিছু?

অপমানে মানী লোকটার মুখখানা থমথম করছে। মামি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাতে বলেন, শুনলাম তুমি 'দুর্গাপুর লজ'-এ উঠেছ! এ আবার কী কথা?

কুণাল তাঁকে সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, আপনাদের টেলিগ্রামটা যখন যায়, তখন আমি কলকাতায় ছিলাম না। তাই সময় মতো...

—হ্যাঁ, শুনেছি। তুমি কাশ্মীরে বেড়াতে গেছিলে।

—শ্যামলবাবু এনকোয়্যারি করে জেনেছিলেন বুঝি? একা যাইনি, তাও?

কেউ এ-কথার জবাব দিলেন না।

কুণাল নিজে থেকেই বলে, যাক ও-সব অবান্তর কথা। যে-কথাটা বলতে এসেছি, সেটা বলি। আপনাকেই বিশেষ করে বলছি মিস্টার জানা, যে-আশঙ্কায় আপনি গুম খুনের হুমকি দিয়ে আমাকে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে যেতে বাধ্য করেছিলেন সে পাপ তো বিদায় হয়েছে। এখন আর অহেতুক সে জের টেনে লাভ কী? আপনি একটু উদ্যোগী হলেই আমরা দুজন মুক্তি পেতে পারি।

দীনবন্ধু গম্ভীর হয়ে বলেন, মাত্র সাতমাস হয়েছে, এখন আইনত ডিভোর্স পিটিশন...

কুণাল বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু আইন তো আপনার কাছে 'অবান্তর'। আপনি সচেষ্ট হওয়াতে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের দফতরে ব্যাক-ডেটেড দরখাস্ত ফাইল্ড্ হতে তো স্বচক্ষেই দেখেছি। ডিভোর্সের ঝামেলা করার কী প্রয়োজন? আপনি চেষ্টা করলে পাতাখানা বদলও তো করা যায়। আই মিন, কোনো প্রমাণ থাকবে না যে, আমরা দুজন...

দীনবন্ধু বললেন, কিন্তু আমি অহেতুক সে চেষ্টাই বা করতে যাব কেন?

—অহেতুক কেন? ভাগ্নিকে বন্ধনমুক্ত করতে। সেই শ্যামল ছেলেটার সাথে...

—আপনি নিজের বন্ধনমুক্তির কথা বলুন, মিস্টার চক্রবর্তী। আমার স্বার্থ আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

—অল রাইট! আমাকেই মুক্তি দিতে—

—কিন্তু আমার কী স্বার্থ?

—আমার পক্ষে যেটুকু কম্‌পেনসেশন দেওয়া সম্ভব...

—টাকা? অ্যালিমনি?

—আর কী-ভাবে?

—সেটা আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ফয়সালা হওয়ার কথা। আমার সেখানে কোনো ভূমিকা নেই।

—সেক্ষেত্রে আমি কি আমার লিগ্যাল স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে দু-একটা কথা বলতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে। উঠে এসো রমা...

সস্ত্রীক দীনবন্ধু বার হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কুণাল একটা সিগ্রেট ধরাল। বললে, তোমার মামা যদি রেজিস্ট্রারের পাতাটা পালটে দিতে পারতেন তাহলেই সবচেয়ে সুবিধা হত; কিন্তু তাতে উনি যখন রাজি নন তখন তুমি আমার বিরুদ্ধে অ্যাডালটারেশানের চার্জ আনো, ডিভোর্স পিটিশন করলে আমি কোনো ডিফেন্স দেব না।

অরুন্ধতী কঠিনস্বরে বলেছিল, শুনেছি, ইন্ডিয়ান ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে...

—আমি জানি। কাগজপত্র তৈরি করতেও কিছু সময় লাগবে। লিগ্যাল-সেপারেশনের হাঙ্গামা এড়ানো যাবে, যদি তোমার মামা সাক্ষী দেন যে, আমাদের বিয়েটা ‘কন্‌শুমেট’ হয়নি আদৌ। তা সত্যিই হয়নি। মিথ্যে সাক্ষী দিতে হবে না কাউকে। বিয়ের পরে এক রাত্রিও তুমি আমি এক ছাদের তলায় থাকিনি। কিছু খরচপত্র করতে হবে হয়তো। তাতে আমি রাজি। তোমার কিছু ক্ষতিও করেছি। আমার পক্ষে যেটুকু আর্থিক কম্‌পেনসেশন দেওয়া সম্ভব!

হঠাৎ ওর কথার মাঝখানেই অরুন্ধতী বলে বসেছিল, তুমি বিশ্বাস করবে কুণাল, আমি এসব কিছুই জানতাম না...আই মিন টেপ-রেকর্ডার, ক্যামেরা...

কুণাল ছাইটা ঝেড়ে মৃদু হেসে বললে, কী হবে সেসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

—তুমি বিশ্বাস করছ না? আমি মিথ্যে কথা বলছি?

—কেন এ নিয়ে জেদাজেদি করছ অরু? তুমি না জানালে ঐ পুলিশ-ইন্‌সপেক্টর কী ভাবে এমন সুচারুভাবে প্রি-অ্যারেঞ্জ করে আমার জন্য ফাঁদ পাতবে? এ কি হয়? ওসব বাজে কথা থাক। কাজের কথা বলো...

—কী কাজের কথা?

—বললাম তো। ডিভোর্সের কথা। অ্যালিমনির কথা—

—তুমি আমার যে সর্বনাশ করেছ তা কি টাকা দিয়ে মেটানো যায়?

কুণাল নরম হল। রাগারাগি করাটা কোনো কাজের কথা নয়। সে বন্ধনমুক্ত হতে এসেছে। অরুন্ধতী তাকে মুক্তি না দিলে তার পক্ষে রাকাকে বিবাহ করা সম্ভবপর নয়। অরুকে কোনোদিনই ভালবাসেনি সে, একটু খেলা করতে চেয়েছিল মাত্র। ঘটনাচক্রে সে খেলায় তার হাত পুড়েছে; কিন্তু সেই সুবাদে গোটা জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে পুড়িয়ে ফেলা যায় না। বললে, মানছি, তা মেটানো যায় না। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না...

—তাই তো বলছি। বিবাহ একটা অচ্ছেদ্যবন্ধন! তুমি যখন...

—ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না অরু। বিবাহ আদৌ 'অচ্ছেদ্যবন্ধন' নয়। ওসব 'ওল্ড ভ্যালুজ' এই বিংশ শতাব্দীতে অচল। তুমি জানো, আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে বিয়ে করিনি। আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল...

—শোনো! এখনি তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ। এখন তো তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। এখন এই নির্জনে আমার কাছে বলো তো...আমার সেই প্রশ্নটার জবাব দাও। যেটা সেদিন দাওনি—

—কী প্রশ্ন?

—তুমি আমাকে বলেছিলে কি না যে, তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও? তুমি উপার্জনক্ষম, বাবার মতামতকে তুমি থোড়াই কেয়ার করো। এসব কথা বলোনি?

কুণাল নির্বাক, সিগারেট টানতে থাকে। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না! অরুন্ধতী আবার বলে, আমি অপেক্ষা করছি, তুমি ঘরটাকে ভাল করে সার্চ করে দেখতে পারো, কোনো কনসিল্ড রেকর্ডার লুকানো আছে কি না।

—তুমি আমার উপর রাগ করে আছ!

—তুমি কি আশা করেছিলে অ্যালিমনির কথায় আমার ভালবাসা উথলে উঠবে? জড়িয়ে ধরে তোমাকে চুমু খাব? স্পষ্ট করে স্বীকার করো কুণাল—কেন ঐ সব মিথ্যা কথা বলেছিল সেদিন? সেই বহরমপুরের হোটেলটায়? একটা কুমারী নারীদেহ সম্ভোগ করবে বলে? আর আজ তুমি এ বাড়িতে চড়াও হয়ে আমাকে চার্জ করছ 'মিথ্যাবাদী' বলে! মিথ্যাবাদী কে? প্রবঞ্চক কে?

—আমি! আই অ্যাডমিট্‌। হল তো? তাই তো বলছি, এমন একটা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চকের কব্জা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতেই তো আজ ছুটে এসেছি দুর্গাপুরে! নাউ টেল মি...কত টাকা অ্যালিমনি নিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাও?

অরু দাঁড়িয়ে ওঠে। তার চোখ দুটো জ্বলছে। বলে, তোমাকে আমি মুক্তি দেব না! কোনোদিন না! এই তোমার শাস্তি! নাউ য়ু মে গো! ক্ষমতায় কুলায়, তুমি আমার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা এনো—অ্যাডালটারেশনের চার্জ এনো! আ'ল ফাইট ব্যাক!

ঘর ছেড়ে বার হতে চায়। কুণাল খপ করে ধরে ফেলে তার হাতখানা।

—হাত ছেড়ে দাও বলছি। আমি চেঁচাব!

—তুমি পরস্ত্রী নও অরু! কিন্তু এসব কী বলছ তুমি? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করে কী লাভ? আমাকে মুক্তি না দিলে তুমি নিজেও মুক্তি পাবে না!

—হাত ছেড়ে দাও বলছি!

কুণাল এবার ওর হাতখানা ছেড়ে দেয়।

অরুন্ধতী আঁচলটা সামলে নিয়ে বলে, আর কোনোদিন আমার সামনে এসো না।

সিগারেটের নিঃশেষিত স্টাম্পটা অ্যাশট্রের গর্ভে থেতলে দিয়ে কুণাল হাসতে হাসতে বলে, তা যে হবার নয় অরু! আমি এ বাড়ির জামাই। দেখলে না, 'দুর্গাপুর লজে' উঠেছি বলে মামিশাশুড়ি কত অনুযোগ করলেন!

অরুন্ধতী আগুনঝরা চোখে নির্বাক তাকিয়ে থাকে।

—আমি নিতান্ত অভাগা! তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাই বলো? যতদিন না মুক্তি দিচ্ছ এখানেই আমাকে বারে বারে ফিরে আসতে হবে। আফটার অল, তুমি আমার আইনসঙ্গত বৈধ স্ত্রী!

—তুমি ভেবেছ কী? মেয়ে মাত্রেই তোমার খেলার পুতুল? আবার যদি কোনোদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াও তাহলে কঠিন শাস্তি দেব আমি...

কুণাল পকেট থেকে একটা শৌখিন পিস্তল বার করে দেখায়; বলে, তোমার সেই পুলিস ইন্‌সপেক্টর পাতানো দাদাকে দিয়ে? আমি 'শিশুপাল' নই অরু! আমিও একটা লাইসেন্স করিয়েছি কিন্তু!

'শিশুপাল'। সে খবর ও জানল কেমন করে?

অরুন্ধতী দাঁতে-দাঁত চেপে বললে, না! পাতানো দাদাকে দিয়ে নয়। আমি নিজেই...

পিস্তলটা দূরে ঠেলে দিয়ে কুণাল নাটকীয়ভাবে বললে, দাও! আমি নিরস্ত্র। কথা দিচ্ছি, প্রতিবাদ করব না। কী শাস্তি দেবে দাও...আমি মাথা পেতে নেব...

—মনে রেখো কুণাল, প্রতিশ্রুতিটা শুধু মামাই দিয়েছিলেন। আমি দিইনি...

—প্রতিশ্রুতি! মানে?

—দ্বিতীয়বার যদি আমার সামনে কোনোদিন এসে দাঁড়াও তাহলে তোমার বাবার কাছে আমি ইনশিয়োর পার্সেলে পাঠিয়ে দেব আমাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেটের ফটোস্ট্যাট কপি।

কুণাল হঠাৎ সাদা হয়ে যায়।

অরুন্ধতী দ্বারের দিকে আঙুলটা তুলে বললে, নাউ ক্লিয়ার আউট!

বোঝেনি, কেউ বোঝেনি অরুর মনের কথা।

হ্যাঁ, ঐ আগুনবরণ ছেলেটাকে সে ভালবেসেছিল। তখন বোঝেনি—সেই দেবদুর্লভকান্তি ছেলেটা প্রেমের মিঠে মিঠে বুলি শোনাতে আসত একটা অনাঘ্রাতা নারীদেহ সম্ভোগ করবে বলে। প্রথম প্রেমের পুলকে মনে হয়েছিল—সে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমরের মতো—ওর কুমারীমনকে একটু ছুঁয়ে যাবে

বলে, ওর কণ্ঠে প্রেমের গান শুনবে বলে। মনে পড়ে যায় কতদিনের কত টুকরো কথা। আজ ওর স্বরূপটা বুঝতে পেরেছে। বন্ধনমুক্ত হবার জন্য সে একমুঠো টাকা হাতে আজ এসে দাঁড়িয়েছে অরুন্ধতীর দ্বারে। তার অনাঘ্রাতা দেহটা ওকে সম্ভোগ করতে দেবার পারিশ্রমিক! কানমাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। এক হিসাবে কুণাল যা বলেছে তা অনস্বীকার্য—ভুল ভুলই, আজ সে নিজেও ভুলটা বুঝতে পেরেছে। অতীতকে শোধরানো যাবে না। ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হলে ঐ পাষণ্ডটার নাগপাশমুক্ত হতে হবে তাকে। অ্যালিমনির প্রসঙ্গ না তুললে হয়তো সে নিজে থেকেই এ প্রস্তাব দিত। দিত কি? নিজের মনকে সে জানে না। ঐ ছেলেটাকে আজ সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে বটে, কিন্তু তার মৃত্যুকামনাও করতে পারে না। হ্যাঁ, মৃত্যুই। নৃশংস মৃত্যু। শ্যামলের প্রতিহিংসা নির্মম, নিষ্ঠুর। লম্পটটাকে সে ক্ষমা করেনি, কোনোদিন করবে না! প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে—সময় ও সুযোগমতো ওর উন্নত নাকটা সমতল করে দেবে। কিন্তু অরু চেনে তার ন'দাকে। নাকটা থেঁতলে দিয়েই সে থামবে না। সেই সেবার যেমন দেখেছিল স্বচক্ষে। শ্যামল প্রতিশোধটা নিতে পারেনি, নিতে পারছে না শুধু একটিমাত্র কারণে : যেহেতু অরুর শাঁখা-সিঁদুরের সঙ্গে ঐ পাষণ্ডটার প্রাণবায়ু অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ।

সে কথা তো স্পষ্টাক্ষরে বলেও ছিল একদিন—তুই জানিস না অরু! চড়টা মেরে তুই আমাদের দুজনেরই প্রাণ দিয়েছিস। নাহলে এতক্ষণে ওর মৃতদেহটা এখানে পড়ে থাকার কথা, আর তোর ন'দা হয়ে যেত ফাস্ট ডিগ্রি মার্ডারের আসামি!

শিশুপালের মৃত্যুদৃশ্যটা ও ভুলতে পারেনি। ভোলা যায় না বলেই! ঘটনাটা ঘটেছিল ওর চোখের সামনে। আজও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের মধ্যে নাটকটা পুনরাভিনীত হয়। একটা তরতাজা যুবকের রক্তাপ্লুত দেহ লুটিয়ে পড়েছিল পিচমোড়া সড়কের উপর; আর ওর নির্বিকার ন'দা—কী নৃশংস—বুট দিয়ে মৃতদেহটাকে উল্টে দিয়ে দেখেছিল, লোকটা জিন্দা না মুর্দা!

সাধারণ কন্‌স্টেব্‌ল্ থেকে সাব্-ইন্‌সপেক্টর পদে উন্নীত হওয়ায় শ্যামলের জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল নানান জাতের জটিলতা। থানার বড়বাবু, মানে বড় দারোগা, ওকে বিষ নজরে দেখতে শুরু করেছিলেন। আবদুল কাদের দুঁদে দারোগা; কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেননি, কোথায় ঐ ছোকরার খুঁটির জোর। কোন খুঁটির জোরে ওঁর অধঃস্তন মেড়াটি লড়ছে! না, দীনবন্ধু জানা নন! যতই প্রভাবশালী এম. এল. এ হোন না কেন—এ ভেল্‌কি দেখানোর হিম্মৎ তাঁর নেই—বিনা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায়, বিনা ফাইল চালাচালিতে সরাসরি উপর থেকে অর্ডার এনে চার-পাঁচজন সম্ভাব্য প্রতিযোগিতাকে সুপারসিড করে ওর প্রমোশনের ব্যবস্থা করা!

ওর সহকর্মীরাও ওকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে শুরু করেছিল।

শ্যামল তার ডিউটি বাজিয়ে যেত বড় দারোগার নির্দেশ মতো। কিন্তু মাঝে মাঝে সে ডুব মারত দু-চার-সাত দিনের জন্য। ছুটিতে নয়; 'অন-ডিউটি'! তার স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টের সুবাদে! এটা সহ্য হত না বড় দারোগার। হবার কথাও নয়। সে কোথায় যায়, কী করে, কিছুই জানা যেত না। অথচ চাকুরিসূত্রে তিনিই ওর 'বস'! উপরমহল কি তাঁরই বিরুদ্ধে ঐ ছোকরাকে টিকটিকি লাগিয়েছে? এমনটা তো হবার কথা নয়! সেজন্য 'ভিজিলেন্স' আছে, 'সি. আই. ডি' আছে—ওঁরই অধঃস্তন একটি কর্মীকে ওঁর পিছনেই এভাবে টিকটিকি নিযুক্ত করা পুলিশ বিভাগে অপ্রত্যাশিত। তাহলে ও ছোকরার ঐ 'স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট'টা কী জাতের। তা জানার উপায় নেই! শ্যামল মাঝে মাঝেই না-পাত্তা হয়ে যেত—তার জবাবদিহি, ট্যুর ডায়েরি হিসাবপত্র সে সরাসরি দাখিল করত উপরমহলে—'থ্রু প্রপার চ্যানেল' নয়—শুধু ফরোয়ার্ডিং চিঠির একটা নকল দাখিল করত স্থানীয় থানার দপ্তরে—তার অনুপস্থিতির জবাবদিহি হিসাবে।

বড় দারোগা মনে মনে ফুঁসতেন, কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না।

বিরোধ বাধল অন্য দিক থেকে। একটা স্থায়ী ব্যবস্থায় হাত পড়ায়।

দুর্গাপুর অঞ্চলে একটা কুখ্যাত অ্যান্টিসোশাল গ্যাং-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে।

দিন দিন তাদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলছিল। দলে ওরা দশ-বারো জন। সবাই উঠতি মস্তান। সকলেই সুপরিচিত। সকলের নামই আছে থানার খাতায়। কিন্তু কী জানি কেন, তাদের বিশেষ ঘাঁটানো হত না। ওদের কাজ-কারবার মূলত স্টেশান ইয়ার্ডে। ওয়াগন ব্রেকার্স। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে। বহু অভিযোগও জমা হয়েছে। থানা থেকে ওদের আস্তানায় বার কয়েক রেইড করা হয়েছে। শ্যামল নিজেও দু-একবার গেছে। কিন্তু হাতেনাতে কাউকে ধরা যায়নি। শ্যামলের ধারণা হয়েছে, ভূতটা আসলে আছে সর্ষের ভিতরেই। অর্থাৎ থানার বড় দারোগার নেপথ্য মদত আছে এর পিছনে। নাহলে প্রতিবারই 'রেইড'-এর আগে ওরা কীভাবে খবর পেয়ে যায়? কেমন করে আগেভাগেই সদলবলে সট্‌কে পড়ে? ক্রমে ঐ গ্যাংটার দৌরাত্ম্য শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছিল। ওদের দলের অনেককে দেখা যেত সন্ধ্যায় সিনেমা হলগুলোর সামনে প্রকাশ্যে টিকিট ব্ল্যাক করতে। এপাড়ায় ওপাড়ায় মেয়েদের উত্যক্ত করা হয়ে উঠল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হঠাৎ শহরের একান্তে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটে গেল একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি। ফ্যাক্‌টারির ক্যাশ-ভ্যান থামিয়ে কারা যেন রাহাজানি করল কয়েক লক্ষ টাকা। শ্যামলের ধারণা এর পিছনেও আছে ঐ একই গ্যাং—যার দলনেতা একটি দুঃসাহসিক মুসলমান যুবক : ইব্রাহিম।

বড়-দারোগা সে থিয়োরিটা মেনে নিতে পারলেন না। যথারীতি জোরদার পুলিশ

তদন্ত হল—কোনো কিছু ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পাওয়া গেল না। শ্যামল বড় দারোগার অনুমতি নিয়েই ওদের আস্তানায় সরেজমিন তদন্ত করে এল। কোনো কিছু সূত্রই খুঁজে পাওয়া গেল না। ইব্রাহিম গরুড়পক্ষীর মতো হাতদুটি জোড় করে হাসতে হাসতেই বললে, কেন বেহেদ্দো আমাদের পিছনে লাগিয়েছেন মাইতি-সাব! আমরা ছাঁ-পোষা মানুষ আছি!

বিশু পালের কোনো হদিশ সে পায়নি। চেষ্টার ত্রুটি নেই তার। গ্রুপ ফটো থেকে ঢেরা-চিহ্নিত লোকটার ছবি এনলার্জ করিয়েছিল। সেটা যে বিশুপালের এটা জানা গেছে—অজিতেশবাবু তা নিঃসন্দেহে শনাক্ত করেছেন। যে মেস্-এ বিশু পাল থাকত সেখানেও দু-একজন ছবি দেখে চিনতে পারল; কিন্তু বিশ্বনাথ পাল যে কোথায় থাকে, তার আদি নিবাসই বা কোথায় তা কেউ জানাতে পারল না। কলেজের মাধ্যমেও কোনো কিছু সূত্র পাওয়া গেল না। আর বিকাশ সেন বেমালুম বে-পাত্তা। সম্ভবত তার নামটাও মনগড়া, ঠিকানাটা তো বটেই।

ঐ সময়ে একটা কেস্-এ শ্যামল প্রায় হাতেনাতে ধরে ফেলল ইব্রাহিমকে।

সরকারি পি. ডাব্‌লু. ডি.-র গুদাম থেকে এক লরি সিমেন্ট পাচার হয়ে যাবার তদন্তে।

বড় দারোগা কাদের-সাহেবও বোধ করি টের পাননি—এটা ইব্রাহিমের দলের কাজ। তা জানতে পারলে হয়তো শ্যামলকে তদন্তে পাঠাতেন না।

সহজ কেস। সরকারি গুদামের দারোয়ান যে এজাহার দিল তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাত্রি দুটোর সময় কে একজন এসে ওর ছাপরায় কড়া নাড়ে—এ বাহাদুর! তোমার গুদামের তালা ভাঙা কেন?

বাহাদুর বাস করত গুদাম সংলগ্ন একটি এক-কামরার ঘরে। তার পাশের কামরাতেই থাকে কানাই—অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার সাহেবের আর্দালি। বাহাদুরের ঘুম ভেঙে গেল। সে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললে, কৌন?

—আমি হরি! তোমার গুদামের তালা খোলা কেন?

বাহাদুর দেখল লোকটার হাতে একটা টর্চ। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। 'হরি'কে সে চিনতে পারল না। বললে, তুম কৌন হো?

লোকটা সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, তোমার সিমেন্ট-গুদামের তালা ভাঙা, দরজা হাট করে খোলা। ব্যাপার কী?

বাহাদুর বিচলিত হয়ে পড়ে। টর্চ আর ভোজালিটা তুলে নিয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে।

তৎক্ষণাৎ তিন-চারজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাহাদুর ভোজালিটা বাগিয়ে ধরার সুযোগ পায়নি, কিন্তু মর্মান্তিক একটা চিৎকার করার সুযোগ পেয়েছিল। টর্চের স্তিমিত আলোয় সে দেখতে পেল ওর দরজার সামনে চার-পাঁচজন জোয়ান মানুষ।

তাদের হাতে ছোরা, হেঁসো, মায় পিস্তল! তাদের হুকুমে চাবির থোকাটা ওকে হস্তান্তরিত করতে হল। ওরা তার হাত-পা মোক্ষম করে বেঁধে ফেলে। মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে ফেট্টা বেঁধে দেয়। চোখ দুটো কিন্তু খোলা ছিল তার। দেখতে পেল, গুদামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি লরি। আট-দশজন লোক এগিয়ে গেল সিমেন্ট গুদামের দিকে। তালা খুলে একে একে বার করে আনে সিমেন্টের বোরা। আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এক লরি সিমেন্ট নিয়ে তারা উধাও হয়ে গেল। যাবার সময় ওর বাঁধন খুলে দিয়ে গেল না বটে, তবে চাবির থোকাটা ফেলে দিয়ে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে কানাইয়ের চোখের সামনে। বাহাদুরের চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই তার রক্ত হিম হয়ে যায়। পাশের কামরা থেকে সে সব কিছু লক্ষ করে, কিন্তু টুঁ শব্দটি করেনি। লোকগুলো লরিতে চেপে চলে যাবার পর সে সাহস করে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাহাদুরের বাঁধন খুলে দেয়।

বাহাদুর এবং কানাই দুজনেই এজাহার দিল—সবকটা ডাকাতের মুখে মুখোশ ছিল; কিন্তু লরি-ড্রাইভারের পাশে যে লোকটা বসে ছিল তার মুখে কোনো মুখোশ ছিল না। তাকে ওরা দুজনেই চিনতে পেরেছে ইব্রাহিম!

শ্যামল ডায়েরি লিখে নিল। ঘাঁত ঘোঁত তার জানাই। অচিরেই গ্রেপ্তার করেছিল সদলবলে ইব্রাহিমকে। অবশ্য উদ্ধার করতে পারেনি চোরাই মাল।

ইব্রাহিম রুখে উঠেছিল, আপনি হরবখৎ আমাকে হেনস্থা করছেন শ্যামলবাবু! আখেরে তাতে ভাল হোবে না কিন্তু। নুকসানই হোয়ে যাবে!

শ্যামল ব্যাটন দিয়ে প্রচণ্ড একটা আঘাত করেছিল এমন কায়দায় যাতে ব্যথা লাগে, দাগ থাকে না!

ইব্রাহিম মারটা হজম করেছিল। বলেছিল, ঠিক হ্যায়! আজ আপই কা মওকা!

আশ্চর্য! এমন জলজ্যান্ত কেস-এও ইব্রাহিমের সাজা হল না। বেকসুর খালাস পেল সে।

আইনত তাই পাওয়ার কথা।

ইব্রাহিমের মুরুব্বির জোর আছে। জামিন পেল অনায়াসেই। কিছুদিন পরে কেস উঠল আদালতে। সেখানে শ্যামল অবাক হয়ে দেখল আইনের ভানুমতী খেল্! কোর্ট ইন্‌সপেক্টার যে ধারায় ইব্রাহিম এবং তার সহকারীদের অভিযুক্ত করেছিলেন তা 'বার্গলারি'! আসামিপক্ষের উকিল মহামহিম বিচারককে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন—'বার্গলার' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'One who breaks into a house by night with an intent to commit felony?' আইনেরও তাই নির্দেশ—যে ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে তার নিগলিতার্থ : তালা ভেঙে বা সিঁদকেটে পরের ইমারতে প্রবেশ করে নিশাকালে পরস্বাপহরণ। এক্ষেত্রে বাদীপক্ষ প্রমাণ করতে পারেননি যে, ইব্রাহিম—এক : তালা ভেঙেছিল, দুই : সিঁদ কেটেছিল, তিন : পরের ইমারতে আদৌ পদার্পণ করেছিল।

মহামান্য বিচারক আইনের তুলাদণ্ডে দুপক্ষের যুক্তি তৌল করে রায় দিলেন : বেকসুর খালাস!

শ্যামল বড় দারোগাকে চার্জ করেছিল : আপনি কোন ধারায় অভিযোগটা আনছেন তা আমাকে আগে থেকে জানালেন না কেন?

আবদুল কাদের মৃদু হেসে বলেছিলেন, আপনি ভুল করেছেন মিস্টার মাইতি। কোন ধারায় চার্জ ফ্রেম করা হবে তা স্থির করেন কোর্ট ইন্‌সপেক্টার, দারোগা নয়...

—আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে? ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে না জানিয়ে?

কাদের সাহেব বলেন, মেজাজ খারাপ করবেন না মিস্টার মাইতি। আমি জানি, কেন আপনি ইব্রাহিম অ্যান্ড কোম্পানির উপর এতটা খাপ্পা। যেহেতু সে জানা-মশাইয়ের বিষ নজরে আছে। থানার ভিতর আপনাদের ঐ পলিটিক্সকে ঢোকাবেন না শ্যামলবাবু—প্লিজ!

অভিযোগটা মিথ্যা নয়। ইব্রাহিমের পিছনে গোপন মদত আছে সুনীল পাত্র মশায়ের। তিনিও দুর্গাপুর অঞ্চলের একজন তথাকথিত জননেতা—লেবার লিডার। দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা। অনেকগুলি শ্রমিক ইউনিয়ানের মাথা হচ্ছেন সুনীল পাত্র এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর প্রতিপক্ষ। পর পর দুবারই দীনবন্ধু জানার বিরুদ্ধে ইলেকশানে দাঁড়িয়েছেন এবং হেরেছেন।

শ্যামলের আর সহ্য হয়নি। বড় দারোগার মুখের উপর বলেছিল, আমিও আন্দাজ করতে পারি, কেন আপনি ইব্রাহিম অ্যান্ড কোম্পানির উপর এত সদয়! থাক, সেসব আলোচনা। এখন কী করবেন বলুন? তালা ভেঙে ওরা গুদামে ঢোকেনি বলেই তো ইব্রাহিম পার পেয়ে যেতে পারে না। নতুন করে চার্জ ফ্রেম করতে হবে...

আবদুল কাদের হাসতে হাসতে বলেন, সে গুড়ে বালি, মাইতি-সাহেব! বাহাদুর আর কানাই দুজনেই তাদের এজাহার উইথড্র করেছে। নতুন করে এফিডেবিট দিয়েছে যে, আপনি ভয় দেখিয়ে ওদের দিয়ে ইব্রাহিমের নামে মিথ্যে এজাহারটা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এই দেখুন...

কথা মিথ্যা নয়। ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওরা দুজনেই পৃথক পৃথক এজাহার দিয়েছে ঐ মর্মে। না, রাতের অন্ধকারে ওরা কাউকে চিনতে পারেনি। ঘটনার পরদিন তদন্তকারী অফিসার ওদের ভয় দেখিয়ে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে ঐ সব কথা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। ওরা কাউকে চিনতে পারেনি।

শ্যামল বুঝে উঠতে পারেনি—এটা কার কারসাজি। আবদুল কাদেরের হুমকি না কি সুনীল পাত্রের আর্থিক বদান্যতার। মোটকথা, ইব্রাহিম ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেল আবার।

বড় দারোগার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে থানা কম্পাউন্ডের বাইরে বেরিয়ে এসে

গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ নজর হল সামনে চায়ের দোকানে মস্তান পার্টির কয়েকজন বসে আছে বেঞ্চি দখল করে। থানা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই একজন এগিয়ে এল। পরনে লুঙ্গি, গায়ে লাল রঙের একটা স্পোর্টিং গেঞ্জি, গলায় একটা রুমাল বাঁধা। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চিনতে পারল শ্যামল—ইব্রাহিম।

লোকটা এগিয়ে এসে হাসিমুখে ওকে সেলাম করল, বললে, একটো বাৎ বলতে এলুম শালাবাবু...

—কী বাবু?—রুখে উঠেছিল শ্যামল।

ইব্রাহিম জিহ্বা দংশন করল, ঘাড়টা চুলকাল। সলজ্জে বলে, ইয়ারবন্ধুরা আপনাকে আড়ালে ঐ নামে ডাকে তো, তাই ঐ ফালতু বাৎটা জবানসে নিকলে গেছে! মানে, আপনি দীনু জানার শালা আছেন তো, তাই সবাই আপনার পেছনে...খয়ের, মুঝে মাফি কিয়া যায়, মাইতি সাব...

—বুঝলাম! তা কী কথা বলতে চাও আমাকে?

লোকটা যেন আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সলজ্জে ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললে, অগর কসুর যদি না লেন, তো একঠো বাৎ বাতাই?

—বলো না? বলতেই তো বলছি—

—আপনি স্যার, একঠো অ্যাম্‌প্লিফাই করে দিন...

—কী করে দিই?

—অ্যাম্‌প্লিফাই, দরখাস্ত! যে দুস্‌রা কোই থানাতে আপনাকে বদলি করে দিতে হোবে।

—বটে! তা সেই মর্মে আমি 'অ্যাম্‌প্লিফাই' করে দিলে তোমার কী সুবিধা ইব্রাহিম?

—হামার কী সুবিধা? সুবিস্তা তো আপনার! ইখানে আপনি কুছ্‌ কামাই করতে পারছেন না। 'এথি'-র ভাগ ভি পাচ্ছেন না, হামি জানে...বড় দারোগা সাব ভি আপনার উপর নারাজ আছে...

লোকটার ন্যাকামিতে জ্বলে উঠবার কথা। কিন্তু শ্যামল যে গুরুর শিষ্য তাতে রাগ হলেও তার বহিঃপ্রকাশ হয় না। হেসে বললে, আমি দুঃখিত ইব্রাহিম। তোমার পরামর্শ মতো বদলির জন্যে আমি কোনো 'অ্যাম্‌প্লিফাই' নিজে থেকে করব না। তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো। আমাকে অন্য থানায় বদলি করা যায় কি না।

—তো ঠিক হ্যায়। সেই ইন্তেজামই হামি করবে। লেকিন বদলির অর্ডার আসিয়ে গেলে আপনি মানে মানে কেটে পড়বেন তো?

শ্যামল গম্ভীর হয়ে বললে, সে-কথা এখনই দিতে পারছি না। বুঝতেই তো পারছ, দুর্গাপুর ছেড়ে যাবার আগে তোমার একটা হিল্লে করে যেতে হবে তো আমাকে!

ইব্রাহিমের পাশে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে তার দুই সহকর্মী। ঘটনাটা ঘটছে থানার ঠিক সামনেই। ইব্রাহিম অম্লানবদনে বললে, তাহলে একঠো সাফ্ বাৎ শুনয়ে দিই, শালাবাবু। দিনকাল খারাপ আছে। ইখানে উখানে পুলিশের লাশ ভি পড়ে থাকছে।

এবার স্তম্ভিত হয়ে যায় শ্যামল। কী প্রচণ্ড দুঃসাহসী লোকটা।

ইব্রাহিম বললে, বিস্‌ওয়াস্ না হোয় তো বড় দারোগাবাবুকে পুছ্ করে আসুন। উনি তো থানাতেই আছেন। আমি ইখানে খাড়া আছি।

শ্যামল কোনো প্রতিবাদ করেনি। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েছিল।

ঘটনাটা ঘটল দেওয়ালীর রাত্রে।

দীনবন্ধু তখন দুর্গাপুরে নেই। যাবার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন, দিনকাল খারাপ, সাবধানে থাকিস।

ইব্রাহিমদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। শ্যামলের কাছ থেকে ইব্রাহিমের সুপরামর্শের কথাও তিনি শুনেছিলেন; তাতেই এই সাবধানবাণী।

দেওয়ালীর রাত্রে দুর্গাপুরে একটা গানের জলসা হল। কলকাতা থেকে নামকরা গাইয়েরা আসবেন। উদ্যোক্তারা অনুরোধ জানিয়ে গেলেন অরুন্ধতীকে একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে। দীনবন্ধু অনুপস্থিত। মিসেস জানাই অনুমতি দিলেন, শ্যামলকে বিশেষ করে বলে দিলেন, সন্ধ্যারাত্রেই ফিরে আসতে। উদ্বোধনী সঙ্গীত শেষ হলেই।

কিন্তু অরু সেকথা মানবে কেন? কলকাতার স্বনামধন্য গাইয়েরা ওর পর গাইবেন। ন'দাকে সে বললে, আমি কিন্তু রাত দশটার মধ্যে ফিরব না ন'দা! হেমন্ত আর কণিকার গান শেষ না হলে...

শ্যামল বলেছিল, সে-সব আমি জানি না। দিদি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাত দশটা।

—ইস! দিদির হুকুম মতো চিরটাকাল চলেছ যেন?

—দীনুদা নেই, এখন দিদির কথাই তো মানতে হবে।

—না! তুমি যার হুকুমে চলবে তার নাম শ্রীমতী অরুন্ধতী! বুঝলে?

—বটে! আর মাঝরাতে যদি ছিনতাই পার্টি গাড়ি আটক করে? গত হপ্তায় শুনেছ তো...

—সেসব আমি জানি না! হেমন্ত আর কণিকার গান শেষ না হলে আমি কিছুতেই ফিরব না—এই সাফ বলে দিলাম কিন্তু।

অগত্যা তাই। অরুর হুকুম কোনোদিনই অমান্য করেনি। তবে দিনকাল খারাপ, জামাইবাবুর বারণটাও মনে আছে। তাই পাঞ্জাবির ডান পকেটে 'যন্তর'টা নিতে ভোলেনি। অরুর সাজপোশাকের কী ঘটা! কাঞ্জিভরম শাড়ি, ম্যাচ-করা ব্লাউস, খোঁপায় বেলকুঁড়ির মালা। ফুলের মালাটা ন'দাকেই কিনে আনতে হয়েছিল বিকালে। গায়ে গহনা অবশ্য যৎসামান্য—তাও সব ইমিটেশন। ছিনতাই পার্টির কল্যাণে

দুর্গাপুরের কোনো মেয়েই সে সময় সোনার গয়না গায়ে দুর্গাপুরের পথে বার হয় না—রাতবিরেতে তো নয়ই। শ্যামলের পোশাকও জলসার উপযুক্ত—কোঁচানো ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, শাল আর পায়ে চপ্পল।

হেমন্ত-কণিকার গান শেষ হতে রাত এগারোটা বেজে গেল। আরও অনেক শিল্পী তখনো বাকি। কিন্তু অরুর আর দেরি করতে সাহস হল না। মামি তাহলে আর কোনোদিন কোথাও যেতে দেবে না। জলসা থেকে তখন রওনা হল রাত তখন সওয়া-এগারোটা। এবার শীতটা একটু আগাম পড়েছে। অরুর গায়ে কোনো গরমজামা নেই, তাতে সাজের বাহারটা ঢাকা পড়ে যায়। শ্যামল বলল, তুই আমার শালটা জড়িয়ে বস। অরু রাজি হল না। বললে, দরকার হবে না। আমি দুদিকের কাচ উঠিয়ে দিচ্ছি। তোকেই বরং একটা পাল্লা খোলা রাখতে হবে, ড্রাইভিং সিগনাল দিতে। শালটা তোর কাছেই থাক। শ্যামল আর কথা বাড়ায়নি।

অরু বসল পিছনের সিটে। বরাবরই তাই বসে। যখন শ্যামল তাকে নিয়ে কোথাও যায়। অরুর পাশে রাখা আছে ডুগিতবলা বাঁয়া। তার কোলের উপর তানপুরার মাথাটা। তির্যকভঙ্গিতে তার বাকি অঙ্গ চলে গেছে ড্রাইভার সিটের পাশ দিয়ে। এভাবেই ওরা বরাবর যাতায়াত করে।

অমাবস্যার রাত। এক আকাশ তারা। এখানে-ওখানে আলোর রোশনাই। এখন রাত বেড়েছে। তবু দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে আকাশচুম্বী হাউই উঠে যাচ্ছে আকাশে, তারার ফুল ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারের মধ্যে। অনেক বাড়িতে সন্ধ্যারাতে জ্বালা হয়েছিল দীপাবলীর মালা। এখন তার অধিকাংশই নির্বাপিত—দু-চারটি পিদিম এখনো দপ্‌দপ্‌ করছে। রাস্তা ফাঁকা। শ্যামল স্পিডটা বাড়িয়ে দিল। দক্ষ ড্রাইভার সে। দীনবন্ধু জানার এই অ্যাম্বাসাডার নিয়ে সে লম্বা লম্বা খেপ মেরেছে। জি. টি. রোডে এত রাত্রেও প্রচুর গাড়ি। অধিকাংশই ট্রাক। প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে নিয়ে কেউ আসছে ইউ. পি. থেকে, কেউ পাঞ্জাব। বেনাচিতির মোড়ে জি. টি. রোড ছেড়ে শহর দুর্গাপুরে ঢুকল। এবার রাস্তা একেবারে ফাঁকা। জলসা এখনো ভাঙেনি। না হলে হয়তো এ পথেও দেখা যেত কিছু চক্রযান।

একটা বাঁকের মুখে ডান দিকে মোড় নিয়েই শ্যামল আচমকা ব্রেক কষল।

ঘ্যাঁ—চ করে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা।

অরুর একটু ঢুলুনি মতো এসেছিল। সে প্রস্তুত ছিল না আদৌ। সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তানপুরাটা...

শ্যামলের দোষ নেই। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এভাবে ব্রেক কষতে হয়েছে তাকে। সামনে, পথের উপর এড়ো-এড়ি করে পাতা আছে একটা শালবল্লা! গাড়িটা গতিহীন হতেই শ্যামল পিছন ফিরে বললে, কি হল? চোট লাগল নাকি?

—না, কিন্তু তানপুরাটা...

কথাটা অরুর শেষ হল না। শ্যামলের দিকে তাকাতে গিয়ে উইন্ড-স্ক্রিনের ওপাশে সে যেন ভূত দেখেছে!

শ্যামল সামনে ফেরে। দেখে গাড়িটার সামনে, শালবল্লার ওপাশে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে একসার ছায়ামূর্তি। চার-পাঁচ জন। তাদের পরনে চোঙা-প্যান্ট অথবা জিনস্। হাতে নানান জাতের অস্ত্র। লাঠি, টাঙি, হেঁসো, বল্লম! হেডলাইটের আলোয় ধাতব অস্ত্রগুলো চকচক করছে!

মুহূর্তে পরিস্থিতিটা বুঝে নেয়। ছিনতাই পার্টি! শালবল্লাটা ওরাই পেতে রেখে শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিল এতক্ষণ। শ্যামল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ব্যাক-গিয়ারটা টেনে দেয়। অ্যাক্সিলেটারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রচণ্ড বেগে ঘুরল পিছনের চাকা দুটো, সামনের দুটি চাকায় তার অনুরণন জাগল না। ছিনতাই পার্টির ব্যবস্থাপনা নিখুঁত। গাড়িটা নিশ্চল হতেই পিছনের দুটি চাকার তলায় ওরা ঠেসে দিয়েছে ভারী পাথর বা থান ইট! সে বাধা অতিক্রম করে গাড়ি পিছু হটল না।

ঠিক তখনই ডানকাঁধে তীক্ষ্ণ একটা আঘাত! শ্যামল ডাইনে ফিরল। সেদিকে হেড-লাইটের আলো পড়েনি। জানলা ঘেঁষে একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। তার একখানা হাত চলে এসেছে খোলা জানলা দিয়ে গাড়ির ভিতর। সে হাতে চকচকে একটা ধারালো ছোরা। যার আঘাতে ওর ডানকাঁধে একটা সামান্য ক্ষতচিহ্ন হয়েছে। পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গেছে। রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেছে।

অন্ধকারে লোকটাকে চেনার উপায় নেই! শুধু মনে হল, ওর মাথায় একটা কম্ফর্টার জড়ানো। চোখে গগল্স্ আর মুখে চাপদাড়ি। লোকটা সাবধানে তার হাতটা নামিয়ে আনে। ছোরার তীক্ষ্ণাগ্রভাগ শ্যামলের কণ্ঠ স্পর্শ করল। লোকটা হিসহিসে গলায় বললে, হেড লাইট অফ্ করে দে।

শ্যামল বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশ তামিল করল। নীরন্ধ্র তমিস্রায় চরাচর অবলুপ্ত হয়ে গেল।

—স্টার্ট বন্ধ কর। কি-বোর্ড থেকে চাবিটা বার করে নে।

অন্ধকারে এ আদেশ দুটোও পালন করল শ্যামল। উপায়ান্তর ছিল না তার। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই ছোরাটা ওর গলগণ্ডে লাগছে। বাঁ-হাতে জ্বলে উঠল একটা জোরালো টর্চ। বোধকরি স্বচক্ষে দেখে নিতে চাইল তার আদেশ পালিত হয়েছে কি না! এখন গাড়ির ভিতরে জোরালো আলো, বাইরে ঘনান্ধকার। ব্যাক-ভিউ আয়নায় শ্যামল দেখতে পেল—ভয়ে অরু সাদা হয়ে গেছে। তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সে জ্ঞান হারায়নি। তার কোলে তানপুরার ভাঙা খোলটা। আরও নজর হল, দুপাশ থেকে দুটি ছায়ামূর্তি পিছনের দরজা দুটো খুলবার চেষ্টা করছে, পারছে না। ভাগ্যক্রমে দুটোই ভিতর থেকে লক্ করা, আর কাচের পাল্লা দুটো ওঠানো আছে।

শ্যামল ছোরা-হাতে লোকটাকে বললে, কী চাও তোমরা? টাকাকড়ি কিছু নেই আমাদের কাছে।

লোকটা বললে, এটা কি সোনার?

'এটা' বলতে শ্যামলের পাঞ্জাবিতে আটকানো বোতামটা। সেটাকে চিহ্নিত করতে লোকটা আলতো করে একটা খোঁচা মারল শ্যামলের বুকে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্জরাস্থির মাঝখানে। গেঞ্জি ভেদ করে সাদা পাঞ্জাবিতে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু রক্তের ছোপ। যন্ত্রণাটা সহ্য করে শ্যামল বললে, না, রোল্ড গোল্ডের!

—তোর মানিব্যাগে রেস্তো কত আছে?

—জানি না। বিশ-ত্রিশ টাকা থাকতে পারে। তাতে আছে আমার আইডেন্টিফিকেশন কার্ড। আমি একজন পুলিশ-অফিসার।

—সাব-ইন্‌সপেক্টারকে অফিসার বলে না রে, শালাবাবু!

শালাবাবু! এরা তাহলে ইব্রাহিমের মস্তান পার্টি। শ্যামল দ্রুত চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। অন্ধকারে কাউকে ভাল চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু না—ইব্রাহিম বোধহয় এ-দলে নেই।

পিছনের যে ছেলে দুটো পাল্লা খুলতে পারছে না, তাদের মধ্যে একজন বললে, ওস্তাদ! ডালাটা ভিতর থেকে লক্ করা।

—আই সি। অ্যাই শুয়ার-কা-বাচ্চা! ঐ ছুকরিকে বল দরজাটা খুলে দিতে।

স্বজ্ঞানে নয়, যেন রিফ্লেক্স-অ্যাকশনে শ্যামল বললে, না।

লোকটা এবার আর খোঁচা মারল না। হেসে উঠল আচমকা। বললে, 'না' কি রে? মাল-কড়ি কিছু নেই বলছিস! ছুকরিটাকেও নামিয়ে দিবি না—তাহলে চলবে কেন? জান দিবি?

শ্যামল জবাব দিল না। লোকটাই বলল, তোকে জানে মেরে দেবার পর তো ছুকরিটাকে নামিয়ে নিয়ে যাব রে শালাবাবু। রুখবে কে? তোর ভূত?

চরমতম বিপদে পড়েও বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি শ্যামলের। এখন কালহরণের পথেই একমাত্র মুক্তির সম্ভাবনা। কথা কাটাকাটি করতে করতে যদি কিছুটা সময় যায় আর তার ভিতর যদি আর একখানা গাড়ি এসে পড়ে তাহলে পরিস্থিতিটা বদলে যেতে পারে। তাই বললে, বোতামটা রোল্ড গোল্ডের কিন্তু আমার হাতের ঘড়িটা দামি। টিসট। এটা দিয়ে দিচ্ছি—আমাদের ছেড়ে দাও।

ওস্তাদ টোপটা খেল। বললে, তাই দে তাহলে—

শ্যামল মণিবন্ধ থেকে হাতঘড়িটা খুলে ওর ডান হাতে দিতে চাইল। লোকটা খলিফা। ডান-হাতে ওর ছোরা—তাই বাঁ-হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা নিল। লোকটা কথা বলছে, পিছনের অন্যান্য সঙ্গীকেও নির্দেশ দিচ্ছে কিন্তু শ্যামলের চোখে চোখ রেখে। আর তার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতখানা সবসময় উদ্যত রেখেছে। ছোরার ডগাটা সর্বসময়

ওর কণ্ঠনালী থেকে দু-আঙুল তফাতে। শ্যামলের ডান পকেটে আছে মারণাস্ত্রটা— কিন্তু সেদিকে হাত নাড়াবার কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া দলে ওরা সাত-আটজন—খুব সম্ভবত ওদের কাছেও আছে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র, কিন্তু...

—ঐ ছুকরির গায়ে যে গহনাগুলো...সেগুলো কী? সোনার?

শ্যামল বললে, আমি জানি না। ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো।

পিছনের ছেলেটা বললে, এসব খেজুরে আলাপ করে কেন টাইম নষ্ট করছ ওস্তাদ? হারামজাদাটাকে বলো ওর বোনটাকে নামিয়ে দিতে। আমরা নিজেরাই দেখে নেব ঝুটো কি সাচ্চা!

'বোনটাকে'! তার মানে ওরা শুধু শ্যামলকে নয়, অরুকে চেনে। ওদেরই ধরবে বলে এভাবে ফাঁদ পেতে বসে ছিল এতক্ষণ! এটা নিছক ছিনতাই নয়—ইব্রাহিমের প্রতিশোধ! শ্যামলকে হত্যা আর অরুন্ধতীকে অপহরণের পরিকল্পনাই ওদের চূড়ান্ত লক্ষ্য! কিন্তু তাহলে ছুরিটা বিদ্ধ করছে না কেন ওর গলায়? একটাই উত্তর হতে পারে এ প্রশ্নের—জিন্দা শ্যামলের চোখের সামনে তার বোনকে বেইজ্জত করতে চায় বোধহয়, বিবস্ত্রা করতে চায়—না হলে শুধু হত্যাকাণ্ডে ওদের পৈশাচিক উল্লাসটা তৃপ্ত হবে না!

শ্যামল বললে, তোমাদের মধ্যে ইব্রাহিম কার নাম?

—কেন রে? জান ভিখ্ মাংবি তার কাছে?

এই মর্মান্তিক মুহূর্তে শ্যামলের মনে পড়ে গেল শরদিন্দুর লেখা একটা অনবদ্য কাহিনী; 'রক্তসন্ধ্যা'! মীর্জা দাউদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল দা-গামা! স্ত্রী-কন্যাকে হার্মাদের হাতে সমর্পণ করার পরিবর্তে মীর্জা দাউদ তাল তাল সোনা দিতে চেয়েছিল বোম্বেটেটাকে। দা-গামা রাজি হয়েছিল—এ লোকটা হবে না।

ওস্তাদ এবার বললে, পিছনের পাল্লাটা খুলে দে। ছুকরিটাকে নেমে আসতে বল।

শ্যামল বললে, শোনো! তোমাকে তখন মিছে কথা বলেছিলাম। আমার মানিব্যাগে শ-চারেক টাকা আছে। ঘড়িটা দিয়েছি, টাকাটাও দিচ্ছি। আমাদের ছেড়ে দাও।

এবারও টোপটা খেল ঐ ওস্তাদ নামের লোকটা। বললে, তো দে?

—কিন্তু টাকাটা নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেবে তো?

—আগে গুনে দেখি মালকড়ি কী আছে—

শ্যামল তার ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল পাঞ্জাবির পকেটে। লোকটা ওর চোখে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে। শ্যামল এমন ভঙ্গি করল যাতে মনে হল মানিব্যাগটা ওর পকেটে আটকে গেছে। একটু টানাটানি করে পকেটটা উঁচু করে তার ভিতর থেকেই টেনে দিল ট্রিগারটা।

অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলিটা লেগেছে ঝুঁকে থাকা লোকটার চিবুকের নীচে। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করেই শুধু নয়, গাড়ির ছাদ ফুটে করে বেরিয়ে গেল সিসার গোলকটা। ওর

বাঁ হাতের জ্বলন্ত টর্চটা লুটিয়ে পড়ল শ্যামলের কোলে, কিন্তু মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতের ছোরাটা খুলল না আদৌ। লোকটা উলটে পড়ল রাস্তায়।

প্রচণ্ড শব্দে আর ওস্তাদের উল্টে পড়ার শব্দে খণ্ডমুহূর্তের বিহ্বলতা। সবার আগে সংবিৎ ফিরে পেল যে-লোকটা উঠে বসেছিল বনেটের উপর। তার হাতে একটা টাঙ্গি। তাই দিয়েই সে প্রচণ্ড আঘাত করল উইন্ড স্ক্রিনে। ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙে পড়ল কাচের টুকরো। সেই ফোকর দিয়ে শ্যামল দ্বিতীয়বার ফায়ার করল। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। লোকটা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ঠিক তৎক্ষণাৎ তৃতীয় একটা ফায়ারিং। ওটা শ্যামলের রিভলবার থেকে নয়। বামবাহুমূলে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সে। শ্যামল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—যে লোকটা পিছনের দরজা খুলবার চেষ্টা করছিল এতক্ষণ, তার হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র—তা থেকে তখনো ধোঁওয়া বার হচ্ছে। শ্যামল তৃতীয়বার ফায়ার করল। এ লোকটাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রক্তঝরা বাঁ-হাতে শ্যামল অরুকে ঠেসে ধরল সিটের নীচে। অরু বুঝল। পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। শ্যামল হেড লাইটটা জ্বেলে দিল। দেখল—তিন-তিনটে লোককে মাটি নিতে দেখে বাদবাকিরা রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। বোধকরি ওদের কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই!

মিনিট-খানেক অপেক্ষা করল শ্যামল। না, কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। টর্চের আলোটা সে চারিদিকে ঘুরিয়ে ফেলল। না, পিস্তল-রেঞ্জের ভিতর জনমানব নেই। এবার পিছন ফিরে বলল, অরু, ওঠ। তোর চোট লাগেনি তো কোথাও?

অরুন্ধতী ভাষা খুঁজে পায়। বলে, না, কিন্তু তোমার...তোমার বুকে যে রক্ত!

—ও কিছু নয়।

ডান দিকের দরজা খুলে এবার সে নেমে আসে। জলসায় ছবি তুলবে বলে শ্যামল ক্যামেরা নিয়েই বেরিয়েছিল। সেটা দারুণ কাজে লেগে গেল 'ফ্ল্যাশ্‌গান' থাকায় অসুবিধা হল না কিছু। সাত-আটটি ছবি তুলল সে। তারপর বুট দিয়ে তথাকথিত ওস্তাদ লোকটাকে উল্টে দিল, তার ছবি নেবে বলে। লোকটার বাঁহাতে তখনো ধরা ছিল শ্যামলের রিস্টওয়াচ। তুলে নিল সেটা। লোকটার হিপ-পকেটে একটা পিস্তল। আশ্চর্য! তাহলে সে ছোরা বাগিয়ে ধরেছিল কেন? হঠাৎ কী সন্দেহ হল শ্যামলের, লোকটার চশমাটা টেনে খুলে ফেলল। চাপদাড়িটাও। ক্যামেরার ফ্ল্যাশগানে ক্ষণিক আলোয় বজ্রাহত হয়ে গেল শ্যামল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না সে : লোকটা ইব্রাহিম।

সেই আধা-বাঙালি আধা-বিহারি মস্তানটা—যার ধারণা 'দরখাস্ত'-র ইংরেজি 'অ্যাম্‌প্লিফিকেশন'।

রাত প্রায় বারোটা। থানা জনমানবহীন। বেঞ্চির উপর শুয়ে ছিল একটা কনস্টেব্‌ল। শ্যামলকে দেখে হুড়মুড় করে উঠে বসল, কী হয়েছে স্যার? আপনার বুকে রক্ত কেন?

—থানায় বড়বাবু আছেন?

—না স্যার! কেন, কী হয়েছে?

শ্যামল জবাবদিহি করল না। পিছন ফিরতেই কনস্টেব্‌ল্‌টা বললে, বড় দারোগাসাহেব গানের জলসায় গেছেন। বাড়িতেও নেই।

শ্যামল বললে, ফার্স্ট এইডের বাক্সটা নিয়ে এসো তো।

না, গুলিটা ওর বামবাহুতে বিদ্ধ হয়নি। খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে তির্যক পথে বেরিয়ে গেছে। কনস্টেব্‌ল্‌টা বুদ্ধিমান। আর কিছু প্রশ্ন করল না। সাহায্য করল প্রাথমিক চিকিৎসায়। ব্যান্ডেজটা বাঁধবার অবকাশে শ্যামল বললে, আর কাউকে ডেকে তোলো। তাকে ডিউটিতে রেখে তুমি যতীশবাবুকে খবর দাও। বলো যে, আর্যভট্ট রোডে ক্যাপ্টেন লাহিড়ীর বাড়ির কাছাকাছি তিনটে ডেডবডি পড়ে আছে। ওদের থানায় তুলে নিয়ে আসতে। আমি কাদেরসাহেবের কোয়ার্টার্সে যাচ্ছি, সেখানে তাঁর দেখা না পেলে সোজা চুঁচুড়ায় চলে যাব—ডি. আই. জি-সাহেবের বাড়িতে। খবরটা যতীশবাবুকে জানিয়ে দিয়ো।

যতীশ সেন সেকেন্ড-অফিসার।

কনস্টেব্‌ল্‌টা বললে, এফ. আই. আর. দেবেন না?

—এখন নয়। ফিরে এসে।

—খুন হয়েছে কারা? চিনতে পারলেন?

—যতীশবাবু চিনবেন। আমি চললাম!

—আপনার গাড়ির সামনের কাচ তো চুরমার হয়ে গেছে। গাড়ি চলবে?

—চলবে।

শ্যামল উঠে বসল গাড়িতে। অরুকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ থানায় চলে এসেছিল। অরুর সনির্বন্ধ অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। ফার্স্টএইডও নেয়নি তখন। ও বুঝতে পেরেছিল বাড়ির লোকজন জানবার আগেই কেটে পড়তে না পারলে অনিবার্যভাবে দেরি হয়ে যাবে। নানান কৈফিয়ত—তা ছাড়া এই রক্তাপ্লুত অবস্থায় দিদি হয়তো ওকে যেতেই দেবে না। অথচ রক্তাপ্লুত এই অবস্থাটার একটা 'এভিডেন্স' পরে আবশ্যিক হয়ে পড়বে। থানার কোনো লোককে প্রত্যক্ষদর্শী করে রাখা ভাল—এমন অবস্থায়, যখন ও পোশাক বদলায়নি, ঘটনার অব্যবহিত পরের অবস্থার বিষয়ে এজাহার দেবার মতো একজন লোক। সেটা বাড়ির লোক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিন-তিনটে খুন! সহজ কথা নয়! আত্মরক্ষার্থে সে গুলি চালিয়েছে—নিজের মান বাঁচাতে, বোনের ইজ্জত বাঁচাতে! কিন্তু এ তথ্যটা আদালতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। অনেকগুলো ফটো নিয়েছে, তা হোক ওর বিরুদ্ধে দু-দুটি শক্তির কথা ও কিছুতেই ভুলতে পারছিল না—

এক : যারা খুন হয়েছে তারা বিপক্ষ রাজনৈতিকদলের অনুগৃহীত মস্তান।

দুই : ইব্রাহিম লোকটা মুসলমান। কাদের সাহেবের স্নেহধন্য। কাদের সাহেব এ ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন জানা নেই—একটা কাফেরের হাতে ইব্রাহিমের মৃত্যু!

কাদের সাহেবকে ঘটনাচক্রে বাসায় পাওয়া গেল। গানের জলসা থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন। ধড়া-চূড়া খুলে শয্যাগ্রহণ করেননি। ঐ অবস্থায় শ্যামলকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি : একী! কী ব্যাপার?

শ্যামল সংক্ষেপে ঘটনাটা বিবৃত করল।

কাদের-সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। শ্যামলের ক্ষতস্থান, রক্তাপ্লুত পাঞ্জাবি দেখলেন। টর্চ জ্বেলে অ্যাম্বাসাডার গাড়িটাকেও অত্যন্ত দ্রুত পর্যবেক্ষণ করলেন। তার সামনের উইন্ড-স্ক্রিণ চূর্ণবিচূর্ণ। ড্রাইভারের সিটের উপরে গাড়ির ছাদে একটা ফুটো। বললেন, আপনার রিভলভারটা দেখি?

সেটাকেও পরীক্ষা করলেন, তিনটি বুলেট ব্যয়িত হয়েছে, তিনটি চেম্বার ভরা।

জানতে চাইলেন, এর লাইসেন্স কার নামে? দীনুবাবুর?

—হ্যাঁ।

—আপনার কেরিয়ার লাইসেন্স আছে?

—নিশ্চয়ই। কেন, আপনি জানেন না?

কাদের বললেন, চলুন, থানায় চলুন, আপনার এফ. আই. আর এখনই লিখে নিতে হবে। ডেডবডি কালেক্ট করতে গাড়ি গেছে?

—জানি না। আমি হরিনাথকে বলে এসেছি যতীশবাবুকে খবর দিতে। এতক্ষণে তিনি রওনা হয়ে গেছেন নিশ্চয়। রিভলভারটা দিন—

সেটা তখনো কাদের-সাহেবের হাতে। উনি বললেন, না, এটা এখন থানায় জমা থাকবে। থানায় চলুন, রসিদ লিখে দিচ্ছি। এটা একটা এভিডেন্স...

শ্যামল থমকে গেল। বললে, কী বলছেন? এটা থানায় জমা থাকবে মানে? আপনি বুঝতে পারছেন যে, ইব্রাহিম খুন হয়েছে। তার দলের লোকেরা এখন আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে! এ অবস্থায় নিরস্ত্র অবস্থায়...

—আপনি ছুটি নিন। বাড়ি থেকে বার হবেন না। কিন্তু আমি এটা আপনাকে এখন ফেরত দিতে পারি না। উঠুন, জিপে উঠুন।

যে জিপটাতে চড়ে উনি এইমাত্র জলসা থেকে ফিরে এসেছেন সেটা তখনো ওঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

শ্যামল বুঝল, জিনিসটা অন্য খাতে বইছে। কাদের-সাহেবের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক ওর কোনোকালেই ছিল না। থানার অন্যান্য প্রত্যেককে উনি নাম ধরে ডাকেন, 'তুমি' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করেন। একমাত্র ব্যতিক্রম এই শ্যামল মাইতি। হেতুটা কী, জানা যায়নি—শ্যামল স্ট্যান্ডিং এম. এল. এ. দীনবন্ধু জানার দক্ষিণহস্ত বলে নয় সম্ভবত—হেতুটা আরও গভীরে। কাদেরের আশঙ্কা ঐ ছোকরার

খুঁটি বাঁধা আছে আরও কোনো উপর মহলে। সেই অজ্ঞাত ব্যাপারটার জন্যই তিনি ওর সঙ্গে বরাবর একটা দূরত্ব রেখে চলতেন।

শ্যামল বললে, আমার যা এজাহার তা আপনাকে মৌখিক জানিয়েছি। কাল সকালে আমি থানায় এসে লিখিত এজাহার দিয়ে যাব। এখন আমার অন্যত্র কাজ আছে।

—অন্যত্র মানে? কোথায়?

—আমি চিনসুরা যাব। এখনি। ঐ গাড়ি নিয়ে।

কাদের দৃঢ়স্বরে বললেন, আয়াম সরি, মিষ্টার মাইতি। প্রথমত ঐ গাড়িটাও একটা মারাত্মক এভিডেন্স। ওটা থানায় জমা থাকবে। থানায় এজাহার দেবার পর আমি নিজে আপনাকে আমার জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দেব। দ্বিতীয়ত, য়ু কান্ট লিভ দুর্গাপুর নাউ!

শ্যামল রুখে ওঠে, আপনি কি আমাকে মার্ডার-চার্জে অ্যারেস্ট করতে চাইছেন?

—নিশ্চয় না। কিন্তু আপনাকে স্টেশান লিভ করতে বারণ করছি!

শ্যামল তৎক্ষণাৎ বললে, আয়াম সরি স্যার। আমাকে এখনি চুঁচুড়ায় যেতে হবে—

—আমার অর্ডার ডিফাই করে? ঐ গাড়ি নিয়ে? আমি গাড়িটা সিজ করতে চাই জেনেও?

—না! গাড়িটাকে আপনি সিজ করলে, জিপটাকে দিন। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে!

—আপনি আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দেননি, মিস্টার মাইতি। আপনার 'বস'-এর অর্ডার ডিফাই করে?

শ্যামল পূর্ণদৃষ্টিতে ওঁর চোখে-চোখে তাকাল। একটা সর্বনাশের ছায়া দেখতে পেল সেখানে! আবদুল কাদের এতদিন পরে একটা সুযোগ পেয়েছেন। ঐ ছোকরাকে এবার কব্জা করতে চান। কে-জানে কেসটাকে উনি অন্যভাবে সাজাতে চাইবেন কি না! অর্থাৎ শ্যামল নিজের জান বাঁচাতে বা বোনের ইজ্জত রাখতে এই হত্যাকাণ্ডটা করেনি। করেছে পোলিটিক্যাল মোটিভ নিয়ে। যেহেতু...

—ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন মিস্টার মাইতি। য়ু কান্ট ডিফাই য়োর 'বস'-এস্ অর্ডার্স!

শ্যামল উত্তেজিত হয়নি। হয় না। ঠান্ডা মাথাতেই জবাব দিল, আমার উপায় নেই মিস্টার কাদের। আমি আপনার অর্ডার অমান্য করছি বাধ্য হয়ে, আপনার 'বস'-এর অর্ডার তামিল করতে!

—তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?

—এই মুহূর্তে আমাকে চিনসুরা যেতে হবে—আমার 'স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে'র জন্য! আমাকে যদি আটকে রাখেন, কিংবা অ্যারেস্ট করেন, তাহলে য়ু উইল জাস্ট বি ডিফাইং য়োর ঔন বস-এস অর্ডার্স!

কাদের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নির্বাক তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

—রিভালভারটা ফেরত দেবেন?

—নো!

—অলরাইট! অ্যাজ য়ু প্লিজ!

শ্যামল উঠে বসল তার ভাঙা অ্যাম্বাসাডারে।

পরমুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। নিস্ফল আক্রোশে সেদিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন থানার বড় দারোগা।

চুঁচুড়ায় ডি. আই. জি-সাহেবের বাড়ির সামনে যখন গাড়িটা এসে দাঁড়াল রাত তখন আড়াইটে। ভেবেছিল নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে বড় সাহেবকে ডেকে তুলতে হবে। দেখা গেল ওর আশঙ্কা অমূলক। নীহারবিন্দু বাঁড়ুজ্জে জেগে আছেন। বাইরের ঘরেই। টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে কী সব লিখছেন। ওর গাড়িটা গেটের সামনে এসে পৌছাতেই দারোয়ান বিনা প্রশ্নে গেটটা খুলে দিল। ও গাড়িটা পার্ক করে নেমে এসেই দেখে—নীহারবিন্দু দাঁড়িয়ে আছেন পোর্টিকোতে, ওর প্রতীক্ষায়। তাঁর গায়ে একটা উলেন গাউন, মুখে পাইপ।

রক্তাপ্লুত দেহে শ্যামল এগিয়ে এল। যদিও তার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, শাল, পায়ে চপ্পল, তবু অ্যাটেনশান হল সে। নীহারবিন্দু এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে প্রথমেই বললেন, হ্যাভ য়ু টেকেন ফার্স্ট এইড়?

—ইয়েস স্যার?

—তুমি শারীরিক সুস্থ?

—ইয়েস স্যার!

—এসো তাহলে। ঘরে এসে বসো। উইন্ড স্ক্রিনটা ভাঙা, তুমি ঠান্ডা হাওয়ায় একেবারে কালিয়ে গেছ। বসো! লাইক টু হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক? হুইস্কি অর ব্র্যান্ডি?

শ্যামল পায়ে পায়ে উঠে এসে বসল ওঁর ড্রইং রুমে একটা চেয়ারে। বললে, নো স্যার, থ্যাঙ্কস্, একটু গরম কফি...

—শিয়োর!—বেল বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে সেই মর্মে আদেশ দিয়ে ওর দিকে ফিরে বললেন, আমি মোটামুটি খবরটা জেনেছি। দুর্গাপুর থেকে ওরা রেডিও-টেলিফোনে জানিয়েছে।

শ্যামল বললে, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং স্যার, আমি একটু ঘাবড়ে গেছি। আমার সিক্স্থ সেন্স বলছে, আমাকে বিপদে জড়িয়ে ফেলার একটা চেষ্টা হবে, অর্থাৎ সেল্ফ ডিফেন্সে নয়, আমি ইব্রাহিম আর তার দলের দুজনকে গুলি করেছি অন্য উদ্দেশ্যে, পোলিটিক্যাল মোটিভেশনে, যেহেতু আমার ভগ্নীপতি...

—আই নো, আই নো! কাদেরের উচিত ছিল তোমার রিভলভারটা সিজ করে আর একটি সার্ভিস রিভলভার ইস্যু করা। জি. টি. রোডে কেউ যদি... ওয়েল, যা হোক তুমি নিরাপদে এসে পৌছে এটাই বড় কথা। এখনি আমার কাছে বিস্তারিত বলতে পারবে, না য়ু নিড সাম রেস্ট?

—না স্যার! আমি সুস্থই আছি। শুনুন...

গরম দু-পাত্র কফি ইতিমধ্যে নামিয়ে রেখে গেছে খিদ্‌মদগার। সেটা পান করতে করতে শ্যামল আনুপূর্বিক ঘটনাটা বিস্তৃত করল। উপসংহারে বলল, বিশ্বাস করুন স্যার, লোকটাকে জীবিত অবস্থায় আমি চিনতেই পারিনি। ওর মুঠোয় ধরা ছিল আমার হাতঘড়িটা। সেটা তুলে নিতে গিয়ে ওর মুখে টর্চের আলো ফেলেছিলাম। তখনি মনে হল, ওর মুখের ফেস-কাটিংটা চেনা-চেনা। অন্ধকারে ওর গগল্‌স্‌ আর দাড়িটা খুলে নেবার পরই একটা ফটো নিলাম। ফ্ল্যাশগানের আলোয় হঠাৎ চিনতে পারলাম—লোকটা ইব্রাহিম! কিন্তু এখনো আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বাট হোয়াই? কেন?

—ইব্রাহিম আধা-বাঙালি, আধা-বিহারি। অথচ পরিষ্কার বাংলাতে কথা বলছিল আমার সঙ্গে। ইব্রাহিম ইংরেজি জানত না, অথচ এ নির্ভুল উচ্চারণে আমাকে হুকুম করেছিল—'হেড-লাইট অফ্‌ করে দিতে', 'কী বোর্ড থেকে চাবিটা বার করে নিতে।' ওর সঙ্গী যখন বলেছিল পিছনের দরজাটা 'লক' করা, তখন ইব্রাহিম বলেছিল 'আই সি!'

—আমাকে খোলাখুলি বলো তো শ্যামল—তুমি কেন মনে করছ কাদের তোমাকে মার্ডার চার্জে ফাঁসাতে চাইছে?

শ্যামল ইতস্তত করল না। বললে, দুটো কারণ। এক নম্বর, আমার মনে হয়েছিল, ইব্রাহিমের দলটার উপর কাদের-সাহেবের একটা সফ্‌ট্‌ কর্নার আছে! কারণটা আমি জানি না, কিন্তু সেই পি. ডাব্‌লু. ডি-র সিমেন্ট চুরির ব্যাপারে যে ফল্‌স্‌ চার্জে ইব্রাহিম খালাস পেয়ে গেল...

ওকে বাধা দিয়ে নীহারবিন্দু বলেন, ফর য়োর ইন্‌ফর্মেশন শ্যামল, কোর্ট ইন্‌সপেক্টার 'বার্গলারি'র চার্জ এনেছিল কাদেরের সাজেস্‌শান অনুযায়ী নয়, আমারই নির্দেশে...

শ্যামল স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, কেন স্যার?

—কেন, তা এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি দুটো হেতুর কথা বলছিলে। দ্বিতীয়টা?

—দ্বিতীয়টা যেহেতু ইব্রাহিম লোকটা মুসলমান, একজন কাফেরের হাতে...

এবার ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান বলে ওঠেন, ফর য়োর ইনফর্মেশন শ্যামল, যে লোকটা তোমার হাতে প্রথম খুন হয়, সে মুসলমান নয়, হিন্দু...

—ও ইব্রাহিম নয়?

—ইব্রাহিমই! দুর্গাপুরে তার সেটাই ছিল নাম আর পরিচয়। আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ল্ডে ওর অষ্টোত্তর শতনাম আছে। তবে লোকটা হিন্দু। তুমি তার দু-একটা নাম জানো। তার একটা হচ্ছে বিশ্বনাথ পাল! আর একটা শিশু পাল!

শ্যামল বজ্রাহত!

'দীঘা টুরিস্ট লজ'-এর কম্পাউন্ডে ঢুকেই নজর হল অনেকগুলি গাড়ি পার্ক করা। শনি-রবি ভিড় লেগেই থাকে। বিশেষ এখন সিজন-টাইম। গাড়িটা পার্ক করে শুধু অ্যাটাচি-কেস হাতে কুণাল এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে। রিজার্ভেশন-কাউন্টারে বসে ছিল যে ছেলেটি সে ইংরেজিতে বললে, অত্যন্ত দুঃখিত স্যার, একটা ঘরও খালি নেই।

কুণাল হাসতে হাসতে সাদা বাংলায় বললে, আছে ভাই, আছে। ডব্‌লবেড-এর একটা ঘর শবরীর প্রতীক্ষায় আমার ধ্যান করছে।

মানিব্যাগ খুলে কন্‌ফার্মেশন-লেটারটা বাড়িয়ে ধরে বলে, আমি অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকে আগাম দিয়েছি। চেকটা ক্যাশ হয়েছে। রিজার্ভেশন কনফার্মও হয়েছে। আমাকে কি 'ভাগো' বললেই ভাগব?

—ও আয়াম সরি। আপনি ডক্টর মুখার্জি। না...মানে...আপনার সস্ত্রীক আসার কথা তো।

—উনি পরের গাড়িতে আসছেন। এখনি হয়তো গাড়িটা এসে পড়বে! এই কার্ডটা বোর্ডে আটকে নিন। কত নম্বর ঘর?

ছেলেটি দোতলায় তিন-নম্বর ঘরের চাবিটা হস্তান্তরিত করল। ডক্টর অনিল মুখার্জির নামাঙ্কিত ভিজিটিং কার্ডটা নেম-বোর্ডের চিহ্নিত খোপে আটকে দিল। পেজ-বয় ওর অ্যাটাচি-কেসটা হাতে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, আসুন স্যার।

কুণাল পিছন ফিরতেই কাউন্টারের ছেলেটি বললে, জাস্ট এ মিনিট ডক্টর মুখার্জি। আপনার বন্ধু ইতিমধ্যে দুবার খোঁজ করে গেছেন।

বন্ধু! হাত-পা অবশ হয়ে আসে ওর। এখানে কে আবার ওর বন্ধু? কোনোরকমে শুধু বললে, কার কথা বলছেন আপনি?

—ডক্টর শ্রীবাস্তব। আপনারা তো পাশাপাশি দু'খানা ঘর বুক করেছিলেন। ওঁরা কালই এসেছেন!

সর্বনাশ!

ছেলেটি পায়রা-খোপের ভিতর থেকে একটা হাত-চিঠি বার করে বাড়িয়ে ধরে।

কুণাল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নেয়। দরদর করে ঘামছে সে তখন।

ভাগ্য ভাল। চিঠিতে লেখা আছে, 'ডক্টর মুখার্জি, দেখা হল না। আমি আজই চলে যাচ্ছি। কলকাতায় পৌঁছে ফোন করব।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জানতে চায়, ওঁরা কি চেক-আউট করে চলে গেছেন?

—হ্যাঁ, ঘণ্টা-দুয়েক আগে। ডক্টর আর মিসেস শ্রীবাস্তব।

কী দারুণ কান ঘেঁষে বেঁচে গেল! রাখে কেষ্ট মারে কে? কুণাল খুবই দুঃখিত ভঙ্গিতে বললে, ইস্! মাত্র দুঘণ্টার জন্য দেখা হল না! জরুরি কাজ ছিল শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। বাই দ্য ওয়ে, আজ কী তিথি?

—কী তিথি? তা তো জানি না স্যার! কেন বলুন তো?

—না, মানে জোয়ারটা কখন আসবে? দীঘাতে জোয়ারের সময়েই স্নান করার আনন্দ।

—আমি ঠিক জানি না। তবে জেনে নিয়ে জানাতে পারি। ফোন করব?

—কোথায়?

—ঠিক পাশের বাড়িটাই হচ্ছে মেরিন-রিসার্চ ইন্‌সটিট্যুট। ওঁরা বলতে পারবেন।

—ঠিক আছে। আমি জেনে নেব।

ঘরে গিয়ে মালপত্র রেখে আবার এক দফা স্নান করল। ঘড়িতে দেখল বিকেল চারটে দশ। রুম সার্ভিসের বেয়ারা জানতে চাইল ওর আর কিছু চাই কিনা। এক তলায় ডাইনিং রুম আর 'বার' আছে। নজর হয়েছিল কুণালের। কিন্তু এখন কিছু খাবে না সে। সবার আগে জেনে নেওয়া দরকার জোয়ার-ভাঁটার ব্যাপারটা। একটা দিন থাকবে সে।

এর মধ্যে 'এব্‌-টাইড' দু-দুবার আসার কথা।

সেটা একটা অজ্ঞাত-ফ্যাক্টার! তার ওপরেই সমস্ত পরিকল্পনাটা ছকে ফেলতে হবে। খড়গপুর থেকে আসার পথেই এক সেট টুথব্রাশ, পেস্ট, শেভিংসেট ইত্যাদি কিনে এনেছে। আর কিনেছে একটা ভারী লোহার চেন। হাতি-বাঁধা শৃঙ্খল! ঢালাই লোহার। অন্তত সাত কে. জি. ওজন। ব্যবস্থাপনার ত্রুটি নেই কিছু।

হলিডে-হোমটা কোথায় খুব সাবধানে জেনে নিতে হবে। অরুর সেই দুই বান্ধবী—যারা চায়ের দোকানে ওকে দেখেছিল, তাদের সঙ্গে যেন কোনোক্রমেই দেখা না হয়ে যায়। একটা সান-গ্লাস পরল। খড়গপুর থেকে একটা হ্যাটও কিনে এনেছে বুদ্ধি করে। সেটাও পরল মাথায়! ওতে মুখটা বেশ কিছু আড়াল থাকে।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রথমেই পাশের বাড়ি : মেরিন রিসার্চ ইন্‌সটিট্যুট। যাবার সময় কাউন্টারে কেউ নেই দেখে নেম-বোর্ড থেকে ভিজিটিং কার্ডখানা তুলে নিল।

ঠিক ঐ চারটে দশ মিনিটে ঘরে তালা দিচ্ছিল ইন্‌সপেক্টর শ্যামল মাইতি। হোটেল 'ব্লু-ভিয়ু'-তে। হোটেলটা নতুন হয়েছে। সমুদ্রের ঠিক ওপরেই। কলকাতা-দীঘা বাসগুলো যেখানে থামে, তার খুব কাছাকাছি। কলকাতা থেকেই একটা ডব্‌ল্‌-বেড্‌রুম বুক করেছিল। এসেছে সস্ত্রীক বেড়াতে। ছুটি নিয়ে। সঙ্গে ওর দু-বছরের একটা বাচ্চা। দারুণ দুরন্ত। কাজ-কাজ আর কাজ। হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। শ্যামার অভিযোগও জমে উঠেছিল বহুদিন ধরে—কোথাও তো দুদিনের জন্য বেড়াতে নিয়ে যাও না!

বাচ্চাটাকে ট্যাঁকে তুলে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে নেমে এল শ্যামল। পাশের তিনটি ঘরই তালাবন্ধ। তার মানে হালদারমশাই ইতিপূর্বেই সপরিবারে বার হয়ে গেছেন। এখানে এসে আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। সপরিবারে এসেছেন হালদার মশাই। বাগবাজার থেকে। স্ত্রী-পুত্র-ছেলে-মেয়ে-ছেলের বউ। পাশাপাশি তিনখানা ঘর নিয়েছেন।

শ্যামাকে বললে, আর একটু রোদ পড়ে গেলে তারপর বের হলেই চলত। বারান্দায় বসেই তো সমুদ্র দেখা যায়—

—না! চলো বে-কাফের দিকে যাই। এখানে ভাল মাদুর পাওয়া যায় শুনেছি। নির্মলাদি বলেছেন, বে-কাফের কাছাকাছি বিকেল বেলায় ওরা বসে।

খোদায় মালুম কে ওর নির্মলাদি। বোধহয় মিসেস হালদার। শ্যামল কথা বাড়ায় না। বড় রাস্তা ধরে চলতে থাকে মাদুরের সন্ধানে।

শ্যামল বেচারির বিবাহিত জীবন খুব সুখের নয়। এক সহকর্মীর কন্যাকে বিবাহ করেছে। দেখে পছন্দ হয়েছিল তার। ওর বউ মোটামুটি সুন্দরী, ঘর-করনার কাজ জানে। রান্নার হাত ভাল; কিন্তু একটিমাত্র দোষেই শ্যামলের জীবন বিষময় করে তুলেছে। এমনটা যে ঘটতে পারে তা বিয়ের আগে ও টের পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়।

শ্যামা প্রচণ্ড সন্দেহবাতিক। সব সময়েই তার ধারণা—ওর স্বামী অন্য মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করছে! ক্রমাগত কর্তাকে সে চোখে চোখে রাখে। শ্যামলের বিয়েতে অরুন্ধতী যেতে পারেনি—যদিও নিমন্ত্রণপত্র ছাড়াও হাত-চিঠি পেয়েছিল। সে সময় ও ছিল অসুস্থ। টাইফয়েডে ভুগছিল। পরেও যোগাযোগ করতে পারেনি, কারণ বিয়ের পরে শ্যামল বদলি হয়ে যায় উত্তরবঙ্গে। চিঠিপত্রে যে যোগাযোগ রাখবে তারও উপায় নেই। শ্যামল ওকে সব কথাই খোলাখুলি জানিয়েছিল। লিখেছিল, 'বউ কেমন হয়েছে জানতে চেয়েছিলি, তাই জানাচ্ছি। এমনিতে বেশ ভাল। আমার যত্ন-আত্তি করে। লেখাপড়া বিশেষ করেনি, ক্লাস এইট পর্যন্ত বিদ্যে। তা তোর ন'দাই বা কী এমন পণ্ডিত! গাঁয়ের মেয়ে। অন্তত গানটা যদি জানত তবু ডুগি-তবলায় তাল দিতে পারতুম। আমারই এক সহকর্মীর কনিষ্ঠা কন্যা। ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। এমনভাবে ধরে পড়েছিলেন যে 'না' করতে পারলাম না। আর তুইও তো বলেছিলি আমাকে সংসার পাততে। সবই ভাল—কিন্তু একটা মারাত্মক দোষ। দারুণ সন্দেহ-বাতিক। কোনো বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে হেসে কথা বলার জো নেই। তোর কথা ওকে বলিনি। তুই চিঠি দিলে আমার অফিসের ঠিকানায় দিবি। বাড়ির ঠিকানায় যারা লেখে তাদের চিঠি ও খাম খুলে পড়ে, আবার আঠা দিয়ে এঁটে রাখে। যেন পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়! কিন্তু কী করব বল? এ একটা মানসিক রোগ!...গান বাজনার চর্চাটা রেখেছিস তো? ওটা ছাড়িস না অরু! আর সেই লেকের ধারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটা কোনোদিন ভুলিস না! যখনই তোর প্রয়োজন হবে আমাকে স্মরণ করিস। ইতি ভাগ্যহীন তোর ন'দা!'

অরু এ চিঠি পেয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিল ওর অফিসের ঠিকানায়। অনুরোধ করেছিল, এরপর যেন চিঠিপত্রের আদান-প্রদান বন্ধ করা হয়। লিখেছিল, 'হতে পারে ন'বৌদি সন্দেহবাতিক। তোর বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে হেসে কথা বললে সে অহেতুক অভিমান করে! কিন্তু ন'দা—এই শেষ-চিঠিতে স্বীকার করছি—তুই জবাব দিবি না, এই ভরসাতেই জানাচ্ছি—আমি সেদিন ভুল করেছিলুম রে! বোকা মেয়েটা সেদিন বুঝতে পারেনি কেন তার ন'দা তার মামিমাকে অমন অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিয়েছিল! বয়স বেড়েছে! হয়তো তাই এখন বুঝতে পারছি! কিন্তু যে ভুল শোধরানো যাবে না, তার

জের টেনে জীবনকে আরও জটিল করার কোনো মানে হয় না। চিঠির জবাব দিস না। তবে তোর অনুরোধটা নিশ্চয়ই রাখব; কিন্তু সেটা তুই অনুরোধ করেছিস বলে নয়—তেমন চরম বিপদের মুহূর্তে আর কারও কথা আমার কিছুতেই মনে পড়বে না রে ন'দা! ইতি হতভাগিনী তোর অরু।'

তারপর দুজন দুজনের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। চিঠিপত্র আদান-প্রদান বন্ধ।

রোডস্‌ ডাক-বাংলোর মুখে ডানদিকে বাঁক নেবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামল। একটা গাড়ি ঢুকে গেল মেরিন রিসার্চ ইন্‌সটিট্যুটের ভিতর। অ্যাম্বাসাডার। গাড়িতে একক যাত্রী। সে নিজেই চালাচ্ছে। মাথায় ফেল্ট হ্যাট, চোখে কালো চশমা—কিন্তু লোকটা কে? আশ্চর্য! এতটা সাদৃশ্য?

সাদৃশ্যই বা কেন? হয়তো লোকটা সত্যিই কুণাল চক্রবর্তী। এসেছে দীঘাতে। হয়তো বেড়াতে; কিংবা কে-জানে হয়তো বিজনেস-ট্রিপ-এ। কোনো মক্কেলের হোটেল ডিজাইন করতে। চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে ফেলল। গাড়ির নম্বরটা কিন্তু অভ্যস্ত চোখে সে দেখে নিয়েছে!

পায়ে পায়ে ওরা এগিয়ে গেল বিচ-এর দিকে। অনেক দরদাম করে শ্যামা একখানা মাদুর কিনল। সেটাকেই বিছিয়ে বসল সমুদ্রবেলায়। সপরিবার হালদারমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শ্যামা বেশ জমিয়ে নিয়েছে। শ্যামলের মনের কোনায় কোথায় যেন একটা কাঁটা খিঁচখিঁচ করছে! কুণাল চক্রবর্তী দীঘাতে কেন? তার চেয়েও বড় কথা—সে একা কেন?

জীবনের যে-পর্যায়টা ভুলে গিয়েছিল হঠাৎ তারা যেন ভিড় করে ফিরে আসতে চাইছে। ঐ ছেলেটাই কালবৈশাখী ঝড়ের মতো এসে একটা সংসারকে ছারখার করে দিয়ে গেল। দুর্ঘটনাটা না ঘটলে শ্যামল নিশ্চয়ই অরুকে বিয়ে করার প্রস্তাবটা তুলতে পারত না, কিন্তু হয়তো তৃপ্তি পেত, অরুকে সুখী জীবন-যাপন করতে দেখলে। মামার হৃদ্‌রোগের আক্রমণও পরোক্ষভাবে ঐ ঘটনারই পরিণাম। আদরের ভাগ্নিটার সর্বনাশ তিনি সহ্য করতে পারেননি। আর আশ্চর্য ঐ অরু মেয়েটা। কেন সে ডিভোর্স দিল না কুণালকে? শুধু তাকে শাস্তি দিতে? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ? নাকি মেয়েটা ভেবেছিল—কুণাল যে মুহূর্তে দীনবন্ধু জানার ভাগ্নিজামাই থাকবে না, সেই-মূহূর্ত থেকেই তার জীবন-সংশয়? ঐ সঙ্গে মনে পড়ল ঐ আগুনবরণ ছেলেটার কাছে শ্যামল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওর ঐ নাকটা থেঁতলে দেবার প্রতিজ্ঞা করা আছে। সেটা মুলতুবিই রাখা আছে দীর্ঘ চার-বছর! আরও মনে পড়ল, অরুর সাবধানবাণী : ও তোকে রীতিমতো ভয় পায় রে ন'দা। তোর ভয়ে ও একটা পিস্তলের লাইসেন্স করিয়েছে। সব সময় সেটা পকেটে রাখে! সেটা অবশ্য শ্যামল গ্রাহ্য করে না। এ খেলার এই নিয়ম। দুপক্ষেরই সমান সুযোগ—'চোর-পুলিশ' খেলায়। সেবার শিশুপালের হিপ-পকেটেও ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। আচ্ছা, তা সত্ত্বেও ইব্রাহিম ছোরা হাতে এগিয়ে এসেছিল কেন? একটাই

হেতু—যাতে মাঝেমাঝে শালাবাবুকে সেই ছোরার তীক্ষ্ণভাগ দিয়ে খোঁচাতে পারে, বিন্দু-বিন্দু রক্তক্ষরণ হতে দেখলে শ্যামল মনোবল হারিয়ে ফেলবে, এই আশায়। ইব্রাহিম আশা করেছিল, দুরন্ত ভয়ে শ্যামল অরুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে। প্রাণভয়ে ভীত শ্যামলের চোখের সামনে অরুকে বেইজ্জত করার পরে সেই 'রক্ত-সন্ধ্যা'র দা-গামার মতো পৈশাচিক উল্লাসে ইব্রাহিম তার ছোরাটা আমূল বিদ্ধ করে দিত শ্যামলের বুকে! শিশুপাল বোধকরি স্বপ্নেও ভাবেনি আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটেও রিভলভার থাকতে পারে!

হঠাৎ শ্যামাকে বললে, এই! তুমি এখানেই থেকো, আমি একটু ঘুরে আসছি—

—না, না, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—সিগ্রেট কিনতে। যাব আর আসব। খোকন থাকল তোমার কাছে।

হালদার-মশাই বলেন, কিছু চিন্তা নেই মশাই। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত আছি।

হনহনিয়ে রাস্তাটুকু পার হয়ে এল। হাতঘড়িতে দেখল পৌনে পাঁচটা। ও যখন মেরিন রিসার্চ ইন্‌সটিট্যুটে ঢুকল তখন দপ্তর বন্ধ হচ্ছে। অফিসার-ইন-চার্জ তখনো ছিলেন। নেমপ্লেটে নামটা দেখে বুঝে নিল উনি মাদ্রাজি—মিস্টার ত্রিলোকন। শ্যামল তার পুলিসি শনাক্তিকরণ কার্ডটা দেখিয়ে ইংরেজিতে বললে, একটু বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি...

ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলাতে বললেন, বিলক্ষণ! জনগণের সেবাই তো আমাদের ব্রত।

শ্যামল ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে বসতে বসতে বললে, চমৎকার বাংলা বলেন তো আপনি?

—উপায় কী? একটি বঙ্গললনার পাণিপীড়ন করায় সৌভাগ্য লাভ করেছি যে। বলুন?

শ্যামল কাজের কথায় আসে : মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে আপনার কাছে মিস্টার কুণাল চক্রবর্তী এসেছিলেন, তিনি কোথায় উঠেছেন বলতে পারেন?

—মিস্টার কুণাল চক্রবর্তী! আ'য়াম সরি! ও নামের কাউকে তো চিনি না আমি।

—এই একটু আগে একটা স্কাই-ব্লু রঙের অ্যাম্বাসাডারে...খুব ফর্সা রঙ...অ্যাবাউট পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বয়স...চোখে সানগ্লাস...

—আই সি! না, তাঁর নাম কুণাল চক্রবর্তী নয়, ডক্টর অনিল মুখার্জি।

—আপনার পরিচিত?

—হ্যাঁ। উনি একটা মেটাল অ্যান্ড অ্যালয় ফ্যাকটরির ইন্‌সটলেশন ইঞ্জিনিয়ার।

—ও! কতদিনের পরিচয়?

—না, মানে আজই প্রথম দেখলাম ওঁকে। তবে ওঁর বন্ধু শ্রীবাস্তব আমার ক্লাসমেট। কেন বলুন তো?

—তাহলে উনি যে কে, চক্রবর্তী নন, এ. মুখার্জি, তা কেমন করে জানলেন?

হো-হো করে হেসে ওঠেন ত্রিলোকন। বলেন, আপনি মশাই টিপিক্যাল পুলিশ-অফিসার! কেমন করে আবার জানব? উনি ওঁর ভিজিটিং কার্ড দেখালেন। ওঁর কলিগ শ্রীবাস্তবের খোঁজ করলেন...

—আপনার কাছে তাঁর খোঁজ করবেন কেন?

—কী আশ্চর্য! ওঁদের দুজনেরই একসঙ্গে দীঘায় বেড়াতে আসার কথা ছিল। এসেছেনও। তবে একদিন আগুপিছু। ওঁর ভিজিটিংকার্ড দেখে আমি যখন বললাম—আপনাদের কোম্পানিতে আমার এক সহপাঠী চাকরি করে, শ্রীবাস্তব, তখনি উনি বললেন—শ্রীবাস্তব কাল এসেছিল, আজ চলে গেছে—একটুর জন্যে দেখা হয়নি। তখন আমি বললাম—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। কিন্তু এতসব কথা জানতে চাইছেন কেন বলুন তো? আপনি মিস্টার চক্রবর্তীকেই খুঁজছেন, ডক্টর মুখার্জিকে তো নয়।

—তা ঠিক! কিন্তু দুজনের চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য। একটু আগে উনি যখন ড্রাইভ করে ঢুকছিলেন তখন একঝলক দেখেই আমার মনে হয়েছিল উনি মিস্টার কে. চক্রবর্তী।

—জাস্ট এ কোয়েন্সিডেন্স! উনি—ডক্টর অনিল মুখার্জি।

শ্যামল উঠে দাঁড়ায়। বলে, সরি টু ডিস্টার্ব য়ু! আমারই ভুল।

—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনি নিঃসন্দেহে অনিল মুখার্জি, তবে 'ডক্টর' মুখার্জি কি না আমার সন্দেহ আছে।—বলেই আবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন।

শ্যামল উঠে দাঁড়িয়েছিল। এ-কথায় বসে পড়ে। বলে, কেন?—এ-কথা কেন বলছেন?

—'মেটাল করোশন' সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ টেক্‌নিক্যাল আলোচনা হল কিনা—

—বুঝলাম না।

—একজন মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ডক্টরেট, 'মেটাল অ্যান্ড অ্যালয়' নিয়ে যায় কারবার, সে 'মেটাল-করোশান'-এর রুডিমেন্টারি ব্যাপারগুলোও জানে না!

—আপনার তাই মনে হল? শ্যামল সিগ্রেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে।

—নো থ্যাঙ্কস। আমি স্মোক করি না!

শ্যামলের মন সন্দেহবাতিক। প্রশ্ন করে, উনি কেন এসেছিলেন? ওঁর বন্ধু শ্রীবাস্তবের খোঁজে?

—না, না। শ্রীবাস্তব যে আমার ক্লাসফ্রেন্ড, সে যে আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এসব কিছুই তিনি জানতেন না।

—তাহলে ওঁর সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য কী? লোহায় কী করে মরচে পড়া ঠেকানো যায়?

—না, তাও নয়। সেটাও একটা রহস্য! আমার কাছে টুরিস্টরা প্রায়ই জানতে আসে—জোয়ার কখন আসবে। হাইটাইড কখন ম্যাক্সিমাম। সেটা স্বাভাবিক। জোয়ারের সময়েই স্নানের আনন্দ। উনিও তাই জানতে এসেছিলেন।

—তাহলে রহস্যটা আবার কোথায়?

—রহস্য এটাই যে, উনি জোয়ার কখন তুঙ্গে এটা জেনেই সন্তুষ্ট হলেন না, জানতে চাইলেন : 'এব্-টাইড কখন ম্যাক্সিমাম'!

—তার মানে?

—মানে, ভাঁটা কখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাবে।

—তা জেনে ডক্টর মুখার্জির কী লাভ?

—সেটাই তো রহস্য! আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন, নিছক কৌতূহল!

শ্যামল নিজের সিগ্রেটে অগ্নি-সংযোগ করে বললে, তা 'এব্-টাইড' আজ কখন ম্যাক্সিমাম?

—আপনিও ঐ বিচিত্র প্রশ্নটা করছেন? ভাঁটা কখন চূড়ান্ত? কেন?

শ্যামল স্রাগ্ করে বললে, নিছক কৌতূহল।

ত্রিলোকন হাসতে হাসতে বলেন, আজ রাত দশটা বত্রিশ মিনিট। তারপরই সমুদ্র আর পিছবে না, এগুবে।

—থ্যাঙ্কস!—শ্যামল ঘড়িতে দেখল : পাঁচটা এগারো।

বে-কাফের দিকে ফিরে চলল সে আবার। অন্তর্লীন চিন্তাতে সে মগ্ন হয়ে পথ চলছিল। ব্যাপারটা কী হতে পারে? লোকটা অনিল মুখার্জি, না কুণাল চক্রবর্তী? ঐ মাদ্রাজি অফিসারটি মেটাল করোশন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল—তাঁর মনে হয়েছে আগন্তুক সে প্রয়োগবিদ্যার রুডিমেন্টারি তথ্যগুলোও জানেন না—অথচ ডক্টর মুখার্জি মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার—'মেটাল অ্যান্ড অ্যালয়' কোম্পানির অফিসার!

দ্বিতীয়ত দুজনের চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য। তৃতীয়ত ঐ প্রশ্নটা—

দীঘায় ঐ দিন 'এব্-টাইড' কখন ম্যাক্সিমাম?

এ প্রশ্নটার জবাব কেন জানতে চাইলেন ঐ ভদ্রলোক—অনিল মুখার্জি অথবা কুণাল চক্রবর্তী?

হলিডে-হোমটা ফাঁকা। প্রজাপতির মতো এক ঝাঁক বাচ্চাদের নিয়ে তিন দিদিমণি গেছেন সমুদ্রবেলায়। এখনো রোদ বেশ চড়া; কিন্তু মেয়েরা কি শোনে? শনি-রবি দুটিমাত্র দিন। যতক্ষণ সম্ভব সমুদ্রের কিনারে-কিনারে ঘুরে বেড়াবে। ফুচকা-ঝালমুড়ি-বাটাটাপুরি নিয়ে কামড়া-কামড়ি করবে। ঝিনুক কুড়োবে, দুর্গ বানাবে আর বালির ওপর ক্ষণস্থায়ী নাম লিখবে। অরুন্ধতী দলের সঙ্গে আসেনি। মাথা ধরার অজুহাতে একলাই শুয়ে ছিল অতিথি-আবাসে। কথা আছে, রোদ একটু পড়লে সে এসে ওদের সঙ্গে মিশবে।

আসলে ও একটু নির্জনতাই খুঁজছিল। লোকজনের সঙ্গে গল্প-গুজব—কী-জানি-কেন এখন ভাল লাগছে না।

'নতুন কথা'! কী এমন নতুন-কথা শোনাতে পারে কুণাল?

সেই মেয়েটির কি বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে? কী যেন নাম—হ্যাঁ, মনে আছে, রাকা চৌধুরী। একটা মধ্যাহ্ন তার সান্নিধ্যে কাটিয়েছে। তাও প্রায় বছর দুই আগে। তারপর আর কিছু জানি না। সেই প্রথম, সেই শেষ। মনোমালিন্য হয়নি কিছু, কিন্তু যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন কোনো পক্ষই বোধ করেনি। এতদিনে তার বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চিত।

মনে পড়ে গেল সেই নিদাঘ দ্বিপ্রহরের কথা। রাকা এসেছিল ওর কাছে। খড়গপুরে ওদের মেসে।

সেটা ছুটির দিন। গুড-ফ্রাইডের ছুটি মিলিয়ে পর পর তিনদিনই স্কুল বন্ধ। অরু থাকত একটা ওয়ার্কিং-গার্লস্ মেস্-এ। সাতজন বোর্ডার একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে তিনদিন ছুটি থাকায় অনেকেই কলকাতায় গেছে। কেউ বা দেশের বাড়িতে। অরুও আগে এমন ছুটি পেলে ছুটত দুর্গাপুর-মুখো। মামা মারা যাবার পর ইদানীং যায় না। পড়ে থাকে মেস্-এ। পাহারা দেয়। সেদিনও বসে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিল। বেলা তখন দশটা সাড়ে-দশটা। এপ্রিল মাস। বেশ গরম। লু বইতে শুরু করেছে কয়েকদিন। বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। হঠাৎ মোক্ষদা এসে বললে, দিদিমণি, নীচে রিশ্‌কা করে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। আপনাকে খুঁজছেন।

আমাকে? কে? কী নাম?

তা তো জানি না। আপনার নাম করেই খুঁজছেন।

কলমটা বন্ধ করে, খাতাপত্র চাপা দিয়ে ও নেমে এসেছিল নীচে।

ওরই বয়সী একটি ভদ্রমহিলা। চুলগুলো 'বয়েজ-কাট'। স্লিভলেস্ ব্লাউজ আর পাতলা একটা মভ্-রঙের শিফন শাড়ি। হাতে বেঁটে একটা ছাতা। সিঁড়ি দিয়ে ওকে নেমে আসতে দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, আপনিই অরুন্ধতী চক্রবর্তী? জগত্তারিণী স্কুলের?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক...

—না। আপনি আমাকে চেনেন না। দাঁড়ান, রিকশাওয়ালাটাকে আগে বিদায় করি।

ভাড়া মিটিয়ে হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে উনি ফিরে এসে বললেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। কোনটা আপনার ঘর?

—দোতলায়। আসুন—

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে মহিলাটি বললেন, সব ঘরই তালা বন্ধ দেখছি...

—পর পর তিনদিন ছুটি তো? অনেকেই কলকাতা গেছেন।

—আমারও তাই আশঙ্কা ছিল। তিন দিনের ছুটিতে আপনিও না দুর্গাপুরে চলে যান।

অরু হেসে বললে, ওরে ব্বাবা। শুধু আমার নাম নয়, ধামও আপনার জানা?

ঘরে এসে দুজনে বসে। পাশাপাশি দুটি সিঙ্গল-বেড খাটে। ফ্যানটা খুলে দিয়ে অরু বলে, এবার বলুন?

—আমার নাম রাকা চৌধুরী। এ নামটা কখনো শুনেছেন?

অরুন্ধতী নেতিবাচক গ্রীবা সঞ্চালন করে।

রাকা ইংরেজিতে বলে, বারান্দায় যে মেয়েটি ঝাঁট দিচ্ছে ও বোধহয় আপনাদের মেড-সার্ভেন্ট। ও একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। ওকে বরং দুকাপ চা কিনে আনতে বলুন।

কৌতূহল অরুন্ধতীরও হচ্ছিল—মোক্ষদাকে দোষ দিতে পারে না। দুকাপ চায়ের ফরমায়েশ করে তাকে বিদায় করে। রাকা বলে, আমার বাবার নাম দয়ানন্দ চৌধুরী; মানে 'চৌধুরী-চক্রবর্তী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'-এর সিনিয়ার পার্টনার।

অরুন্ধতী গম্ভীর হল। বলল, ও! এবার বুঝেছি।

—আপনার কথা আমি মোটামুটি সবই জানি। মানে, কুণাল যতটা বলেছে—অথচ আপনি আমার সম্বন্ধে প্র্যাক্‌টিক্যালি কিছুই জানেন না। আপনার যদি কোনো কিছু জানবার থাকে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

—আগে শুনি, আপনি কেন এসেছেন? উঠেছেন কোথায়?

—স্টেশান থেকে রিকশা নিয়ে সোজা এখানেই। বিকেলের গাড়িতে ফিরে যাব।

—ও! তাহলে আমার এখানেই যাহোক দুটি খাবেন। আমাদের অবশ্য সাদামাটা আয়োজন, তবে একটা দিন তো, মন্দ লাগবে না।

—না, না। তা কেন? এই লু-এর মধ্যে ফের কোথাও খেতে যেতে হবে না, এটাই তো মস্ত প্রাপ্তি। আমি কিন্তু ভাই একবার স্নান করব, জল আছে তো?

—আছে! কিন্তু আমার ঠিকানা পেলেন কোথা থেকে? কুণাল তো জানে না।

—না! ঠিকানাটা জোগাড় করেছি শ্যামলবাবুর কাছ থেকে। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, আমি আপনাকে 'তুমি'ই বলতে চাই। 'আপনি'-তে কেমন যেন দূর-দূর লাগে!

অরুন্ধতী হেসে বলেছিল, বলো না। 'তুমি'ই বলো। কিন্তু ন'দা তো আই মিন শ্যামলদা তো এখন কলকাতায় থাকে না। তার ঠিকানাও তো কুণালের জানার কথা নয়। সেটাই বা জোগাড় করলে কোথা থেকে?

—সে অনেক কথা। তোমাকে সব কিছু বলব আর শুনব! ঐ চা এসে গেছে।

আহারান্তে দ্বিপ্রহরে নির্জন ঘরে রাকা ওকে শুনিয়েছিল সব কথা।

কুণাল যে দুর্গাপুরে এসে রেজিস্ট্রি-বিবাহ করেছে, মানে করতে বাধ্য হয়েছে, এ

ব্যাপারটা কুণাল সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। এমনকী রাকার কাছ থেকেও। তার পূর্বেই কুণাল ও রাকার বিয়েটা পাকা হয়ে গিয়েছিল। আসন্ন উৎসবের প্রতীক্ষায় সকলেই ছিল উন্মুখ। হঠাৎ দুর্গাপুর থেকে ফিরে এসে কুণাল জানাল, বিশেষ কারণে সে এক বছর বিয়েটা পিছিয়ে দিতে ইচ্ছুক। ইচ্ছুক নয়, বদ্ধপরিকর। দয়ানন্দ বা প্রমথেশকে সে বিশ্বাসযোগ্য কোনো কৈফিয়ত দিতে পারেনি। কিন্তু রাকাকে একটা কৈফিয়ত না দিলে নয়। সে বলেছিল—ওর অন্তরে যে বোহিমিয়ান বৃত্তিটা আছে—যে অতৃপ্তি, নিত্য-নতুনের প্রতি মোহগ্রস্ত উদ্দামতা, এটার চিকিৎসা করাচ্ছে সে। সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে। তিনি বলেছেন, বছরখানেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বলা যাবে না—সে এই মনোবিকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবে কি না। যদি সে রোগমুক্ত না হয়, তাহলে রাকার সঙ্গে সে নিজেকে জড়াতে চায় না। রাকা খুশি মনেই মেনে নিয়েছিল। গোপনে দয়ানন্দকেও জানিয়েছিল; কিন্তু প্রথমেশ চক্রবর্তীকে কিছু জানানো হয়নি। তিনি একরোখা মানুষ। একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ ধরনের। দয়ানন্দ রাকাকে বলেছিলেন—বাবা-ছেলের ব্যাপার, ওর ভিতর আমাদের নাক গলানো ঠিক নয়। কুণালের মেসোকেও বলেননি।

এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। রাকা বললে, তোমার যখন মিস-ক্যারেজ হয় তখন আমি আর কুণাল কাশ্মীরে—

—আমার 'মিস-ক্যারেজ' হয়েছে তা কে বলল? কুণাল?

—না। শ্যামল।

—তার সঙ্গে যোগাযোগ হল কী করে?

—সবটা শোনো আগে।

পরিস্থিতিটা আমূল বদলে গেল বিনা-নোটিসে প্রমথেশ চক্রবর্তী হার্ট ফেল করায়।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর প্রমথেশের অ্যাটর্নি একদিন সবাইকে ডেকে স্বর্গত বন্ধুর উইলটা পড়ে শোনালেন। ঠাকুর-চাকর থেকে শুরু করে সকলকেই তিনি কিছু-না-কিছু দিয়ে গেছেন। কুণালের মাসিকেও একটা মোটা অঙ্ক। কিন্তু বাদবাকি স্থাবর-অস্থাবর দিয়ে গেছেন একটি ট্রাস্টিকে। কুণালের মেসো, দয়ানন্দ, ওঁর পার্টনার আর ঐ অ্যাটর্নি বন্ধুটি তার এক্সিকিউটার। শর্ত এই—কুণাল যদি রাকা চৌধুরীকে বিবাহ করে, তবে ওরা দুজনে এককভাবে পাবে সম্পত্তির অর্ধাংশ। কুণাল যদি প্রথমে অন্যত্র বিবাহ করে তবে রাকা পাবে অর্ধাংশ, বাকিটা পাবে এক সেবা-প্রতিষ্ঠান। আর কুণালের বিবাহের পূর্বেই যদি রাকা চৌধুরীর দেহান্ত ঘটে বা সে অন্যত্র বিবাহ করে, তবে কুণাল পাবে অর্ধাংশ, বাকিটা ঐ সেবা-প্রতিষ্ঠান।

অদ্ভুত উইল! কিন্তু এমন বজ্রবাঁধুনিতে সেটা তৈরি যে, তাকে আইনত নাকচ করা অসম্ভব। এর পরেই কুণাল সম্মতি জানাল। সপিণ্ডকরণ করে সে রাকাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত।

অরু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। 'বিগামি'-আইনত অপরাধ জেনেও কুণাল কী ভাবে এ প্রস্তাব দিল? পরক্ষণেই ওর মনে হল—কুণাল নিশ্চয়ই আশা করেছিল অরুন্ধতী খবর পাবে না। অন্তত সে খবর পেতে পেতে ও প্রবেট নিয়ে সমস্ত টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে এনে ফেলবে। তারপর যদি অরু ওর বিরুদ্ধে মামলা আনে তাহলে সে লড়বে। কুণাল বুঝে নিয়েছিল—আদালতে একটি নিগৃহীতা অসহায়ার চেয়ে লক্ষপতির দাপট বেশি। কতদূর লড়তে পারে একটা স্কুল মিস্ট্রেস? সুপ্রিম কোর্ট? অসম্ভব! বড় জোর কুণালের কিছু অর্থদণ্ড হবে। আর কী?

—তারপর?—কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছিল অরুন্ধতী।

—তারপর আর এক নাটক। ইনশিয়োর্ড পার্সেলে বাবা একটা চিঠি পেলেন। প্রেরক মালদা পুলিশ-স্টেশনের এক ইন্‌সপেক্টার—নাম মিস্টার শ্যামল মাইতি। পত্রের সঙ্গে তোমাদের বিয়ের ফটোস্ট্যাট্ কপি!

—ন'দা তা কেমন করে জোগাড় করল?

—তা আমি জানি না। বাবা কুণালকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে নিয়ে মালদা চলে গেলেন। শ্যামলবাবু আনুপূর্বিক সবকিছু বলে গেলেন। একটি ফটো এবং একটি টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেটও বাবাকে দিলেন। এ ঘটনা পরশুদিনের। বাবার নির্দেশেই আমি এসেছি তোমার কাছে। বাবা বললেন, এটা এমন একটা ব্যাপার, যাতে তোমার কাছে আমার একলা আসাই শোভন।

অরুন্ধতী চুপ করে অনেকক্ষণ চিন্তা করল। রাকা বাধা দিল না। ওকে ভাবতে দিল। অবশেষে অরুন্ধতী বলে, ন'দা যা বলেছে তা আদ্যন্ত সত্য, এটুকুই বলতে পারি।

—তুমি কি ওকে ডিভোর্স দেবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে?

—না! আমার দিক থেকে পরিস্থিতিটা তো একতিলও বদলায়নি, রাকা।

—জানি! কিন্তু কীলাভ তোমার জীবনের সেই একটা ভুলের অভিশাপকে সারা জীবন বহন করে বেড়ানোর? তার চেয়ে ওকে মুক্তি দাও, নিজেও মুক্তি পাও!

ম্লান হেসে অরু বলেছিল, এতদিন ওকে মুক্তি দিইনি, নিজেও মুক্ত হইনি দুটি কারণে। আজ থেকে তিনটে হল।

—বুঝলাম না। কী বলতে চাইছ?

—এতদিন রাজি হইনি দুটো কারণে। এক : ওকে শাস্তি দেওয়া। দুই : ওকে বাঁচানো! ওর মৃত্যু হলে আমি বিধবা হব, এ জন্যই কুণাল চক্রবর্তী আজও বেঁচে আছে। সেই ঘৃণিত নরকের কীটটাকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। কিন্তু তাকে হত্যা করতেও আমি পারব না—

—কে বলেছে তাকে হত্যা করতে?

—নদাকে তুমি চেনো না। আমি চিনি। রাজনৈতিক দলাদলিতে তাকে প্রচণ্ড নৃশংস হতে দেখেছি আমি। তার প্রতিহিংস্রা যে কী তীব্র তা তো বুঝতেই পাচ্ছ। মালদাতে

বসে না হলে সে কেমন করে খবর পায় যে, কুণাল তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?

—কিন্তু তৃতীয় হেতুটা কী?

—তোমাকে বাঁচানো। একটি দিনের আলাপ যদিচ, তবু তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, রাকা। আমি যে ভুল করেছিলাম, তুমি তা করোনি। আজও ধরা দাওনি ওর কাছে। তোমার সর্বনাশও আমি হতে দেব না।

রাকা চৌধুরী ফিরে গিয়েছিল সন্ধ্যার গাড়িতে।

...হাতঘড়িটা দেখে চমকে ওঠে অরু। পাঁচটা বাজতে দশ। সন্ধ্যা সাতটা দশ মিনিটে বে-কাফের দ্বিতলে তার 'নতুন-কথা' শোনার আমন্ত্রণ।

অরুন্ধতী ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে! বে-কাফের দিকেই।

মেরিন রিসার্চ ইন্‌সটিট্যুট থেকে বেরিয়ে শ্যামল হাঁটতে হাঁটতে এসে উপস্থিত হল সমুদ্রের ধারে। দূর থেকে দেখতে পেল—পাতা-মাদুরে বসে আছেন বুড়ো বুড়ি—হালদারমশাই সস্ত্রীক। আর খোকন পাশে ঘুমোচ্ছে। অল্পবয়সীরা সেখানে নেই। বোধকরি সবাই দলবেঁধে সমুদ্রের কিনার দিয়ে বেড়াতে গেছে। ভাঁটা সবে শুরু হয়েছে। এবার জল ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের এখনো মিনিট পনেরো বাকি। পশ্চিমাকাশে মেঘ আছে, কিন্তু দিগন্তের কাছাকাছি নয়। ফলে সমুদ্রের জলেই সূর্যাস্ত হবে। সোনার কলসিটা মাটির কলসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখনো অবশ্য সূর্যের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শ্যামল সমুদ্র-কিনার বরাবার এদিক-ওদিক খুঁজল, দেখতে পেল না ওদের। কিন্তু আর একটা দৃশ্যে ওর নজর আটকে গেল। আজ কি তার ক্রমাগত দৃষ্টি বিভ্রম হবার দিন?

ফোরশোর রোডে প্রায় একশো গজ দূরে তিনটি মেয়ে এক ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে। মেয়ে নয়, মহিলাই। ওর দিকে ফিরে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর বয়স চল্লিশের ওপারে, তাঁর পাশের মেয়েটি অল্পবয়সী। আর ওর দিকে পিছন ফিরে যে মেয়েটি টপাটপ ফুচকা খেয়ে যাচ্ছে তার বয়সটা আন্দাজের বাইরে। কিন্তু তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা যেন খুবই পরিচিত। পাশ থেকে মাঝে মাঝে মুখের প্রোফাইল দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য সাদৃশ্য!

শ্যামল পাঁচিলের ওপর উঠে বসল। পিছন-ফেরা মেয়েটির ঐ দাঁড়ানোর ভঙ্গিমার সূত্রটি ধরে ওর মন অতীতমুখী হতে চাইছে। হঠাৎ চমকে উঠল সে। উঠে দাঁড়াল। আর একটু কাছ থেকে দেখার দুরন্ত বাসনা জাগল। পায়ে-পায়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আরে, অরুই তো।

—অরু!

অরু ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল সে! দু'হাতে শ্যামলের ডানহাতখানা চেপে ধরে বললে, ন'দা! তুই! এখানে! কী করে?

পরক্ষণেই সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। শালঠোঙার তেঁতুল-গোলায় শ্যামলের পাঞ্জাবির অনেকটা বিচিত্রবর্ণ! আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে থাকে। ফুচকাওয়ালা বল্‌লে, অখনই সাবুন দিয়ে ধুয়ে লিলে দাগ কুছু থাকবে না।

শ্যামল বর্ষীয়সীর দিকে ফিরে বললে, অরু আমার ছোটবোন।

—আর আপনি ওর ন'দা! সেটা বুঝেছি। কিন্তু পাঞ্জাবিটা এখনি ধুয়ে না ফেললে—

শ্যামল ওঁর কথার মাঝখানেই বলে, কত লোক কতরকম দীঘাস্মৃতি নিয়ে যায় তো—ভাইবোনের সাক্ষাৎকারের এ স্মৃতিচিহ্নটুকু থাকুক না জামাটায়!

অরু বলে, এসো ন'দা, তুমিও একটা শালঠোঙা নাও। সবাই মিলে খাব।

শ্যামল বললে, আমার নাম শ্যামল, অরু যে আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে, তা মনে হয় না; আন্দাজ করছি আপনারা দুজনেও জগত্তারিণী গার্লস স্কুলে পড়ান?

জবাব দিল অতসী। বললে, আমার নাম অতসী, আর উনি আমাদের মেজদি, মানে অঞ্জলিদি—

অরু তখন ফুচকাওয়ালাকে বলছে—দোঠো, দোঠো, হামারা ঠোঙা গির গিয়া হ্যায়!

—সে তো হামি দেখলম্‌। দোঠোই তো দেতা হ্যায় মাইজি, লিজিয়ে বাবুজি।

শ্যামল হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিল না। বললে, আমি আপনাদের সঙ্গে একশর্তে যোগ দিতে পারি—যদি পেমেন্টটা আমাকে করতে দেন।

অঞ্জলিদি বলেন, তা কেন? অরুই আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে, পেমেন্ট ও-ই করবে।

—না! এর ভেতর একটা ব্যাপার আছে মেজদি। অরুকে সবান্ধবী নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমার বিয়েতে। বেচারি আসতে পারেনি অসুখ করায়। সেটা পাওনা আছে।

অতসী আগ্‌ বাড়িয়ে বলে, তাহলে শুধু ফুচকা খেতে গেলাম কেন? রসগোল্লাও খাব।

—নিশ্চয়ই!

অরু বলে, না! রসগোল্লা খাওয়াবে মেজদি! সেই বাজি-হারার! সেটা তো পাওনা আছে।

শ্যামল প্রশ্ন করে, কী নিয়ে বাজি?

ব্যাপারটা এমন যে, বর্ষীয়সী অঞ্জলিদি অথবা অল্পবয়সী অতসী কেউই সেটা সবিস্তারে শ্যামলকে বলতে পারে না। দুজনেই অরুর দিকে তাকায়।

—কী নিয়ে বাজি জিতেছিলি রে অরু?

অরু হাসতে হাসতে বলে, সে নিতান্ত মেয়েলি ব্যাপার—'ফর লেডিজ ওন্‌লি!'

—তাহলে আমাকে সেই বাজি জেতার ভাগ দিতে চাইছিস কেন?

—আঃ! তুমি বড় জ্বালাও ন'দা! আচ্ছা, পরে তোমাকে সব বলব'খন কথা দিচ্ছি!

—অরু!—অঞ্জলিদি ধমকে ওঠেন!

অরু খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। অঞ্জলির দিকে ফিরে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে! ন'দাকে কিছু বলব না। হল তো? কথা দিচ্ছি!

অতসীও খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, বাঃ! তুমি যে দু-তরফাই কথা দিচ্ছ অরুদি!

মোট কথা, ওরা চারজনে গল্পগুজবে মেতে ওঠে মহানন্দে। চার-রাউন্ড ফুচকা বিতরণের পর পেমেন্টটা শ্যামলই করল। অঞ্জলি বললেন, অরু, তোরা এখানেই থাকিস। আমি মিষ্টি কিনে আনছি, আয় রে অতসী।

উনি বুঝতে পেরেছিলেন, অরু আর তার ন'দা কিছু অন্তরঙ্গ কথা বলতে চায়। তা সত্যিই চাইছিল ওরা। অঞ্জলি আর অতসী মিষ্টির দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেই অরুন্ধতী বলে, ন'বৌদি আসেনি।

—এসেছে। দলের সঙ্গে বেড়াচ্ছে।

—দল? তুই কি সদলবলে এসেছিস নাকি?

—না। এখানেই আলাপ। 'হোটেল ব্লু-ভিউ'-তে! বাজিটা কী নিয়ে রে?

—বাঃ! বললাম না তখন! সেটা 'ফর লেডিজ ওনলি'!

—কিন্তু তুই না একদিন বলেছিলি ন'দাকে তোর সব কথা বলা যায়?

—যায়ই তো। কিন্তু এটা তো আমার একার কথা নয়। এর সঙ্গে যে ওঁদের কিছু গুপ্তকথা জড়িয়ে আছে—ঐ অঞ্জলিদি আর অতসীর।

—আই সি। তাহলে থাক ও কথা। তোর কী খবর বল?

অরু ঘনিয়ে এসে বলল, একটা জবর খবর আছে ন'দা। কিন্তু এক কথায় তা বলা যাবে না। তোর হোটেলে আমার যাওয়াটা বোধহয় ন'বৌদি...

—সেটা অসম্ভব। কিন্তু তোরা কোথায় উঠেছিস?

—সেখানেও হবে না। কাচ্চাবাচ্চার ভিড়।

—জবর-খবরটা কী জাতের?

—একটা 'নতুন কথা'।

—নতুন কথা? মানে?

—বললাম তো। এক কথায় তা বলা যাবে না। আমি বোধহয় আমার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। আজকালের মধ্যেই আমাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। কী আশ্চর্য দেখ ন'দা, আজ সারাটা দিন শুধু তোর কথাই ভেবেছি। কীভাবে তোর সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন পদক্ষেপটা করব...আর ভগবানের দয়ায়...ঠিক সেই মুহূর্তেই ছপ্পর ফুঁড়ে তুই এসে হাজির হলি। শোন। এক কাজ কর। আচ্ছা, আগে বল ন'বৌদি কি খুব ভোরে ওঠে?

—না। এ-কথা কেন?

—তাহলে সূর্যোদয় দেখবার অছিলায় তুই কাল ভোরবেলা ঠিক এইখানটায় চলে আসিস। আমরা দুজনে একসঙ্গে সূর্যপ্রণাম করব। তারপর বলব, আমার 'নতুন কথা'। তুই যা আদেশ করবি...মানে, আমি নিজের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছি না।

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই মাটির ভাঁড়ে করে এক ভাঁড় রসগোল্লা নিয়ে ওঁরা এসে উপস্থিত। কিন্তু শ্যামল বেচারির কপালে রসগোল্লা নেই। প্রথম কামড়টা দেওয়ার আগেই অতসী বললে, দেখ, দেখ অরুদি...সূর্য ডুবছে—

চারজনেই পশ্চিম দিকে তাকায়।

একমাত্র শ্যামলই দেখতে পেল না অস্তোম্মুখ সূর্যের বিচিত্র বর্ণসম্ভার। তার আগেই ওর নজরে পড়ল সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি সীমন্তিনী! বিস্ফারিত লোচনে! সমুদ্রসৈকতের একমাত্র দর্শক যে-আছে পূর্বদিকে মুখ করে! সেও সূর্যাস্ত দেখছে না, দেখছে তিনটি নারী ও একটি পুরুষের ফুচকাবিলাস!

হাতঘড়িটা দেখল একবার : সাতটা বাজতে পাঁচ।

হুইস্কির বোতলটার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। তারপর কী ভেবে ক্ষান্ত দিল। আরও তিন-চার পেগ্ স্ট্যান্ড করতে পারে, অনায়াসেই; কিন্তু থাক! ওর মুখে মদের গন্ধ বোধহয় অরুর ভাল লাগবে না! চার বছর দিদিমণিগিরি করছে তো!

সমস্ত দিনে কুণালের মতটা বদলে গেছে! না! অরুকে আর কোনো সুযোগ দেওয়ার ঝুঁকি নেওয়া চলে না। বহু সুযোগ তাকে দিয়েছে—ক্রমাগত—চারবছর ধরে! এখন চরমপন্থাই নিতে হবে। সমস্ত পরিকল্পনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখেছে—না! কোনো ক্লু-ই খুঁজে পাবে না পুলিশ! কে যেন বলেছিলেন, 'পার্ফেক্ট-ক্রাইম' বলে কিছু হয় না। কুণাল সেটা অপ্রমাণ করবে। অরুন্ধতী চক্রবর্তী নামে একটি মেয়ে নিরুদ্দেশ হযে যাবার পর গোয়েন্দা-পুলিশের প্রথম সন্দেহটা পড়বে কুণাল চক্রবর্তীর ওপর। কারণ সেই ন'দা-নামক দুঃশাসন তার গদা নিয়ে উপস্থিত হবেই। ব্যাকগ্রাউন্ডটা গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পারবে। অরুন্ধতী নামের একটি মেয়ের অন্তর্ধানে কোন ব্যক্তিটির জাগতিক লাভ হল! পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে জানা যাবে, কুণাল ও অরুন্ধতী স্বামী-স্ত্রী—যে বিবাহ কুণাল করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু বিবাহটা আদৌ 'কন্‌জুমেট' করেনি! আরও জানা যাবে, কুণাল বিবাহবিচ্ছেদে আগ্রহী ছিল, যেহেতু সে রাকা চৌধুরীকে বিবাহ করতে চায়, এবং পিতৃসম্পত্তি দখল করতে ইচ্ছুক। সুতরাং অরুর মৃত্যুতে বা অন্তর্ধানে এই দুনিয়ায় একমাত্র লাভবান হচ্ছে কুণাল চক্রবর্তী! কিন্তু কুণাল চক্রবর্তীকে কিছুতেই মেয়েটির নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। অরুন্ধতী নিখোঁজ হয়েছে দীঘায়, তার লাশ পাওয়া যায়নি। ঘটনা যখন ঘটে তখন কুণাল চক্রবর্তী খড়গপুরের একটা হোটেলে। সেরাত্রে সে একটি সিনেমা দেখেছে। ফেরার পথে খোঁজ নিয়ে জানতে হবে, কোনো কারণে শো ক্যানসেল হয়েছিল কি না,

লোড-শেডিং হয়েছিল কি না। তা ছাড়া অরুন্ধতী চক্রবর্তী যে খুন হয়েছে এটাই তো প্রমাণ করতে পারবে না পাবলিক প্রসিকিউটার। 'কর্পাস ডেলিক্‌টি?' শুধু মৃতদেহটা উদ্ধার করা যায়নি তাই নয়, মৃত্যু-সিদ্ধান্তের কোনো প্রমাণই যে নেই। কোনো রক্তাক্ত অস্ত্র, কোনো আর্তনাদ, নিরুদ্দিষ্টার শেষ পরিধেয় বস্ত্র—কোনো কিছুই তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'কর্পাস ডেলিক্‌টি' অজুহাতে খুনের চার্জ গঠন করা যাবে না। হ্যাঁ, মেয়েটি হারিয়ে গেছে! খুন হয়েছে তার প্রমাণ কই? দীঘার যাবতীয় হোটেলে গোয়েন্দা পুলিশ 'কঙ্কতিকা-সম্মার্জন' চালাবে—প্রতিটি বোর্ডার-এর পশ্চাদ্‌পদ যাচাই করবে। সেখানে অতি সহজেই এড়িয়ে যাবে ডক্টর অনিল মুখার্জির নামটা। সস্ত্রীক একটা রাত তিনি দীঘায় কাটিয়ে গেছেন বটে কিন্তু পনেরো দিন আগে ঘরটা 'বুক' করেছিলেন, অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক পাঠিয়ে। চেকটা তাঁর অ্যাকাউন্টেই ভাঙানো গেছে। পনেরো দিন আগে ঐ বোর্ডারের জানার কথা নয় যে, নিরুদ্দিষ্টা মেয়েটি সে-রাত্রে দীঘায় থাকবে। তা ছাড়া ডক্টর অনিল মুখার্জি অরুন্ধতী চক্রবর্তীকে আদৌ চিনতেন না।

আচ্ছা, অরু কি জানে ইতিমধ্যে দয়ানন্দ চৌধুরী মারা গেছেন? রাকা আজও অনূঢ়া? সে একটা স্কলারশিপ নিয়ে আজ দেড়বছর সাগরপারে? রাকাও কুণালকে আলটিমেটাম দিয়ে গেছে। অদ্ভুত বদলে গেছে রাকাও। যাবার আগে হুকুমজারি করে গেছে : আমার আশা তুমি ত্যাগ করো কুণাল! আমি আজ আর রাজি নই! তোমার সামনে এখন একটিমাত্র পথই খোলা আছে। অরুন্ধতী চক্রবর্তীর সামনে নতজানু হয়ে তার মার্জনা ভিক্ষা করা! তাকে স্বীকার করে নেওয়া।

কুণাল রুখে উঠেছিল, তুমি তো সে-কথা বলবেই! আমি অরুকে স্বীকার করে নিলে প্রমথেশ চক্রবর্তীর সম্পত্তির আধখানা তুমি গ্রাস করতে পারবে।

রাকাও উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেছিল, তুমি ভুলে যাচ্ছ কুণাল, সেটা আমি আজই দখল করতে পারি। এখনি! এই মুহূর্তেই! ট্রাস্টবোর্ডকে জানিয়ে দিলে যে, তুমি বিবাহিত! তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা হয় আমার! আর কোনোদিন এসো না আমার সামনে।

কুণাল তারপর গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। কথাটা মিথ্যে নয়। রাকা পারত সম্পত্তির অর্ধেক দখল করতে। যে-কোনো কারণেই হোক, করেনি। কিন্তু সে দেশে ফিরে আসার আগেই যদি অরুন্ধতী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তাহলে কুণাল কী করতে পারে?

তখন কি রাকা স্বীকার করে নেবে না ওকে? শুধু সম্পত্তির লোভে নয়, কুণাল জানে, রাকা ওকে যতই ঘৃণা করুক, আজও মোহগ্রস্তা! আর কোনো পুরুষ বন্ধু হয়নি তার।

আবার ঘড়িটা দেখল। সাতটা বেজে পাঁচ।

ঘরে তালা দিয়ে নেমে এল নীচে। কাউন্টারে সেই ছেলেটিই বসে আছে। চাবিটা জমা দিল কাউন্টারে। বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে স্টার্ট দিল।

বে-কাফে ওখান থেকে দুশো গজও নয়।

বে-কাফের দ্বিতলে একটি টেবিলে এক কাপ কফি নিয়ে বসে আছে অরুন্ধতী। একা। তার পরনে হালকা নীল রঙের একটা মুর্শিদাবাদি। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ।

কুণাল ওর পাশে এসে বসল, কতক্ষণ এসেছ?

আফটার-শেভ লোশান নয়, এ-বেলা ওটা বোধহয় ওল্ড স্পাইস্-এর গন্ধ।

অরুন্ধতী বললে, মিনিট-পাঁচেক। তুমিও কফি নেবে একটা?

—না। এখানে কথা হতে পারে না। অনেক কথা যে আমার বলার আছে অরু—

—তবে কোথায়? সমুদ্রের ধারে?

—না। তোমাদের হলিডে-হোমে যখন যাওয়া যাবে না, তখন তুমি এসো আমার হোটেলে—টুরিস্ট-লজ-এ।

—আমি কিন্তু আধঘণ্টার জন্য ছুটি নিয়ে এসেছি।

—অসীম করুণা তোমার। পুরো ত্রিশ মিনিট। তাতেই বলে শেষ করতে হবে। উপায় কী?

গাড়িটা পোর্টিকোতে পার্ক করে সস্ত্রীক নেমে এল কুণাল। দুজনেই গেল কাউন্টারের কাছে। কুণাল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, তেইশ নম্বর চাবিটা। গিন্নি এই এতক্ষণে এসে পৌঁছলেন।

ছেলেটি হাত তুলে নমস্কার করল অরুন্ধতীকে। চাবিটা হস্তান্তরিত করল। কুণাল সেটা অরুন্ধতীর হাতে দিয়ে বললে, দোতলার তিন নম্বর ঘর। তুমি যাও আমি এখনি আসছি। অরুন্ধতী চাবিটা নিয়ে উঠে গেল দ্বিতলে।

কুণাল ছেলেটিকে বললে, রাস্তায় ওদের গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছিল। সে যাহোক। আমরা কাল ভোর চারটের সময় বেরিয়ে যাব। বিলটা এখনি পেমেন্ট করে দিতে চাই।

খাতা দেখে ছেলেটি বললে, আপনার কিছু ডিউ নেই। দু-দিনের পুরো টাকা মেটানো আছে। রাত চারটেয় আমি যদি কাউন্টারে না থাকি, চাবিটা কাইন্ডলি রেখে যাবেন। দারোয়ান অবশ্য থাকবে। মনে করিয়ে দেবে। রাতের খাবার অর্ডার দিয়েছেন?

জবাব দিল পিছন থেকে রুম-সার্ভিসের বেয়ারা, আজ্ঞে হ্যাঁ। কখন খাবারটা নিয়ে যাব ঘরে?

—এখনি।

—এত সকালে? চিলি-চিকেন তো এখনো হয়নি স্যার?

—তাহলে ফ্রায়েড প্রন, বা আর কিছু। কিন্তু দশ মিনিটের ভিতর। আমি তো বলেই ছিলাম সন্ধে সাড়ে সাতটায়।

—দেখি স্যার।—রুম-সার্ভিসের বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল।

কুণাল দ্বিতলে উঠে এল। ঘরে ঢুকে একটা সিগ্রেট ধরাল। বললে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ হল না, যা মন চাইল তাই খাবারের অর্ডার দিয়ে এলাম।

—সে কী! আমার জন্যে তো হলিডে-হোমে রান্না হচ্ছে।

—মাথা ধরার অজুহাতে না হয় মিস্-আ-মিল করো। শোনো, আমার বরাদ্দ মাত্র ত্রিশ মিনিট, তার সাতটা মিনিট নষ্ট হয়েছে। কাজের কথাগুলো সেরে ফেলি। তোমার ঠিকানা আমি জানতাম না। দুর্গাপুরে গিয়ে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম। তোমার মেজদা তো শুধু গলাধাক্কাটা বাকি রেখেছিল—

—তাই নাকি! আমি তো জানি না। কবে?

—যাক সেসব অবান্তর কথা। তুমি কি আমার তরফের লেটেস্ট খবর জানো?

—কী খবর?

—বাবা মারা গেছেন। তিনি একটা অদ্ভুত উইল করে গেছিলেন।

—জানি সে কথা।

—ও! তোমার ন'দা জানিয়েছে বুঝি?

অরুন্ধতী বলল না যে, শ্যামলের কাছে নয়, রাকার কাছে শুনেছে। বরং প্রশ্ন করে, তোমাদের সিনিয়ার পার্টনার মিস্টার চৌধুরীর মেয়ে এখন কোথায়?

—লস্ অ্যাঞ্জেলেস্-এ। ওর সম্প্রতি একটি মেয়ে হয়েছে।

—ও! রাকা বিয়ে করেছে তাহলে?

—প্রায় দেড়বছর। ওর স্বামী ডাক্তার।—মিছে কথা বলতে কুণালের কোনোকালেই বাধে না।

—তাহলে তো তুমি বাবার সম্পত্তির অর্ধাংশ এখন পেতে পারো?

—সেগুড়ে বালি! রাকা প্রমাণ করেছে যে, তার বিয়ের আগেই কুণাল চক্রবর্তী বিবাহ করেছে। খোদায় মালুম, সে কেমন করে জানল! সম্ভবত তোমার ন'দার গদা! যাক সে-সব পুরানো কথা। পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি এটা বড় কথা নয়। তোমাকে 'নতুন কথা' যেটা বলতে চাই, এবার বলে ফেলি—

—বলো?

কুণাল এক আযাঢ়ে গল্প শোনাল। আবুধাবীতে একটা মাল্‌টি-স্টোরিড পাঁচতারা হোটেল তৈরির কাজে ও আগামী মাসে ভারত ত্যাগ করছে। বছর দুই-তিন থাকবে সেখানে। পাসপোর্ট-ভিসা তৈরি। পাসপোর্টে সে নিজেকে বিবাহিত বলেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ ওর আশঙ্কা ছিল, অন্য কিছু করলে অরুর ন'দা গদা নিয়ে পাসপোর্ট অফিসারের দ্বারস্থ হবে। গল্পের উপসংহারে কুণালের গলাটা একটু কেঁপে গেল। যৌবনের প্রান্তদেশে উপনীত হয়ে সে এখন নীড় বাঁধার কথা ভাবছে। অরুন্ধতী কি পুরনো কথা ভুলে তাকে সাহায্য করতে পারে না? কুণালের অপরাধ যেমন হিমালয়ান্তিক, শাস্তিটাও তো পেয়েছে অতলান্তিক! পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যৌবনের প্রান্তদেশে উপনীত হয়েও তার ঘর নেই, ঘরনি নেই, ঘর-আলো-করা একটা ফুটফুটে বাচ্চা নেই! শুধু মদ আর মেয়ে—হ্যাঁ, আজ সে সব কথা স্বীকার করবে অরুর

কাছে—মদ আর মেয়েমানুষে তৃপ্তি হয় না। সে স্থায়ী একটা নীড় বাঁধতে চায়। এমন একটা গৃহকোণ যেখানে...অরু যদি রাজি থাকে তাহলে এখনো চেষ্টা করা যায়। তবে হ্যাঁ এ স্বপ্ন কুণাল দেখতে ভরসা পায় না। অরুর প্রতি যে অন্যায় সে করেছে তাতে তার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ নেই। অরুর আদেশটাই সে মাথা পেতে মেনে এসেছিল এতদিন—মনের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা চাইতে অরুর দ্বারে ভিখারির মতো এসে দাঁড়াতে পারেনি। বোধ করি ঈশ্বর এতদিনে ওকে ক্ষমা করেছেন। ওর যন্ত্রণায়, ওর প্রার্থনায় তিনি দয়াময় হয়ে উঠেছেন। আর তাই দীঘা-খড়গপুর রাস্তায় এমন দুটি মানুষের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন সেই দয়াময়, নিতান্ত কাকতালীয় ভাবে!

অরু যদি ওকে ক্ষমা করে, যদি রাজি হয়, তাহলে কুণাল নূতন করে বাঁচতে চাইবে! অরুর পাসপোর্ট-ভিসা করাতে যদি আরও দু-এক সপ্তাহ দেরি হয়, তাহলে কুণাল যাত্রাটা পিছিয়ে দেবে। নেহাত না হলে অরু কিছুদিন পরেই চলে যাবে আবুধাবী। ততদিনে সে একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখে নেবে।

অরু জবাব দেবে কী—তার দু-চোখ ছাপিয়ে কেবল জল আসছে। রক্ষা পেল, বাইরে থেকে কেউ নক্ করায়। কুণাল উঠে দরজাটা খুলে দিতে অরু চট করে আঁচলে চোখটা মুছে নিল।

চাও-মিন, ফ্রায়েড-রাইস, ফিশ-কাবাব, ফ্রায়েড প্রন!

—এ কী! এত কে খাবে?

কুণাল জবাব দিল না। টিপয়টা এগিয়ে নিয়ে এল। প্লেটগুলো সাজিয়ে দিল। রুম-সার্ভিসের ছেলেটা বিদায় হলে তার সেই ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললে, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ জানলে মনের আনন্দে এসব আমি একাই খেতে পারব অরু!

অরু হাসতে গিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল।

কুণাল দু-হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিল বুকে।

চার বছরের তৃষ্ণা নিয়ে উপেক্ষিতা চুম্বন-তিয়াসী মুখটা উঁচু করে ধরল।

রাত সাড়ে নয়টা।

ঘরে একটা সবুজ বাতি জ্বলছে। খোকন ঘুমিয়ে আছে এখনো। রাতটা জ্বালাবে তার মানে। মাঝরাতে উঠে। শ্যামাও ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। শ্যামল বললে, তাহলে সত্যিই তুমি খেতে যাবে না তো? আমি একাই খেয়ে আসি?

হঠাৎ দ্রাম করে উঠে বসল শ্যামা। বললে, গাঁৎ গাঁৎ করে এক পেট ফুচকা খেয়েও তোমার পেট ভরেনি?

শ্যামল সে কথায় জবাব দিল না। সন্ধ্যা থেকে যে ঝড় বয়ে গেছে তারপর সে ক্লান্ত। বললে, ঠিক আছে। কিছু মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে আসব না হয়। মাথা ধরাটা কমলে খেয়ো।

—কিছু আনতে হবে না। আমি কিচ্ছু খাব না।

শ্যামল স্যান্ডেলটা পায়ে গলাল। কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ দেখা হয়ে গেল রুম-সার্ভিসের ছোকরাটার সঙ্গে। সে বললে, এই তো আপনি। শুনুন স্যার, আপনাকে দুজন ভদ্রমহিলা খোঁজ করছেন। নীচের লাউঞ্জে আছেন।

—ভদ্রমহিলা! এত রাত্রে?

নীচে নেমে এসে দেখে লাউঞ্জে সোফার ওপর পাশাপাশি বসে আছেন অঞ্জলিদি আর অতসী। নিতান্ত বিহ্বলের মতো।

—কী ব্যাপার? এত রাত্রে আপনারা?

—একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে। আপনি কাইন্ডলি একবার আসতে পারবেন আমাদের হলিডে-হোমে?

—বিশ্রী ব্যাপার? কী হয়েছে?

চাকরটার উপস্থিতিতে কথাটা বলা উচিত কিনা অঞ্জলিদি স্থির করে উঠতে পারেন না। সেটা বুঝতে পারে শ্যামল। বলে, ঠিক আছে, আপনি এদিকে সরে আসুন তো?

রুম-সার্ভিসের লোকটা বুদ্ধিমান। নিজে থেকেই দূরে সরে গেল। কাউন্টারে বসে ছিল যে ছেলেটি সেও একটা খবরের কাগজ তুলে নিল হাতে। অঞ্জলি একান্তে সরে এসে অস্ফুটে বললেন, অরুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! অরুকে! বলেন কী! কখন থেকে?

—পৌনে সাতটা। পান কিনবে বলে হলিডে-হোম থেকে বেরিয়েছিল। এত রাত হয়ে গেল...

শ্যামল হাতঘড়িটা দেখল একবার। নটা পঁচিশ। পান কিনে ফিরতে দু-আড়াই ঘণ্টা লাগার কথা নয়। প্রশ্ন করে, থানায় জানিয়েছেন?

—বড়দি জানাতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বারণ করলাম। ভাবলাম, আপনাকে সবার আগে জানানো দরকার।

—ঠিক করেছেন। বসুন, আমি আসছি।

উঠে গেল দ্বিতলে। ছুটিতে বেড়াতে এলেও ও সব সময় এক-সেট য়ুনিফর্ম সঙ্গে রাখে। ওর মনে হল, পোশাকটা পালটে নেওয়াই ভাল। ইয়েল-লক দরজার চাবি সঙ্গেই ছিল। ঘরে ঢুকে সুইচ জ্বালাল। শ্যামা চাপা গর্জন করে ওঠে, আলো নিবিয়ে দাও! বলছি না, আমার মাথা ধরেছে?

শ্যামল কর্ণপাত করল না। সুটকেস খুলে য়ুনিফর্ম বার করে পোশাক পালটাতে থাকে। মাজায় বেঁধে নিল তার সার্ভিস রিভলবার। তিন ব্যাটারির টর্চটাও নিতে ভুলল না।

শ্যামা ততক্ষণে উঠে বসেছে, এ কী! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—একটা এনকোয়্যারিতে। তুমি শুয়ে থাকো। হয়তো আমার ফিরতে দেরি হবে।

—এখানে তোমার কিসের তদন্ত? তুমি তো ছুটিতে আছ?

শ্যামল জবাব দিল না। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বাড়িটা থমথম করছে। বাচ্চারাও কেউ বিছানায় যায়নি। কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে। ওরাও বোঝে।

অমিয়াদি শ্যামলকে দেখেই হাউমাউ করে ওঠেন, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল! আমি এখন কী করব?

শ্যামল একটা ধমক দেয় তাঁকে, সর্বনাশই যে হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। আপনার এখন একটাই কাজ। স্থির হয়ে বসে থাকা। মাথা ঠান্ডা রাখা।

অতসীর দিকে ফিরে বলল, অরুর ঘর কোনটা? তোমরা যে যার ঘরে যাও। আমাদের ডিস্টার্ব কোরো না। যাও।

বড় মেয়েরা ছোটদের সামলে স্থানান্তরিত করল।

শ্যামল ঘরে ঢুকল। অঞ্জলিদি আর অতসীও। শ্যামল ভিতর থেকে ঘরটা অর্গলবদ্ধ করে একটা খাটে বসে পড়ল। বলল, অরু যখন পান কিনতে যায় তখন কী পরে ছিল? কী-কী কথা হয়েছিল? আপনাদের কোনো রকম কিছু সন্দেহ হয়েছিল কি?

অতসী জানায়—অরুন্ধতীর পরনে ছিল হালকা নীল রঙের একটা মুর্শিদাবাদি। ব্লাউজের রঙ—

বাধা দিয়ে শ্যামল বলে, স্ট্রেঞ্জ! বিকেলে যখন বেড়াতে গিয়েছিল তখন ওর পরনে ছিল একটা মামুলি ছাপা শাড়ি। বেড়িয়ে ফিরে রাত্রে শোবার আগে সে মুর্শিদাবাদি পরেছিল? কেন? কিছু আন্দাজ করতে পারেন?

অতসীর মনে হল গোপন করাটা অন্যায় হবে। বললে, তা জানি না, কিন্তু পান কিনতে যাবার সময় অরুদি আমাকে চুপিচুপি বলে গেছল, 'আমার ফিরতে দেরি হলে চিন্তা করিস না'।

—তুমি জানতে চাওনি—কেন? সে কোথায় যাচ্ছে?

—জিজ্ঞাসা করেছিলাম। অরুদি বলল, 'ফিরে এসে বলব। আমার আধঘণ্টাখানেক দেরি হবে পান কিনে ফিরে আসতে।'

শ্যামল মেদিনীবদ্ধ দৃষ্টিতে কী-যেন ভাবছে। তার তন্ময়তা ভঙ্গ হল অঞ্জলিদির একটা কথায়, আমার মনে হয় ও 'সুইসাইড' করেছে?

—'সুইসাইড'! হঠাৎ 'সুইসাইড' করবে কেন? সেজেগুজে কেউ আত্মহত্যা করতে যায়? ওর কোনো রকম ভাবান্তর দেখেছিলেন কি আজ? বিকেলে আমার তো মনে হয়েছিল...

অঞ্জলিদি ওর হাতে তুলে দিলেন একটা গোয়েন্দা গল্পের বই। হঠাৎ নিরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়েন। শ্যামল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না! লক্ষ করে দেখল বইটার মাঝখানে একটা চুলের কাঁটা—বত্রিশ আর তেত্রিশ পৃষ্ঠার মাঝখানে। পাতাটা খুলে একটা পরিচ্ছেদের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল।

"খুন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ ওর গলায় পাঁচটা আঙুলের স্পষ্ট দাগ...দ্বিতীয় একটা সম্ভাবনাও হতে পারে, হয়তো আততায়ী ছিল মেয়েটির অতি পরিচিত—হয়তো অতি আপনজন! আততায়ী যখন ওর গ্রীবামূলে হাত দিয়েছিল, তখন সে বুঝতে পারেনি তার উদ্দেশ্য, হয়তো মেয়েটি তখন নিজেও ছিল চুম্বনতিয়াসী..."

শ্যামল বিস্মিত হয়ে জানতে চায়, এর মানে কী?

অঞ্জলিদি তখন কথা বলার অবস্থায় নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। শ্যামল অতসীকে প্রশ্ন করে—এ বইটা উনি আমাকে দেখতে দিলেন কেন?

অতসী বললে, অরুদি এই বইটা পড়তে শুরু করেছিল আজ সাত-সকালে। তারপর বেলা নটা নাগাদ একটা ঘটনা ঘটে। মেজদি একটা বাজি ধরে। অরুদি চ্যালেঞ্জটা অ্যাক্‌সেপ্ট করে। আর ঐ বত্রিশ-তেত্রিশ পৃষ্ঠার মাঝখানে কাঁটাটা গুঁজে দেয়। অরুদিই বাজিটা জিতেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই কী-যে হল—অরুদি সমস্তটা দিন ছিল অন্য জগতে। ডিটেকটিভ বইটার একটা পাতাও পড়েনি। কারও সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেনি। তাই মেজদির আশঙ্কা—অরুদি সারাদিন শুধু আত্মহত্যার কথাই ভেবেছে।

শ্যামল বললে, কিন্তু বিকালে তা তো আমার মনে হয়নি!

—ঠিক কথা! বিকালে আপনাকে দেখামাত্র সে আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। খুশিয়াল হয়ে উঠেছিল।

শ্যামল বলে, কী নিয়ে বাজি ধরা হয়েছিল?

অতসী মুখটা নিচু করে।

শ্যামল একটা ধমক দেয়, লুক হিয়ার অতসী। আমি জানি ব্যাপারটা কিছু গোপন। অরু নিজেই বলেছিল সেটা 'ফর লেডিজ ওন্‌লি'। কিন্তু এখন ওসব বাজে সেন্টিমেন্ট নিয়ে মাথাঘামানো চলে না। তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ঐ বাজি ধরার ঘটনার পর থেকেই অরুর একটা ভাবান্তর হয়েছিল। আই মাস্ট নো—ঘটনাটা কী। এখন এই মুহূর্তে আমি শ্যামল মাইতি নই, অরুর ন'দা নই—আমি একজন ইনভেস্টিগেটিং পুলিস অফিসার। আমার কাছে ঐ সব বাজে লোকলজ্জার অজুহাতে আপনারা যদি সত্য গোপন করেন তাহলে নিরুদ্দিষ্টা মেয়েটিকে আমি খুঁজে বার করতে পারব না। আপনারা কি তাই চান?

অতসীর দিকে ফিরে কথাটা শুরু করলেও শ্যামল তার বক্তব্য শেষ করল অঞ্জলিদির দিকে ফিরে।

তিনি এতক্ষণে সামলেছেন। অতসীকে বললেন, সব কথা ওঁকে খুলে বল অতসী! হি ইজ পার্ফেক্টলি রাইট। এখন ওসব বাজে লজ্জা-শরমের সময় নয়।

অতসী এবার সবিস্তারে ঘটনাটা জানাল। কিছুই রেখে-ঢেকে বলল না।

আদ্যন্ত ঘটনাটা শুনে শ্যামল সেই অপরিচিতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সংগ্রহ করল।

হ্যাঁ, অত্যন্ত হ্যান্ডসাম, বয়স হাইট, ঐ রকমই। কিন্তু মাথায় হ্যাট ছিল না, চোখে সানগ্লাসও ছিল না।

—ওর গাড়িটা স্কাই-ব্লু-রঙের? অ্যাম্বাসাডার?

অঞ্জলিদি বলেন, হ্যাঁ তাই। আমার মনে আছে।

—গাড়ির নম্বরটা মনে করতে পারেন?

—তাই কখনও মনে থাকে?

অতসী বলল, আমার কিন্তু মনে আছে—শেষ দুটো সংখ্যা 'নয়-নয়'।

অঞ্জলিদি বিস্মিতা হলেন। বলেন, তাও মনে আছে তোর?

—হ্যাঁ, আমার মনে আছে, আমি মনে মনে বলেছিলাম, ইস্! গাড়িটা এক রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেনি।

শ্যামল তার হিপ-পকেট থেকে একটা পুরনো নোট বই বার করল। পাতা উলটে খুঁজে বার করল নম্বরটা। বহুদিন আগে লেকের ধারে যে নম্বরটা বলেছিল অরু। কুণালের গাড়ির নম্বর। সেটা W. B. J. 2799.

তার মানে কুণালের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল অরুর! কিন্তু ডক্টর মুখার্জির গাড়ির নম্বর—হোক আকাশি রঙের অ্যাম্বাসাডার...W. B. F. 5345.

শ্যামল এবার জানতে চায়, অরুর বালিশের তলায় কোনো চিঠি-টিঠি নেই তো?

অতসী জানায়, সে মোটামুটি তল্লাসি করেছে। শ্যামলকে অনুরোধ করে, আপনি বরং একবার খুঁজে দেখুন।

—না! এখন প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান! যা করার আমিই করছি। তবে আপনারা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে একটা প্রাথমিক এজাহার দিয়ে আসুন। যত রাতই হোক, আমি আবার ফিরে এসে খবর দেব।

শ্যামল ফিরে এল হোটেল 'ব্লু-ভিউ'তে। নিজের হোটেলে। কাউন্টারের ছেলেটি নিজে থেকেই বলল, খোঁজ পেলেন কিছু?

—না! লোকাল ফোন গাইডটা দাও তো ভাই! কয়েকটা ফোন করতে হবে।

প্রথম ফোনটা করল পুলিশ স্টেশনে। নিজের পরিচয় দিয়ে ঘটনাটা জানাল। বলল, 'মিসিং ডায়েরি লজ' করতে দুজন ভদ্রমহিলা রওনা হয়ে গেছেন। তাঁদের কাছেই নিরুদ্দিষ্টার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

তারপর সে একের পর একটি হোটেলে ফোন করতে থাকে। তৃতীয় প্রয়াসেই সন্ধান পেল—হ্যাঁ, ডক্টর অনিল মুখার্জি সস্ত্রীক টুরিস্ট-লজ এর বাসিন্দা। তেইশ নম্বর ঘর। না, তাঁরা ঘরে নেই। চাবিটাও কি বোর্ডে নেই!

সস্ত্রীক? ঠিক আছে। শ্যামল সর্বপ্রথম ওখানেই হানা দিল।

টুরিস্ট-লজ-এর কাউন্টারের ছেলেটি ইতিমধ্যে ম্যানেজারকে খবরটা দিয়েছে। ম্যানেজার অপেক্ষা করছিল।

শ্যামলকে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার স্যার?

শ্যামল তার আইডেন্টিফিকেশন কার্ডটা দেখিয়ে বলল, একটা বিরাট স্মাগ্‌লিং-এর কেস-এ ডক্টর অনিল মুখার্জিকে পুলিশ সন্দেহ করে। ওর পার্টিকুলার্সটা একটু দেখতে চাই। খাতাপত্র ইত্যাদি।

—দেখুন।

না। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ডক্টর মুখার্জি দিন পনেরো আগে অ্যাকাইন্ট-পেয়ি চেক পাঠিয়ে ঘরটা বুক করেছেন। চেকটা তাঁর অ্যাকাউন্টেই ক্যাশ হয়েছে। কাউন্টারের ছেলেটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা কথা হঠাৎ বলে বসল, একটা কথা স্যার। ডক্টর মুখার্জি চেক-ইন করেছেন বেলা তিনটে আটান্ন-মিনিটে আর মিসেস মুখার্জি রাত সাতটা উনত্রিশে!

ম্যানেজার বিরক্ত হয়, তাতে তোমার কী?

ছেলেটি বললে, না, মানে সচরাচর গাড়ি নিয়ে এমন দুজনে দুই সময়ে আসেন না তো। সেকেন্ডলি, মিসেস মুখার্জি এলেন একেবারে খালি হাতে। একটা ভ্যানিটি ব্যাগ শুধু সঙ্গে! কোনো কিট-ব্যাগ, সুটকেস-মুটকেস, কিচ্ছুটি নেই। অথচ রাতে এখানেই থাকার কথা!

ম্যানেজার আবার ধমক দেয়, তোমাকে কেউ পণ্ডিতেমি করতে বলেনি।

শ্যামল বলে, সাড়ে সাতটায়? তাঁর পরনে কী ছিল?

—হালকা নীল রঙের একটা মুর্শিদাবাদি। আমি কেয়ারফুলি নোট করেছি...

—মাই গড! আমি ঘরটা সার্চ করতে চাই!

ম্যানেজার আপত্তি করে। বলে, বিনা সার্চ-ওয়ারেন্টে তা আপনি পারেন না।

শ্যামল বলে, লুক হিয়ার মিস্টার! এটাও সরকারি প্রতিষ্ঠান। টুরিজম্ ডিপার্টমেন্টের! আপনি যদি পুলিশকে সাহায্য না করেন...

—কিন্তু বিনা সার্চ-ওয়ারেন্টে কী করে আপনাকে আমি তা অ্যালাও করি?

—আমি বলছি। আমি সার্চ করতে পারি না। করছিও না। কিন্তু আপনার অধিকার আছে বোর্ডার-এর অনুপস্থিতিতে ঘরটা খুলবার। আমি কোনো কিছুতে হাত দেব না। আপনি ঘরটা খুলে দেখুন। আমি শুধু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে দেখব। আপনার সহযোগিতার জন্য আমি ডিপার্টমেন্টালি...

—অল রাইট! আপনি কোনো-কিছুতে হাত দেবেন না কিন্তু। আসুন!

দোতলার তিন নম্বর ঘরে কেউ নেই। পড়ে আছে কিছু এঁটো প্লেট ও ভুক্তাবশিষ্ট। একটা হুইস্কির খালি বোতল। বিছানার চাদরটা কোঁচকানো—যা হওয়ার কথা নয়। কারণ এখনো সে বিছানায় কেউ রাত্রিবাস করেনি। অথচ মনে হচ্ছে বাচ্চারা তার ওপর দাপাদাপি করেছে! বাথরুমে গিয়ে একনজর দেখে বলল, লুক হিয়ার—টুথপেস্ট এখনো ব্যবহৃত হয়নি, শেভিং সেটটার সেলোফেন-পেপারটাও খোলা হয়নি...

—তাতে কী হল?—জানতে চায় ম্যানেজার।

—কিছু না।

আবার দুজনে বাথরুম থেকে ফিরে এল শয়নকক্ষে। খাটের ওপর পড়ে আছে একটা অ্যাটাচি কেস। শ্যামল বললে, আমি হাত দেব না। আপনি কাইন্ডলি একবার দেখুন তো—ওটা চাবি বন্ধ কিনা।

ম্যানেজার স্প্রিংলক টিপতেই ডালাটা খুলে গেল।

ভিতরে রয়েছে দু-খানি ছোট কালো রঙের বোর্ড। নাম্বার প্লেট। মোটর গাড়ির।

শ্যামল তার হিপ-পকেট থেকে নোট বইটা বার করে ম্যানেজারের নাকের ডগায় মেলে ধরল একটা পাতা। তাতে একটা মোটর গাড়ির নম্বর—হুবহু যে নম্বরটা লেখা আছে অ্যাটাচি-কেস-এর বোর্ড দুটোয় ঃ W. B. J. 2799!

ম্যানেজার অবাক হয়ে বলে, এর মানে কী। আপনার নোট বইতে আগে থেকেই নম্বরটা কীভাবে লেখা আছে?

—এর মানে, ডক্টর মুখার্জিই আমার শিকার। ঘরটা বন্ধ করে বাইরে আসুন।

নীচে নেমে এসে সে পুলিশ-স্টেশনে ফোন করে সংক্ষেপে জানাল ব্যাপারটা। দুজন কনস্টেব্‌লকে পাঠিয়ে দিতে বলল। ব্যবস্থা করল, যাতে ডক্টর মুখার্জি না চেক-আউট করতে পারে।

ম্যানেজারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, টুরিস্ট-লজ-এর নিজস্ব কোনো গাড়ি আছে? দৈনিক ভাড়ার?

তা ছিল না। একটা রিকশা জোগাড় হল। শ্যামল রিকশাওয়ালার হাতে একটা বিশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, হয়তো সারারাতই ডিউটি দিতে হবে, পারবে তো?

—চলুন না স্যার, কোথায় যাবেন।

তাই তো। কোথায় যাবে?

বুদ্ধি জোগাল ক্যাশ-কাউন্টারের ঐ ছোকরাই। এগিয়ে এসে বললে, আমি একটা কথা বলব স্যার?

ম্যানেজার এবার আর আপত্তি করে না।

শ্যামল উৎসাহ দেয়, বলো, বলো ভাই। ইন ফ্যাক্ট, আসামি ধরা পড়লে তোমাকেও পুরস্কৃত করার কথা। তুমিই ক্লুটা দিয়েছিলে।

—শুনুন স্যার। লোকটাকে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। প্রথম কথা, মিস্টার-মিসেস কেন বাই রোড একসঙ্গে এলেন না। সেকেন্ডলি কারও সঙ্গে কোনো লাগেজ নেই কেন? দুদিনের জন্য ওঁরা দীঘা বেড়াতে আসছেন অথচ মহিলার সঙ্গে একটা সুটকেসও নেই! এ কি হয়? থার্ডলি, রাত চারটেয় চেক-আউট করতে চাইছেন কেন? রাত চারটে কি একটা ভদ্র সময়? ওঁদের তো পুলিশে তাড়া করেনি? ফেরারি আসামি তো নন যে, ভোররাতে রেইড হবার আগেই কেটে পড়তে হবে? ফোর্থলি, ওঁরা

দুজনে খাওয়া-দাওয়া করে যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তখন আমার মনে হয়েছিল—ভদ্রমহিলা ড্রাগড়!

—ড্রাগড়্! মানে?

—ভদ্রমহিলা ঠিক মতো হাঁটতে পারছিলেন না। যেন ঘুমিয়ে পড়ছেন। টলে-টলে পড়ছেন! হেভি-ডোজের স্লিপিং পিল খেলে যেমন হয়। ডক্টর মুখার্জি ওঁকে ধরে ধরে গাড়িতে নিয়ে তুললেন—

ম্যানেজার বলে, হয়তো বেশিমাত্রায় মদ্যপান করেছিলেন ভদ্রমহিলা।

ছেলেটি সবিনয়ে প্রতিবাদ করে, এটা কী বলছেন স্যার? দুটো যে 'ইন্‌কম্প্যাটেব্‌ল'! একসাথে দুটোই হয় না! আই মিন—'মদ্য' আর 'ভদ্র'।

—তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি? ভদ্রমহিলারা মদ্যপান করে না?

—তা নয়। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন স্যার—হোটেলে উঠে মদ্যপান করে বউ যদি মাতাল হয়ে যায়, তখন কেউ তাকে মাঝরাতে ওভাবে গাড়িতে তোলে? তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, বা তেঁতুল গোলা জল খাওয়ায়! তার মানে—ওটা 'মদ' হলে 'বউ' নয়,—'বধু-বিকল্প'! 'বউ' হলে 'মদ' নয়,—বিষ! বধূহত্যা!

শ্যামল জানতে চায়, রাত তখন আন্দাজ ক'টা?

—'আন্দাজ' নয় স্যার—নটা বেজে সাতান্ন! কারেক্ট টু দ্য ডট! আমার সন্দেহ হয়েছিল ও মিসেস মুখার্জি নয়, একটা 'কল-গার্ল'। অথচ ওকে কখনো দীঘায় দেখিনি।

শ্যামলের মনে হল, ছোকরা 'টুরিজম'-এর বদলে 'ঢুঁড়িজম'-এ ঢুকলে উন্নতি করত! পুলিশে চাকরি নিলে সমাজবিরোধীদের খুঁজে বার করতে পারত। জানতে চায়, তুমি কি লক্ষ করেছিলে—গাড়িটা কোন দিকে গেল?

—আলবাত! বিচের দিকে। গাড়িটার পিছন দিকের বাঁ-ব্যাকলাইটা জ্বলছে না। স্কাই-ব্লু অ্যাম্বাসাডার—W. B. F. 5345।

শ্যামল আর কথা বাড়ায় না। রিকশাওয়ালাকে বলে : চলো। বিচ-এ।

একজোড়া গুডইয়ার চাকার দাগ পিচ-মোড়া সড়ক ছেড়ে নেমে গেছে নীচে—বিচ-এ।

দীঘা-সমুদ্রের বালিয়াড়ির ওপর মোটরগাড়ি চালানো যায়। বালি বেশ শক্ত—পুরীর সমুদ্রতীরের মতো নয়। এককালে ওখানে স্নেইথ-সাহেবের মনোপ্লেন নামত। ইদানীং দীঘাসৈকতে মোটরগাড়ি চালানো মানা. তবে সরকারি মানা মানেই বা ক'জন? বিশেষ করে ঐ জাতের অমানুষ মানুষ?

রিকশাটাকে ছেড়ে দিতে হল। বেচারি টানতে পারছিল না। তা ছাড়া লোকটা নিরস্ত্র। তাকে ঐ বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। শ্যামল তাকে অপেক্ষা করতে বলে টর্চ হাতে নেমে গেল ভিজে বালির ওপর। কিন্তু কোন দিকে যাবে? পুবে না পশ্চিমে?

জবাব দিল গুডইয়ার কোম্পানি : পুবদিকে।

সমান্তরাল একজোড়া টায়ারের দাগ। পাশাপাশি ছুটে চলেছে মহাসমুদ্রের কিনার ধরে। কেউ কারও দিকে একতিল সরে আসেনি। এ ডানে বেঁকেছে তো ও-ও ডানে। এ বাঁয়ে তো ও-ও বামে! অথচ দুজনের দূরত্বটা একচুলও কমেনি। কাছে যেমন ঘনিয়ে আসেনি, তেমনি তার দোসরকে ছেড়ে দূরেও সরে যেতে পারেনি! চাকার দাগে প্রমাণ নেই—কিন্তু ওদের মধ্যে অনিবার্যভাবে ছিল অদৃশ্য একটা লৌহ-কঠিন অ্যাক্সেল-এর অচ্ছেদ্যবন্ধন।

শ্যামল মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে চাকার দাগ দুটো লক্ষ্য করছে। এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশ নির্মেঘ। তিথিটা বোধহয় অমাবস্যার কাছাকাছি। বে-কাফে পাড়ায় একপায়ে-খাড়া একটা জোরালো মার্কারি বাল্ব, যেন সদম্ভে অমানিশার অন্ধকারকে হুঙ্কার দিয়ে বলছে ঃ 'খবরদার'।

কিন্তু কতটুকু তার ক্ষমতা? দু-পা এগিয়ে এসেই দেখা গেল ঐ দাম্ভিকের আলোর ছিটেফোঁটাও নেই। পিচ-মোড়া সড়কের কিনার দিয়েও কিছু নিয়নবাতির রবরবা। তারাও ক্রমে ম্লান হয়ে গেল। এখন শ্যামল এসে পৌছেছে প্রকৃতির খাস তালুকে, যেখানে মহাকাশের সঙ্গে মহাসমুদ্রের মহাসঙ্গম। সমুদ্র ক্লান্ত! যেন, রতিক্লান্তা রমণীর আশ্লেষান্তিক পরিশ্রান্তি। আলুলায়িতকুন্তলা যেন পাশ-বালিশ আঁকড়ে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দূর বহুদূর থেকে ভেসে আসছে তার গভীর ঘুমের শ্বাস-স্তনন। সমুদ্র নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। পা-মুড়ে গুটিসুটি মেরে নিঃসাড়ে পড়ে আছে মেয়েটা। অনেক-অনেক দূর পর্যন্ত শুধু বালি-বালি আর বালি। তার ও-প্রান্তে আশ্লেষশয়নার শাড়ির রুপালি আঁচলের ঝিকিমিকি দেখা যায়-কি-না-যায়।

চকিতে মনে পড়ে গেল শ্যামলের : 'এব্-টাইড আজ ম্যাক্সিমাম রাত দশটা বত্রিশে।'

হাতঘড়ির রেডিয়াম-ডায়ালে নজর পড়ল : দশটা দশ।

তার মানে, রতিক্লান্তা সমুদ্র আরও বাইশ মিনিট ঘুমাবে। ও পাশ ফিরে। তারপর চিরন্তন চক্রাবর্তনের রীতিতে ঘুম ভেঙে যাবে উন্মাদিনীর। ফেনিল আক্রোশে আবার ধেয়ে আসবে তটভূমির দিকে—আবার দখল নেবে তার ছেড়ে-আশা ভূখণ্ড। ঊর্ধ্ব-আকাশের দিকে দুইবাহু উৎক্ষিপ্ত করে আছড়ে পড়বে উদ্বেলিত উচ্ছ্বসনে।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। না, নীরন্ধ্র নয়। এক-আকাশ তারা। তারা কৌতূহলী। আকাশ যেন অনেকটা নেমে এসেছে নীচে। তার বাতায়নে-বাতায়নে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সুরললনার দল। যেন সমুদ্রসৈকতের ঐ নিঃসঙ্গ-পথিককে ওরা মিটমিট-চোখে প্রশ্ন করছে : হ্যাঁ গো, তুমি তাকে দেখেছে? সে যে ছিল আমাদেরই একজন—সেই শ্যামলবরণ নির্বিরোধী মেয়েটি? এমন কত ঘুমহারা-রাতে খোলা ছাদের নীচে সে তার তানপুরা নিয়ে বসত। আমাদের গান শোনাত। এই তো সাঁঝের-বেলায় দেখলুম সে খুশিয়াল

অভিসারিকা। তারপর? তারপর? কী হল বলো তো সেই আবাগির! সে তো আমাদেরই একজন! শ্রবণা, স্বাতীর মতো ঔজ্জ্বল্য তার ছিল না, তবু এই নক্ষত্রলোকে তারও ছিল একটা মর্যাদা—সম্মানের কৌলীন্য; তার ঐকান্তিক তন্নিষ্ঠার কারণে। হোক ছোট, তবু। সে ছিল সর্বজন-শ্রদ্ধেয়া। মহাবশিষ্ঠের চরণপ্রান্তনতা সতী-সীমন্তিনী।

তফাতও আছে—ভাবে শ্যামল। অমর্ত্যলোকের অরুন্ধতী ঋষি কর্দমের ঔরসজাতা—মর্ত্যের অরুর কৈশোরে-যৌবনে কর্দমের ছিটে-ফোঁটাও লাগেনি। অমর্ত্যলোকের মৃত্যুঞ্জয়ী অরুন্ধতী মহাযোগীর অঙ্কশায়িনী, মর্ত্যলোকের মরণশীলা অরু মহাপাষণ্ডের।

চোখ দুটো অন্ধকারে সয়ে গেছে। হঠাৎ ওর মনে হল, বহু দূরে—আধমাইলটাক পুবে বালির ওপর কী-যেন একটা। অচঞ্চল, স্থাবর একটা বালির দুর্গ যেন। কী ওটা? মনে হচ্ছে, গাড়ির চাকার চিহ্নজোড়া সেইদিকেই ছুটে গেছে। নির্জন বালুকাবেলায় কুণাল কেন নিয়ে এসেছিল অরুকে? বিলাসবহুল হোটেলের ডানলোপিলো গদির পেলবতা উপেক্ষা করে? অরু মদ্যপান করেছে এটা অবিশ্বাস্য। তাহলে?

হঠাৎ জানা-কথাটাই নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে ওর মস্তিকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারল!

'এব্-টাইড আজ ম্যাক্সিমাম রাত দশটা বত্রিশে!'

তবে কি—?

বৈজ্ঞানিক তথ্যটা একটা নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে ধাক্কা মারল ওর মস্তিষ্কে। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। তথ্যটা কেন সংগ্রহ করেছিল 'জরাসন্ধ'!

বসে পড়ল বালির ওপর! দুহাতে চুলের মুঠি ধরে। হ্যাঁ, ওটা সেই গাড়িটাই। যার চক্রচিহ্নের নির্দেশে এতক্ষণ এগিয়ে এসেছে। ছুটতে শুরু করল শ্যামল। আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে নিল ডানহাতে। রাইফেল-রেঞ্জ-এর ভিতর এসে আর টর্চটা জ্বালেনি।

গাড়ির সব আলো নেবানো। দুটি পাল্লা খোলা। গাড়ি থেকে যারা নেমে গেছে তারা পাল্লা দুটো বন্ধ করে যায়নি। দক্ষিণ দিকের দুটো পাল্লা। সমুদ্রের দিকের।

গাড়ির পিছনে আত্মগোপন করে সমস্ত দিকচক্রবালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। না, ত্রিসীমানায় জনমানব নেই। এবার সে টর্চটা জ্বালে। নম্বরটা পরীক্ষা করে। হ্যাঁ, তাই।

গাড়ির ভিতরে টর্চ ফেলে। একটা লেডিস হ্যান্ডব্যাগ, আর একপাটি মেয়েদের চটি। শ্যামল আবার বসে পড়ে ভিজে বালির ওপর। দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ বলে যে ছেলেটার বদনাম, সে ঐ একপাটি চটি হাতে নিয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

শিশুপাল সেদিন ছিল সসৈন্য! সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো সেদিন অরুর ন'দা একা হাতে রক্ষা করেছিল তাকে। কিন্তু আজ জরাসন্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না। সে তো আততায়ী নয়, সে যে ওর স্বামী—অরু যে নিজেই বলে 'অচ্ছেদ্যবন্ধনে' সে ঐ আগুনবরণ ছেলেটাকে আঁকড়ে রাখবে! ডিভোর্স দেবে না!

আর কিছু করার নেই! সব শেষ হয়ে গেছে। স্লিপিং-পিল খেয়ে অরু ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। হোটেলেই খাবারের সঙ্গে সে অরুকে স্লিপিং পিল খাইয়েছে।

সেখানেই অভিসারিকার দেহটা নিয়ে তার পাশবকাম চরিতার্থ করেছে। ততক্ষণে বোধহয় অরুর চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। আর তাতেই রিসেপশানিস্ট ছোকরার মনে হয়েছিল অরু ঘুমাতে ঘুমাতে গাড়িতে উঠছে। হয়তো বিচ-এর নির্জনতম প্রান্তে পৌঁছবার আগেই অরু ঘুমে ঢলে পড়েছিল। তখন সেই আগুনবরণ ছেলেটা রমণীমোহন সুহাসে এগিয়ে এসে যখন অরুর গ্রীবামূল স্পর্শ করে, তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন মেয়েটা কি ভেবেছিল—ও চুমো খেতে চাইছে?

বালিতে একটা দাগ। ভারী কিছু নামানো হয়েছিল গাড়ি থেকে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—সেটা একটা রতিক্লান্তা রমণীর মৃতদেহ। মুর্শিদাবাদি শাড়ি পরা এক অভিসারিকার অন্তিম অবশেষ! তারপর একজোড়া পুরুষের ভারী ক্রেপ-সোল জুতোর দাগ চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। কোনো নারীর পদচিহ্ন নেই। দ্বিতীয় পাটি লেডিস স্লিপারটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বালির ওপর। বুঝতে অসুবিধে হয় না—ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল!

হঠাৎ একটা নির্বেদ আচ্ছন্ন করে ফেলে শ্যামলকে। আর কী হবে? বাঁচানো গেল না! বড় দেরি হয়ে গেল! সেই শ্যামলা-মেয়েটি এখন তার ন'দার নাগালের বাইরে।

কিন্তু!

না! তার কর্তব্য শেষ হয়নি? অরুকে বাঁচানো গেল না; কিন্তু তার অভিশাপকে সে যে কথা দিয়ে রেখেছে! সে প্রতিজ্ঞাটা তো এখনো পূরণ করা হয়নি। অরুর বিবাহের পূর্বে ওর নাকটা থেঁতলে দেওয়া যায়নি; অন্তত অরুর সৎকারের পূর্বে সেই ব্রতটা উদ্‌যাপন করতে হবে!

পুলিশের পোশাকে আছে বটে, কিন্তু সে অফ্-ডিউটি!

ধনীর দুলালকে সে কোনো মরামানুষের আদালতে সোপর্দ করবে না। সেখানে ইদানীং নাকি সুবিচার হয় না। কিন্তু ওর রিভলভারটা গর্জে ওঠার আগে সেই আগুনবরণ ছেলেটির উন্নাসিকতার অবসান ঘটাতে হবে। শ্যামল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!

জুতো-জোড়ার দাগ যেদিক পানে গেছে সমুদ্রের সেই অংশে টর্চের আলোটা ফেলল।

অমারাত্রির ঘনান্ধকার তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলল সেই জোরালো আলো। কিছু দেখা গেল না।

ডানহাতে আগ্নেয়াস্ত্র, বাঁ-হাতে টর্চ নিয়ে শ্যামল এগিয়ে চলল ঐ পদরেখা লক্ষ্য করে। দক্ষিণ দিকে। সেই যেখানে ঘুমন্ত সমুদ্রের রুপালি চুলপাড় নীলাম্বরীর আভাস। মাঝে মাঝে সমুখপানে টর্চের আলো ফেলছে।

লোকটার কাছেও পিস্তল আছে। পিস্তল রেঞ্জ-এর কাছাকাছি এলে আর টর্চ জ্বালা চলবে না। অমারাত্রির রঙ্গমঞ্চেই অন্ধকারে শেষ হবে ওদের দ্বৈরথ সমর। অরু একলা বিদায় নেবে না দুনিয়া থেকে! হয় তার স্বামী, নয় তার ন'দা, কেউ তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবে চিরশান্তির রাজ্যে!

বালি-বালি-বালি। ক্রমে জল। কাঁকড়া ছোটাছুটি করছে জলের কিনার দিয়ে। দু-একটা রাতচরা পাখি। জল শুরু হবার পর পদচিহ্ন-রেখার প্রশ্ন নেই। এখন আর টর্চ জ্বালা নিষ্প্রয়োজন। জলের গভীরতা অতি সামান্য। প্রায় পৌনে এক মাইল জলের ভিতরে গিয়েও হাঁটুজল হল না। রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িতে দেখে রাত সাড়ে দশ!

টর্চটা এবার না-জ্বাললেই নয়। কিন্তু কে জানে ও-পক্ষও হয়তো অন্ধকারে লক্ষ করছে শ্যামলকে। গাড়ির কাছে সে বেশ কয়েকবার টর্চ জ্বেলেছে। হয়তো ও-পক্ষও অন্ধকারে তার পিস্তল উঁচিয়ে অপেক্ষা করে আছে আলোর সঙ্কেতের জন্য। শ্যামল এ-ক্ষেত্রে যা করল তা প্রায় হাস্যকর। সে হাঁটুজলেই 'ফাস্ট-বোলারের মতো লাফ দিয়ে শূন্যে যেন একটা 'বল' 'ডেলিভারি' দিল—আর বল ছোঁড়ার কাল্পনিক খণ্ড-মূহূর্তে জ্বলে উঠল তার টর্চ, ক্ষণিকের জন্য। যা ভেবেছিল তা হল না। পিস্তলের শব্দ হল না আলোটা লক্ষ্য করে! ওর মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল না লক্ষ্য-ভ্রষ্ট গুলিটা। কিন্তু ঐ ক্ষণিক দ্যুতিতে শ্যামল দেখতে পেল তার প্রতিপক্ষকে।

কিন্তু কুণাল কোথায়? ও তো একজন ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ! ঘাটের দিকে মুখ করে হাঁপাচ্ছে। প্রায় একশো গজ দক্ষিণে। সেখানেও তার হাঁটুজল। শ্যামলের মনে হল, একজন, বলিষ্ঠ শেরপা ভারী মাল পিঠে নিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা তীরের দিকে এগিয়ে আসছে।

জলের মধ্যে দৌড়ানো যায় না। তবু যত জোরে সম্ভব শ্যামল অন্ধকারে এগিয়ে গেল সেদিকে। সোজাসুজি নয়, সর্পিল গতিতে। এঁকে-বেঁকে। যাতে ও-পক্ষ না গুলি করতে পারে। তীরভূমি থেকে এখন সে মাইলখানেক সমুদ্রের ভিতরে। যদিও জলতল শ্যামলের জানু-সন্ধি পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

অন্ধকার সত্ত্বেও বুড়োটাকে এখন দেখা যাচ্ছে। না, তার হাতে পিস্তল নেই। কিছুই নেই। ওরাংওটাঙের মতো খালি হাত দুটো দু-পাশে দুলছে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে।

আবার আলোটা জ্বালে।

না। ন্যুব্জপৃষ্ঠ হলেও লোকটা বৃদ্ধ নয়। যাকে খুঁজছিল—সে-ই!

এতক্ষণে লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ও বোধহয় শ্যামলের হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখতে পেয়েছে! নির্বাক মানুষটা দু-হাত তুলল মাথার ওপর। আদিষ্ট না হয়েও। ওর হাতে কিছু নেই। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে সে। যেন দৈহিক ক্লান্তির শেষ সীমান্তে। শ্যামল ঘনিয়ে এল। পাঁচ-হাত দূরত্বে। আবার জ্বালল বাতিটা। নতজানু মানুষটার মুখের ওপর।

অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

কুণাল জলের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তীরের দিকে ফিরে। আর তার পিঠের ওপর পিছন থেকে তাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরেছে তার সহধর্মিণী! তার দুটি পেলব বাহু কাঁধের ওপর দিয়ে সাপটে ধরে আছে কুণালের চওড়া বুক। তার দুটি আল্‌তা-রাঙা

চরণও কুণালের কোমর বেষ্টন করে চলে এসেছে সামনের দিকে। কুণালের বাঁ-কাধের ওপর দিয়ে তার মুখটুকু দেখা যাচ্ছে—চোখ দুটি বোজা, সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু। আশ্চর্য! তার কপালের টিপটা এখনো অটুট। মুখে কোনো বিকৃতি নেই। হালকা নীল-রঙের জল-সপ্-সপ্ মুর্শিদাবাদি সিল্কের আঁচলটা শুধু খসে পড়েছে।

কুণাল এত হাঁপাচ্ছে যে, কথা বলার দৈহিক ক্ষমতা তার নেই।

তার চোখে মৃত্যু-আতঙ্ক!

শ্যামল কোনো কথা বলল না। কী হয়েছে—তা সে এখনো বুঝে উঠতে পারছে না। কোনো প্রশ্ন করল না সে। ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করল দম্পতিকে। কুণাল স্থাণু। প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই তার। সে অপেক্ষা করছিল। পিছনে গিয়ে শ্যামলের নজর হল, অরুন্ধতীর মাজায় বাঁধা আছে অত্যন্ত ভারী একটা লোহার শৃঙ্খল!

হাত বাড়িয়ে অরুর হাতটা স্পর্শ করল। তৎক্ষণাৎ সমাধান হয়ে গেল সমস্যাটার। মনে পড়ল, ফরেনসিক-ইন্‌সটিট্যুটে লেকচারার কী বলেছিলেন।

হ্যাঁ, কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি সুকৌশলী হত্যাকারী যদি ঐ ভারী লোহার শৃঙ্খলে জড়িয়ে মৃতদেহটাকে ভাঁটার চূড়ান্ত দূরত্বে ফেলে আসতে পারত, তাহলে তা উদ্ধার করা যেত না। নিরুদ্দিষ্টার হদিশ কোনোদিনই পেত না পুলিশ। সামুদ্রিক মাংসাশী প্রাণী অন্তিম সৎকার করত হতভাগিনীর। কুণাল অসীম শক্তিশালী, তবু পাঁজা-কোলা করে মৃতদেহটাকে ঐ ভারী শৃঙ্খল সমেত এতটা বয়ে আনতে হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হয়তো তাই তুলে নিয়েছিল পিঠে। হয়তো নিজেই টেনে টেনে মৃতের হাত ও পা-কে টেনে এনেছিল তার সামনের দিকে! তারপর—আন্দাজ করতে কোনোই অসুবিধা হল না—রাত দশটা বত্রিশে যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে সে ভারমুক্ত হতে চেয়েছিল।

পারেনি।

অসীম বলশালী জোয়ান মানুষটা কোমলাঙ্গীর আলিঙ্গনমুক্ত হতে পারেনি। অরু আঁকড়ে ধরে রেখেছিল তার স্বামীকে—যাকে সে ডিভোর্স দেয়নি! এখনো দেবে না।

অচ্ছেদ্যবন্ধনে!

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস!

শ্যামল ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে এক অদৃশ্য বিচারককে সম্বোধন করে হঠাৎ বলে উঠল, আই অ্যাডমায়ার য়োর ইন্‌এক্‌জরেবল্‌ জাস্টিস, মি-লর্ড!

ধীরে ধীরে নতজানু মানুষটার সামনে এসে দাঁড়াল শ্যামল। তাকে কিছুই বলল না। দীনবন্ধু জানার মন্ত্রশিষ্য বলেই শুধু নয়, ঠিক এই মুহূর্তে কোনো কটু কথা তার মুখে জোগাল না। বিদায়বেলায় হাত বাড়িয়ে টিপে দিতে গেল অরুর নরম গালটা।

সেটা যেন ঢালাই-লোহার পাত!

তাই তো হবার কথা! শ্যামলের দু-গাল বেয়ে দু-ফোঁটা লবণাক্ত জল ঝরে পড়ল সমুদ্রে।

আশ্চর্য! মহাসমুদ্রের ভাঁড়ারে বোধহয় ঐ দু-ফোঁটা লবণাক্ত জলেরই ঘাটতি ছিল, কারণ দু-ফোঁটা জলের ঘাটতি মিটে যেতেই তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল সমুদ্রের। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ঢেউ ধেয়ে এল।

একটা অপ্রত্যাশিত তিতিক্ষায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল শ্যামল। না, তিতিক্ষা নয়—নির্বেদ! তিতিক্ষার মধ্যে একটা উচ্চনিচ ভেদাভেদ থাকে—তিতিক্ষু ও তিতিক্ষিত। ক্ষমার মধ্যে একটা সচেতনতা থাকেই—যে করছে, যাকে করছে। ওর মন এখন সম্পূর্ণ বিরক্ত, বিবিক্ত। ঐ কুসুম-কোমল মেয়েটির ইস্পাতকঠিন গাল দুটি স্পর্শ করেই বিশ্বপ্রপঞ্চের অনিত্যতা সম্বন্ধে একটা বোধি, ইহলৌকিকের প্রতি একটা অনীহা জেগেছে ওর—একটা অনাসক্তি! সংসার-বিবিক্তের একটা বৈরাগ্য!

পায়ে-পায়ে সে ফিরে চলল তটভূমির দিকে।

—প্লিজ হেলপ্ মি!—পিছন থেকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ।

শ্যামলের কানে কথাটা গেল। মস্তিষ্কে কোনো বোধের উন্মেষ হল না। সে ধীর পদে তীরভূমির দিকেই এগিয়ে চলতে থাকে।

পিছন থেকে ভেসে এল স্বীকারোক্তি! আই কন্‌ফেস। আমিই ওকে খুন করেছি। গলা টিপে মেরেছি। য়ু কান্ট লিভ মি অ্যালোন! প্লিজ অ্যারেস্ট মি...ইটস্ য়োর ডিউটি...

এর মধ্যে নতুন কথা কিছু নেই। হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি শুনে সে এমন অনাসক্ত থাকেনি কখনো ইতিপূর্বে। কিন্তু আজ নাটকটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। আজ সে পিছন ফিরল না!

কুণাল চীৎকার করে ওঠে : একটা অশরীরী প্রেতাত্মার আলিঙ্গনে আমাকে এভাবে ফেলে যাবেন না।

এবার শ্যামল দাঁড়িয়ে পড়ে।

সদ্য-স্বর্গগতার প্রতি ঐ অপমানকর উক্তিটা অরুর ন'দা মেনে নিতে পারে না। সে পিছন ফেরে। পায়ে পায়ে আবার ফিরে আসে। ঘড়ি দেখে বলে : দশটা পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে। এবার জোয়ার শুরু হবে! ওকে নামিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—পারছি না! ওর প্রেতাত্মা...

—না! প্রেতাত্মা নয়! সাতপাকে বাঁধা অচ্ছেদ্যবন্ধন!—'রিগর মর্টিস্'!

কুণালের চোয়াল বেয়ে লালা ঝরছে, অথবা সামুদ্রিক লোনা জল। কোনোক্রমে বললে, তার মানে কী?

—'অ্যাডিনসিন ট্রাইফস্‌ফেট' বা এ. টি. পি. কাকে বলে জানেন?

বিহ্বলের মতো কুণাল বলে, না! কী?

এতক্ষণে দেখা গেল মিতভাষী দীনবন্ধু জানার মন্ত্রশিষ্যকে। শ্যামল ধীরভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাখিল করে, মৃত্যুর পর 'রিগর মর্টিস্' হয় শোনেননি? ওর হাত পায়ের 'বল-সকেট জয়েন্ট'গুলো এখন রি-ইনফোর্সর্ট্ কংক্রিটে রূপান্তরিত! বাঁকানো যাবে না! 'ভাইস' দিয়েও নয়। ওর বাঁধন এখন দু-দশজন মানুষ জোর করে আলগা করতে পারবে না! ওর গোটা দেহটা এখন লোহার মতো কঠিন! তবে 'রিগর মর্টিস্' চিরস্থায়ী নয়। আবার ওর হাত-পা আলগা হয়ে যাবে...

অন্ধকারে কুণাল দেখতে পাচ্ছে না—শারীরবিদ্যার এসব তথ্য যে লোকটা মাঝ দরিয়ায় দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে তার দুগালে দরদর ধারে অশ্রুর বন্যা নেমেছে!

সে জানতে চায়, কখন? কখন?

শ্যামল সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্য একটা দিক ব্যাখ্যা করতে বসে, মৃত্যুর আধঘণ্টার মধ্যে 'রিগর মর্টিস্' ডেভেলপ্ করে না এমন বিরল ঘটনা তখনি ঘটে যখন মৃত্যুমুহূর্তে নার্ভগুলো খুব উত্তেজিত থাকে! ওকে হত্যা করার আগে সম্ভোগ করাটা আপনার উচিত হয়নি, মিস্টার চক্রবর্তী!

কুণাল গর্জে ওঠে, কখন 'রিগর মর্টিস্ ভাঙবে তাই বলুন!

—আর-দশ ঘণ্টা পরে। অরু তখন আপনাকে ডিভোর্স দেবে! ছেড়ে দেবে! তখন কিন্তু ঠিক এই জায়গাটায় দু-মানুষপ্রমাণ জল!

সমুদ্র এবার এগিয়ে আসছে। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে। একটা ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিল ক্ষণিকের জন্য দম্পতিকে। শ্যামল একটা লাফ দিয়ে ঢেউটা কাটাল। কুণালের পক্ষে লাফানো সম্ভবপর নয়। তার নাকেমুখে জল ঢুকে গিয়েছিল। কাশল খানিকক্ষণ। শ্যামল অপেক্ষা করল। কুণাল শান্ত হতেই শান্তকণ্ঠে বললে, শ্বাস বন্ধ হলে বড় কষ্ট হয়, তাই নয়? এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন, অরুর কী জাতীয় কষ্ট হয়েছিল?

কুণাল তার হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বললে, প্লিজ অ্যারেস্ট মি!

—আমি নিরুপায় মিস্টার চক্রবর্তী। আমি চেষ্টা করলেও আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারব না। অরুর মৃতদেহ সৎকার করতে পারব না। তবে অ্যারেস্ট না করলেও আপনাকে আদালতের হাতেই সমর্পণ করে যাচ্ছি!

তারায় ভরা ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে হাতটা তুলে বললে, ঐ ওঁর কাছে মার্সি পিটিশন করুন!

আবার একটা ঢেউ।

শ্যামল দ্রুতগতিতে ঘাটের দিকে ফিরে চলল। জোয়ার আসছে। তীরভূমি দূরে—বহুদূরে! অনেক—অনেকটা পথ যেতে হবে তাকে। অনেকটা পিছিয়ে এসে আবার টর্চের আলোটা জ্বালল। দেখল, অসীম শক্তিশালী লোকটা তার পিঠের বোঝা সমেত দাঁড়িয়ে উঠেছে আবার—চ্যাম্পিয়ান ওয়েট-লিফ্টারের মতো। কিন্তু চলতে পারছে না। সে স্থাণু!

ওর পিঠে অচ্ছেদ্যবন্ধনে ওরই সহধর্মিণী—এক ইস্পাতকঠিন কোমলাঙ্গী।

না! ডিভোর্স সে দেবে না!

আবার একটা বড় ঢেউ।

সরে যেতে দেখা গেল কুণালের চিবুক-জল।

চীৎকার করে সে কিছু বলল। সমুদ্র গর্জনে কিছুই শোনা গেল না!

শ্যামল তখন তীরভূমির দিকে ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে ওর মনে হল—সে তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি। ঐ নতজানু মৃত্যুপথযাত্রীকে কোনো আঘাত করার কথা তার মনে পড়েনি। আচ্ছা, অরু কি রাখতে পেরেছিল তার প্রতিশ্রুতি? মৃত্যুমুহূর্তে সে কি সজ্ঞানে ছিল?

'তেমন চরম মুহূর্তে আর কারও কথা আমার মনে পড়বে না রে ন'দা!'

—সমাপ্ত—

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

স্বর্গীয় নরকের দ্বার এবং
উলের কাঁটা
ছোঁবল
রিস্তেদারের কাঁটা
হংসেশ্বরী
অবাক পৃথিবী
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা
সোনার কাঁটা
হে হংস বলাকা
আনন্দ স্বরূপিনী
অচ্ছেদ্য বন্ধন
রাণী কাদম্বিনী এবং
ছোঁবল

পুরুষ ও রমণীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের সৃষ্টি মানব-ইতিহাসের আদিকাল থেকেই। মানব-মানবী সৃষ্টিকালেই বিধাতা এই আকর্ষণের বীজ বপন করেছেন তাদের স্বভাবে ও চরিত্রে। এই আকর্ষণেই তারা জোটবদ্ধ হয়, কখনও প্রণয়ে, কখনও সামাজিক প্রথাসিদ্ধ বিবাহ-বন্ধনে। আবার এই বন্ধনই কখনও কখনও কারও কারও জীবনে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, পুরুষ বা রমণী কেটে ফেলতে চায় সে বন্ধন, কেটেও যায় কোথাও কোথাও। কিন্তু দুই পক্ষের একজন যদি রাজী না হয় বন্ধন কাটতে, যখন এই বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন কি দাঁড়ায়? তখনই কি দেখা দেয় অশান্তি, নিপীড়ন অথবা জীবনহানি! 'অচ্ছেদ্য বন্ধন' উপন্যাসটি এই বর্তমান সামাজিক সমস্যার পটভূমিতেই রচিত, যেখানে দেখা যায় এই জটিল পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর এই বন্ধন অচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—হুমকি অত্যাচার এমন কি হত্যাকেও উপেক্ষা করে, জীবনের পর মরণেও। একটি রুদ্ধশ্বাস সুখপাঠ্য উপন্যাস শেষ করার পর পাঠক দেখবেন এই সমস্যায় আজকের সমাজ কি ভাবে ভারাক্রান্ত।